প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৭
প্রকাশক : রাখাল সেন
লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২
মুদ্রাকর : পরাণচন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস : ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

আমার অনেক রম্য ভাবনার সঙ্গী
শ্রী উৎপল চক্রবর্তী
(পূর্ব রবীন্দ্রপল্লী, বারাকপুর)
বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

তস্কর
আড়কাঠি
চারণভূমি
জানগুরু
অন্তর্গত নীলস্রোত
মৃগয়া ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম
শিকড়ের ঘ্রাণ
ফাঁসবদল
আরশি চরিত
শিকলনামা

কিশোর উপন্যাস

সামনেই সুড়ঙ্গটা শেষ
ছড়ারু গোয়েন্দা
মধুবনের বন্ধুরা

কিশোর গল্প-সংকলন

পুরন্দর ও
বাতাসীর মন
দুখু মাঝি
ভূতের যমজ ভাই

গল্পগ্রন্থ

সরস গল্প
জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প
লেবারণ বাদ্যিগর
কাকচরিত্র
চিকনবাবু
নির্বাচিত গল্প
ভগীরথ মিশ্রর ছোটগল্প
ভগীরথ মিশ্রের গল্প
ভগীরথ মিশ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প
মিড-ফিল্ডার
অ্যাকোয়ারিয়াম
আমার ৫১টি গল্প

ভ্রমণ

মালয়ের ডায়েরি
হিমালয়কে খুঁজে বেড়াই
জম্মু-কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী

অন্যান্য

বনসাই চর্চা

সূচিপত্র

অর্বাচীনের জার্নাল

হনুবাদ

বলা হয়, অনুবাদের মাধ্যমে ভাবের গোত্রান্তরটি না ঘটলে আমাদের নাকি চিরকুমারই থেকে যেতে হত। অন্য গোত্রের সাহিত্যের রমণীয়া রমণীটি আর আমাদের ঘরে ঢুকতে পেত না। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করবার প্রক্রিয়াটি মানুষ কবে রপ্ত করল, কীভাবে করল, তা এক গবেষণাযোগ্য বিষয়। তবে, ইদানীং তো সারা বিশ্বব্যাপী অনুবাদের রমরমা। অনুবাদের মাধ্যমেই আমরা বর্তমানে সারা পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তোগুলি আহরণ করতে পারি। কাজেই, অনুবাদ তুমি যুগযুগ জিও।

কিন্তু আমি এই রচনায় এমনতর কিছু অনুবাদের কথা বলতে চাই, যেগুলো হয়তো অনুবাদের প্রাজ্ঞ-আসরে ঠাঁই পাবে না, কিন্তু এগুলোর থেকে অনুবাদকদের রস-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো হল মজাদার অনুবাদ।

প্রথমেই বলে রাখি, এই ধরনের অনুবাদের বারোআনাই ইংরেজি শব্দমালার একেবারে অন্ধ, আক্ষরিক অনুবাদ। হনুমানরা নাকি খুবই অনুকরণপটু। সেই কারণেই, আমাদের মধ্যে কেউ অন্ধভাবে কিছু অনুকরণ করলে আমরা তাকে বলি, হনুকরণ। সে হিসাবে এই ধরনের অন্ধ, আক্ষরিক অনুবাদগুলোকে আমরা হনুবাদ বলতে পারি।

বাংলা থেকে হিন্দিতে হনুবাদের উদাহরণ আমার কাছে খুব বেশি নেই। এই মুহূর্তে মাত্র কয়েকটির কথা মনে পড়ছে। 'দশরথের চার ছেলে' হিন্দি হনুবাদে হয়েছে, দশরথকা চৌবাচ্চা। আর, ভ্যানিটি ব্যাগ হিন্দিতে হয়েছে, 'ফুটানি-কা ডিব্বা'। আর, কবিগুরু 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানটি, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার পরে' হিন্দিতে নাকি, 'মেরা শির পটক্ দে, তেরা টেংরিকা ধুঁলিয়াঁ পর'। লেটার-বক্স নাকি হিন্দিতে, পত্তর-ঘসর, রেলওয়ে স্টেশান নাকি ভকভকিয়াকা আড্ডা। আমার হিন্দি হনুবাদের ভাঁড়ারটিতে এর বেশি বড় একটা নেই। তবে ইংরেজিতে এমন ভূরি ভূরি বাক্যের হনুবাদ আমাদের স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়ালেই পাওয়া যাবে।

যেমন, প্রথমেই ধরা যাক, 'আমার মামা কেরানিগিরি করে'। এর হনুবাদ যদি এরকম হয়, 'মাই ডবল মাদার (মা-মা) হু (কে) কুইন (রানি) মাউন্টেন (গিরি) ডা'জ (করে)। কিংবা 'ঘুড়িটি লাট খাচ্ছে'র হনুবাদ যদি হয়, দা কাইট ইজ ইটিং দ্য গভর্নর (লাট)। কিংবা 'আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি'র হনুবাদ যদি হয় 'আই সুগার (চিনি) য়্যু বোন-টু-বোন', কিংবা, 'তিমির আড়ালে কে তুমি দাঁড়ালে'র হনুবাদ যদি হয়, 'হু আর্ট দাউ, স্ট্যান্ডিং (কে তুমি দাঁড়ালে) বিহাইন্ড দি হোয়েল (তিমির আড়ালে)'।

এই হনুবাদগুলি হয়তো অনুবাদ বিশারদদের অভিজাত আসরে কোনোকালেও ঠাঁই পাবে না, কিন্তু অনুবাদের আসরে এগুলি যে রসিক হনুবাদকদের মজাদার সংযোজন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্রেফ হনুবাদ করতে গিয়েও কোনো কোনো হনুবাদক যে মুন্সিয়ানার চূড়ান্ত করেছেন, কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে হলে মনে হয়।

যেমন, 'একটা মোটা বেড়াল মাদুরের উপর গ্যাট হয়ে বসে ছিল।' এর হনুবাদ হল, 'অ্যা ফ্যাট ক্যাট স্যাট গ্যাট অন দি ম্যাট।' কিংবা, 'সেই ছেলেটা, সেই যে গেল, গেল তো গেল, ফিরে না এল'র হনুবাদ হল, 'দ্যাট ভেরি বয়, দ্যাট ভেরি গান (gone), গান-গানা-গান, নেভার রিটার্ন'।

কিংবা 'ডুবে ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাপও জানতে পারে না' এর হনুবাদ হল, 'সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার, একাদশী'জ ফাদার ডাজ নট নো'। এরই অন্য একটা রূপও লক্ষ করেছি। 'ডুবে ডুবে অল্প অল্প জল খেলে, একাদশীর বাপও বুঝতে পারে না'র হনুবাদ হল, 'সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং লেস/একাদশী'জ ফাদার ক্যান নট গেস'। লক্ষ করুন,



বাক্যগুলির একেবারে ননসেন্স হনুবাদ করতে গিয়েও হনুবাদক কেমন ছন্দে-অনুপ্রাসে বেঁধেছেন বাক্যগুলিকে। এই ধরনের হনুবাদ শুনে এক জাতের মজা তো পাওয়া যায়ই। এই জাতের হনুবাদের একেবারে চূড়ান্ত মুন্সিয়ানা দেখা যাবে, 'বড় বড় বানরের বড় বড় পেট/লঙ্কা ডিঙোতে বললে মাথা করে হেঁট'-এর হনুবাদে। হনুবাদটি হল, 'বিগ বিগ মাংকি'জ বিগ বিগ বেলি/সিলোন (লঙ্কা) জাম্পিং মেলাংকোলি'। লক্ষণীয়, দু' পংক্তির মূল ছড়াটিকে হনুবাদ করতে গিয়ে হনুবাদ-কর্মটিও দু'পক্তির একটি রাইম হয়ে উঠেছে। আসল অনুবাদের আসরে নাই বা দিলাম আসন, কিন্তু এই ধরনের হনুবাদেও যে একটি রসিক কবিমন কাজ করেছে, তাকে তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

কেবল বাক্যই নয়, এক-একটি শব্দগুচ্ছকে হনুবাদের মাধ্যমে কতখানি মজাদার করে তোলা হয়েছে, তারই কয়েকটা উদাহরণ পেশ করি। বিশ্বখ্যাত দৌড়বিদ পি-টি উষা কি অনুবাদ কিংবা হনুবাদযোগ্যা? আজ্ঞে হ্যাঁ, হনুবাদে তিনি হয়েছেন, মর্নিং এক্সারসাইজ। কোন যুক্তিতে? না, উষা মানে মর্নিং, আর পি-টি (Physical Training) তো এক জাতের এক্সারসাইজ।

'জোয়ানের আরক' এর ইংরেজি হনুবাদ যদি হয় 'মিলিটারি রাম (এক জাতের মদ, যা জওয়ানরা অর্থাৎ সৈন্যরাই অধিক সেবন করেন), মানবেন? মানবেন কি মানবেন না, সে আপনার মর্জি, হনুবাদক কারও মানা-না মানার থোড়াই তোয়াক্কা করেন।

আরও আছে। 'কুমারী মেয়েটি নিচে দাঁড়িয়ে আছে'র ইংরেজি হনুবাদ হল, মিস (কুমারী মেয়ে) আন্ডার (নিচে) স্ট্যান্ডিং। অর্থাৎ পুরোটা হল, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। তা, একটি কুমারী মেয়ে যদি খামোখা নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝি হবেই। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে নিদারুণ ভ্রান্তি তো জাগবেই। আর, যারা ওই কুমারী মেয়েটির পাণিগ্রহণে উৎসাহী, তারা একটা বড়সড় মিসটেক (মিস মানে, কুমারী মেয়ে, আর টেক মানে গ্রহণ করা) করে বসতে পারেই। আর তেমনটি বাস্তবে ঘটলে, তারা উঠোনের একহাঁটু জলেও হাবুডুবু খাবে। আর, তখন 'ওয়াটারবেরি'জ কম্পাউন্ড' নামক কফ-কাশি সারানোর চালু ওষুধটি ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। পুরোটা হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে? কী করব বলুন, 'উঠোনটি জলে ডুবে গিয়েছে'র হনুবাদ যদি করা হয়, ওয়াটার বেরি'জ (জলমগ্ন) কম্পাউন্ড (উঠোন), তা হলে এই অধম নিবন্ধকারের আর দোষ কী?

শব্দদোষ

বহু মানুষের বহু মুদ্রাদোষ থাকে। কিন্তু আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের কিছু শব্দদোষ ছিল। তিনি 'প্রশ্ন' শব্দটার সঠিক অর্থটি জানতেন কি না তাই নিয়ে আমার মনে ঘোরতর প্রশ্ন ছিল। কেন কি, তাঁর যাবতীয় প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন, উত্তর, সবকিছু মিলমিশে তালগোল পাকিয়ে থাকত।

'আলেকজান্ডার পুরুকে প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার কাছ থেকে কী রকম ব্যবহার আশা কর? তৎক্ষণাৎ পুরু আলেকজান্ডারকে প্রশ্ন করলেন, রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আলেকজান্ডার তখন খুশি হয়ে প্রশ্ন করলেন, যাও, তুমি মুক্ত।'

কিংবা, 'আমি হেডস্যারকে প্রশ্ন করলাম, আমি কিন্তু আজ ছুটির পর বাড়ি যাচ্ছি। শুনে হেডস্যার আমাকে প্রশ্ন করলেন, ঠিক আছে, যান, তবে সোমবার যেন ফার্স্ট-আওয়ারেই চলে আসবেন। আমি তখন হেডস্যারকে প্রশ্ন করলাম, আমি শনিবার বাড়ি গেলে তো সোমবার ফার্স্ট-আওয়ারেই চলে আসি। হেডস্যার তখন প্রশ্ন করলেন, তা অবশ্য ঠিক।'

এইভাবে, তিনি তাঁর সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে সারাক্ষণ কিছু প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে



রাখতেন।

তাঁর আরও একটি শব্দদোষ ছিল। 'সুলভ' দিয়ে শেষ হয় এমন যে-কোনো শব্দের পরে তিনি অতি অবশ্যই 'চপলতা' শব্দটি ব্যবহার করতেনই। সম্ভবত 'শিশুসুলভ চপলতা' কথাটি, শিশুকাল থেকেই, তাঁর মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়ে থাকবে। যেমন কিনা, কোনো মন্ত্রীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলতেন, ওনার সবই ভাল, কিন্তু ওঁর মধ্যে সেই মন্ত্রীসুলভ চপলতাটিই নেই। কিংবা, স্কুলের হুল্লোড়বাজ আমুদে শিক্ষক স্বপনবাবুকে প্রায়ই বলতেন, ছি, ছি, আপনার মধ্যে সেই শিক্ষকসুলভ চপলতা কই?

কথা বলতে গিয়ে সজ্ঞানে কিংবা না জেনে শব্দের ভুল ব্যবহার কিংবা শব্দবিকৃতির তো ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথমে অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত মানুষজনের কথা দিয়ে শুরু করি।

একজন অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য লোক হরেক কিসিমের দালালি এবং গাঁয়ের আন্‌পড়দের হয়ে মামলার টাউটগিরি করত। লোকটি মনে মনে বিশ্বাস করত, এ লাইনে বাংলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজির মিশেল দিলে মক্কেলদের থেকে কিঞ্চিৎ বাড়তি সমীহ পাওয়া যায়।

গাঁয়ের চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে লোকটি বলত, সবচেয়ে ভাল চা হল, বুকবাইন্ডিং এর (ব্রুকবন্ডের) চা। যেমনি লিভার (লিকার) তেমনি ফিভার (ফ্লেভার)। একটু কস্টিক (কস্ট্‌লি), কিন্তু সব সারকামফারেন্সেই (সারকামস্ট্যানসেই) চলে। লোকটি লন্ড্রি এবং সেলুনের তফাতটা বুঝত না ঠিকঠিক। ফলে, হরবখত বলত, একটা লন্ড্রিতে গিয়ে দাড়িটা কামিয়ে নিলাম..., একটা সেলুনে গিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিলাম...। পাইস-সিস্টেম হোটেলকে বলত, টাইমপিস হোটেল। মক্কেলের পয়সায় নতুন জুতো, পায়ে খুব কাটছে, লোকটি বলল, জুতোটা পায়ে ঠিক ক্রস করছে না। তার কাছে সদরের খবরাখবর জানতে চাইলে, লোকটি বলত, আজ পেপারটা ভাল করে পড়ে উঠতে পারিনি, ভাই। কোর্ট-চত্বরে একজন পেপার পড়ছিল, আমি কাজের ফাঁকে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়ে একটুখানি 'ওভারলুক' করেছি মাত্তর। মানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ওপর থেকে চোখ বুলিয়েছি।

ছাদ ঢালাইয়ের আগে কাঠের তক্তা দিয়ে যে একটা নকল ছাদ বানাতে হয়, রাজমিস্তিরা তাকে বলে, 'সেন্টারিং'। দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে অনেক শিক্ষিত মানুষই কাজটাকে সেন্টারিং বলেই জানেন। কিন্তু কাজটাকে 'সেন্টারিং করা' কেন বলে, এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইনি কারও কাছে। অবশেষে এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু জানালেন যে, কথাটা আদপেই সেন্টারিং নয়। কথাটা হল, সাটারিং। শূন্য ছাদের উপর পাটাতন পিটে পিটে সাটারিং করা হয়, ঢালাইয়ের সেমি-তরল মশলা যাতে একটা প্রাথমিক অবলম্বন পায়। কিন্তু 'সাটারিং' যে কেমন করে 'সেন্টারিং' নামে বিখ্যাত হয়ে উঠল, তা এক গবেষণাযোগ্য ব্যাপার। এখন তো গৃহনির্মাণের সঙ্গে জড়িত বারোআনা মানুষ 'সাটারিং'কে 'সেন্টারিং' বলে থাকে।

বসবাসের বাড়িতে একাধিক বাঁক-ট্যাক রাখা হয় বিভিন্ন কারণে। ওই ধরনের নব্বই-ডিগ্রিযুক্ত বাঁকগুলিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় সাধারণত 'অফসেট' বলা হয়। কিন্তু পনেরো আনা রাজমিস্ত্রি তাকে বলে 'অফ-সাইড' (বাড়িতে যত বেশি অফসাইড রাখবেন, বাড়িটা ততই দেখতে ভালো লাগবে, বাবু)।

ঘরের মধ্যে, দেয়াল থেকে দশ ইঞ্চিটাক উঁচু অবধি জায়গাটাকে বলে, 'ডেডো'। কিন্তু



আমি ওই লাইনের প্রায় সবাইকে বলতে শুনেছি, ডিটো'।

ছাদঢালাইয়ের আগে আগে আমার বাড়ির রাজমিস্ত্রিটি বলল, বাবু, একটা ভায়ামিটার ভাড়া করে নিলে ঢালাইটা ভাল হয়। শুধোলুম, ভায়ামিটারটি আবার কী ধরনের যন্ত্র হে? কী মাপে তাতে? রাজমিস্ত্রি আমার অজ্ঞতায় হাসে। বলে, ঠিক আছে, আমিই না হয় ভাড়া করে আনব। আপনি দামটা মিটিয়ে দেবেন। তথাস্তু। ঝামেলার থেকে বাঁচলুম আমি। নির্দিষ্ট দিনে সে ভায়ামিটার-সহ হাজির। যন্ত্রটা কাজ করতে শুরু করামাত্র বুঝতে পারলুম, আসলে ওটা একটা ভাইব্রেটর। আধা তরল মশলাগুলির মধ্যে গুঁজে দিলে, ভাইব্রেশনের মাধ্যমে মশলাগুলিকে বেশ বসিয়ে দেয়।

বছর-কয় আগে বন্ধুরা মিলে ফলতা গিয়েছিলুম। রাতটা ডাকবাংলোয় কাটিয়ে পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ফলতা দর্শনে। চারপাশে দেখার মতো কী কী রয়েছে, কিছুই জানি নে। পাকা রাস্তায় উঠেই ঠিক করি স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞেস করে নেব।

দু'পা না যেতেই এক ভ্যানওয়ালার দেখা পেলুম। শুধোলুম, হ্যাঁ ভাই, এই এলাকায় দেখার মতো কী রয়েছে?

ভ্যানওয়ালা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, আপনারা পিটার-জন জায়গাটা দেখে নিতে পারেন। 'বিউটি' জায়গা। আপনাদের ভাল লাগবে। ওই...ওইদিকে।

নিজেদের মধ্যে গবেষণা জুড়ে দিই, কিনা, পিটার-জন বলে কি কোনো জায়গার নাম হতে পারে? এক বন্ধু বলল, সম্ভবত সেন্ট পিটারের নামে কোনো গির্জা-টির্জা হতে পারে।

একটুখানি হাঁটার পর এক রিকশওয়ালাকে শুধোলুম, ভাই, পিটার জনটা কোনদিকে?

রিকশওয়ালাটি বয়েসে তরুণ এবং একটু লেখাপড়া জানা বলে মনে হল। ভুরু কুঁচকে বলল, পিটার জন? এমন জায়গার নাম তো শুনিনি।

বললুম, একজন ভ্যানওয়ালা একটু আগেই বলল যে।

একটুখানি ভেবে নিয়ে অকস্মাৎ যুবকটি উজ্জ্বল চোখে তাকাল। বলল, ও হো, বুঝেছি। এই বুদ্ধি না হলে ভ্যান চালাবে কেন! ওটা পিটার জন নয়, বাবু! জায়গাটার নাম হল, ফিটার জোন।

আমরা আরও ধন্ধে পড়ে গেলুম। পিটার জন কথাটার মধ্যে তাও একটা গির্জা-টির্জা ব্যাপার ছিল। কিন্তু ফিটার জোন তো একেবারেই সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিল।

কিছুটা হাঁটার পর একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের দেখা পেলুম আমরা। তিনি শুনে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন, জায়গার নামটি, আসলে, ফ্রি ট্রেড জোন। যান, ওইদিকে হাফ কিলোমিটারটাক পথ।

ও হরি, অশিক্ষিতদের মুখে পড়ে 'ফ্রি ট্রেড জোন'-এর এই হাল হয়েছে!

আন্দাজ করি, অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে এইভাবে কত শব্দই না কত রকমের বিকৃতি নিয়ে বেঁচে রয়েছে!

শব্দভ্রম

অশিক্ষিত মানুষের মুখে পড়ে শব্দের কতখানি গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে, সেই আলোচনার সূত্রপাত করেছিলুম আগের রচনায়। আলোচনাটা শেষ করা যায়নি। আজ তাই শেষ থেকে শুরু করেছি।

বলতে পারেন, শেষ থেকে আবার শুরু করা যায় নাকি? তবে আর তাকে শেষ বলেছে কেন? শুরু হয় শুরু থেকেই, শেষ হয় শেষে গিয়ে। শেষ থেকে শুরু, সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই বুঝি? তবে মিনিবাসের 'কন্ট্র্যাক্টর'রা কোন আক্কেলে প্যাসেঞ্জারদের সারাক্ষণ 'পেছনের দিকে এগিয়ে' যেতে বলে? 'দাদারা সব পেছনের দিকে এগিয়ে যান।'

অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে শব্দবিকৃতির বহর নিয়ে কথা বলছিলুম। 'এফিডেভিট' শব্দটি তাদের মুখে হয়েছে, 'এপিঠ-ওপিঠ'। 'ওভারসিয়ার'কে তো আমি নিজের কানেই 'ওপরশিয়াল' বলতে শুনেছি। কিংবা, 'এনকোয়ারি'কে 'ইঁদকুমারী'। দুটি ধাতুখণ্ডকে ঝাল দিয়ে জুড়ে দেওয়াকে ইংরেজিতে রিভিট (rivet) কবা বলে। প্রায় ষোলোআনা মিস্ত্রি তাকে 'রিপিট করা' বলে।



এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, ওই কীর্তনীয়াটির কথা। কীর্তন গাইতে গিয়েই একেবারে প্রথম পদটি ধরল, 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর'। কীর্তনের শেষে ওকে শুধোই, কথাটার মানে কী?

—মানে তো জানিনে। গুরু শিখিয়েছেন।

গুরু শুনে বললেন, ওটা একটা গোমুখ্যু। আসলে, পদটা হবে, 'পাক দিয়ে সুতো লম্বোদরো।

—এটারই বা মানে কী?

গুরুর গুরু শুনে তো হেসেই খুন। বলে, গোমুখ্যুদের পাল্লায় পড়ে আসল পদটির কী হাল হয়েছে! মূল পদটি হল, 'পার্বতীসূত লম্বোদর'। অর্থাৎ কিনা, পার্বতীর পুত্র লম্বোদর অর্থাৎ গণেশের বন্দনা নিয়ে কীর্তন শুরু করা হচ্ছে।

অশিক্ষিত মানুষজনকে দোষ দিয়ে লাভ কী? শিক্ষিত মানুষেরাও তো এ ব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে নেই। বরং তারাই অগ্রেঅগ্রে।

'মনের মণিকোঠায়' শব্দটাকেই বা কীভাবে ব্যবহার করে শিক্ষিতদের কেউ কেউ! বাংলায় এম-এ, ট্রেন-দুর্ঘটনায় মৃত এক সহকর্মীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বক্তৃতা করছেন, "সেদিন খবরটা পেয়েই আমরা গেলাম হরিপদর বাড়িতে। লাশ তখন হাসপাতাল থেকে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে। সারা শরীর প্রায় ছিন্নভিন্ন। বেশিক্ষণ চোখ মেলে দেখা যায় না সেই দৃশ্য। আমরা একটু বাদেই চলে এসেছিলাম। তারপর একটি বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে।"

'ওয়ান ফাইন মর্নিং' কথাটার প্রয়োগ দেখুন। ইংরেজিতে নিজেকে তুখোড় বলে মনে করেন এমনই একজনকে সেদিন বলতে শুনলাম, "আমাদের পাড়ায় একটা বুড়ো ছিল, রোজ সকালে ক্যান হাতে খাটালে দুধ আনতে যেত, ওয়ান ফাইন মর্নিং শুনলাম, লোকটা মরে গিয়েছে।"

'সিদ্ধহস্ত' কথাটাই ধরুন না। 'তিনি মিথ্যে কথা বলায় সিদ্ধহস্ত', কিংবা 'তিনি ঘোড়ায় চড়ায় সিদ্ধহস্ত', এমনকী, 'তিনি ফুটবল খেলায় সিদ্ধহস্ত', এমন মন্তব্য কি আকছার শুনতে পাইনে আমরা? অথচ শব্দটার বুৎপত্তিগত মানে হল, 'কোনো কাজে সিদ্ধ হয়েছে হস্ত যার'। অবশ্য মারাদোনার সেই বিখ্যাত 'ভগবানের হাতে'র গোলটির কথা মাথায় রাখলে ফুটবলে সিদ্ধহস্ত হওয়াটাকে খুব একটা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

'ফলশ্রুতি' (আসল অর্থ, শাস্ত্র শোনার পুণ্যফল) শব্দটা তো কবেই ভোল পাল্টে 'পরিণতি'তে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসবিদকে 'ঐতিহাসিক', কিংবা ভূগোলবিদকে 'ভৌগোলিক' তো ভূগোল-ইতিহাসের বইয়ের পাতায় পাতায় দেখতে পাই। 'এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক (historical!) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন...।' কিংবা 'প্রখ্যাত ভৌগোলিক (geographical!) মিঃ অমুকের মতে...।'

আমরা সেলুনে যাই চুল 'কাটতে'। ওষুধের দোকানে গিয়ে তো প্রায়ই মাথা ধরার বড়ি কিংবা বমির ওষুধ চেয়ে বসি অনেকেই। কোনো রসিক দোকানদার যদি বলে যে, 'মাথা ধরার বড়ি কিংবা বমির ওষুধ আমরা রাখিনে। আমরা মাথাধরা সারানোর কিংবা বমি বন্ধ



করার ওষুধ রাখি', তবে ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধে আমরা তার প্রতি যারপরনাই বিরূপ হয়ে উঠি। আর, 'উইদিন তিন ঘণ্টার মধ্যে', কিংবা 'আপ-টু বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত', 'সাধারণ কমনসেন্স জ্ঞান নেই', 'লাভ-ম্যারেজ করে বিয়ে করেছে', 'আর একবার রি-চেক করুন' 'অ্যাদ্দিন বাদে কেসটা আবার রি-ওপেন করেছে।' 'ইঞ্জিনটা বন্ধ কর, তারপর আবার রি-স্টার্ট কর।' অথবা 'ইন কেস যদি এমনটা ঘটে' 'বাই চান্স যদি এমনটা হয়' 'গাড়িটা পেছনে ব্যাক করে নিন।' 'আনটিল যতক্ষণ না ফিরে আসছি, তুমি থেকো' 'সবচেয়ে বেস্ট হয়, যদি তুমিই আমার বাড়িতে চলে আসো' গোছের কথা তো প্রায় বারোআনা 'শিক্ষিত' বাঙালিই আকছার বলে থাকে।

সরকারি বাসগুলোতে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে, দরজার মুখে লেখা, 'ওয়েট, টিল দ্য বাস স্টপস।' অর্থাৎ কিনা, বাস থেমে থাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। অর্থাৎ কিনা বাসটি

চলতে শুরু করলেই ওঠা-নামা করুন। নির্দেশটিকে টো-টো মান্য করতে গিয়ে হয়তো-বা কত যাত্রীই 'প্রপাত ধরণীতলে' হয়েছেন, তার খোঁজ কে রাখে! কত মানুষই তো 'আমার সম্মানে লেগেছে'র জায়গায় বলেন, 'আমার অপমানে লেগেছে।' কিংবা 'আমি কাল সারারাত নাইট ডিউটি করেছি।' অথবা 'চোরটাকে মারধর না করে পুলিশের হাতে হ্যান্ড-ওভার করে দাও' গোছের কথা আকছার বলে থাকে।

এমন কি, অ্যাস্পিরেশনকে অ্যাসপারশন (প্রত্যেকের জীবনে একটা অ্যাসপারশন থাকা উচিত), ভায়োলেশনকে ভায়োলেন্স (আপনারা কেউ রুল ভায়োলেন্স করবেন না), ইমপর্ট্যান্টকে কায়দা করে উচ্চারণ করতে গিয়ে ইমপোটেন্ট, ভ্যালু-কে ভ্যালুয়েশন (বাড়িটার ভ্যালুয়েশন কত হবে?), 'লিমিট'কে লিমিটেশন (যা মুখে আসে, তাই বলছেন যে! লিমিটেশন রেখে কথা বলবেন, মশাই।), 'মোটিভ'কে বলে মোটিভেশন (খুনের পেছনে খুনির মোটিভেশনটা কী?) গোছের কথা তো হরহামেশা শোনা যায়। অনেককেই দেখেছি, 'গুরুত্ব' বোঝাতে ইম্‌পর্ট্যান্স না বলে ইমপর্ট্যান্সী বলেন (আমার কাছে আর ব্যাপারটার কোনো ইমপর্ট্যান্সী নেই)। 'কনট্যাক্ট'কে (যোগাযোগ অর্থে) যে কত শিখিত মানুষ 'কন্ট্র্যাক্ট' বলে, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই (আমার এক বন্ধু রয়েছে, লালবাজারে চাকরি করে, ফোন নম্বরটা দিচ্ছি, কন্ট্র্যাক্ট করে দেখো। কিংবা, তাঁকে বাড়িতে গিয়ে পাইনি, ফোনেও কন্ট্র্যাক্ট করা যায়নি...।) কিংবা ডিল করাকে বলে ড্রিল করা (ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ড্রিল করতে হবে)। কিংবা 'একঘণ্টা আগেও সিনেমাহলে গিয়ে দেখি সব সিট ফুলফিল হয়ে গিয়েছে'। আর, বাসের কন্ডাক্টরকে তো অনেকেই কন্ট্রাক্টর বলেন। 'ডিটেরিয়েট' (খারাপের দিকে যাওয়া) শব্দটিকে কত শিক্ষিতজন যে 'ডেটোরেট' বলে থাকেন! ম্যাসাকার (massacre)-এর আসল অর্থ হত্যা, কিন্তু অনেকেই শব্দটাকে 'ভণ্ডুল' অর্থে ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত (ফাংশানটা ঠিকঠাক চলছিল, আচমকা বৃষ্টিটা এসে সব কিছু একেবারে ম্যাসাকার করে দিল)। 'কেনাকাটা' অর্থে কত-কত শিক্ষিত মানুষ যে 'শপিং' না বলে 'মার্কেটিং' বলে (সন্ধেবেলা আমরা একটু মার্কেটিং-এ বেরোব)! এয়ারকন্ডিশনড-কে বাংলায় 'শীততাপনিয়ন্ত্রিত' (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হবে) বলেন এমন শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা কিছু কম নাকি!

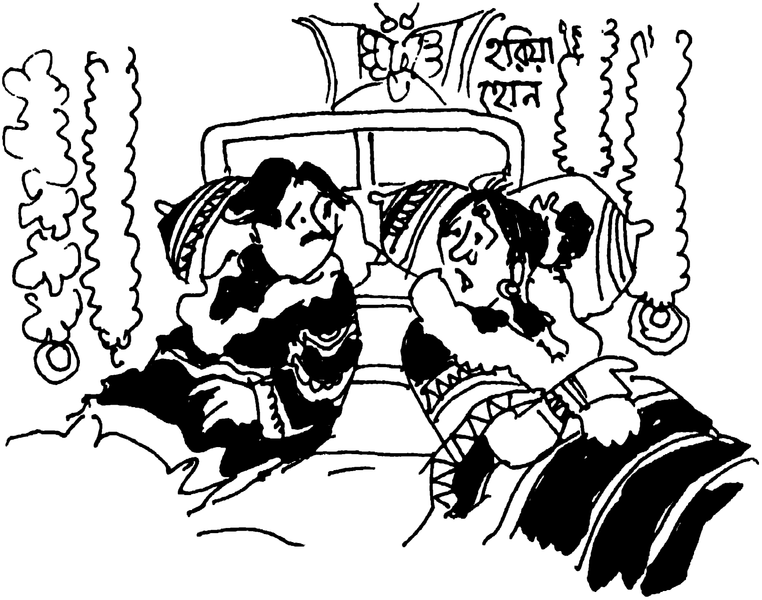
সত্যি বলছি, একদিন আমার অফিসের এক সহকর্মী আমাকে 'নির্যাস' শব্দের ইংরেজি স্পেলিং জিজ্ঞেস করেছিল।

—বলতে পারেন, নির্যাস-এর স্পেলিংটা এন-আই-আর-জে-ইউ-এস হবে, নাকি জেড-ইউ-এস হবে?

এইসব ভুল যদি ধরিয়ে দিতে চান, তবে অশিক্ষিতরা তবুও মেনে-টেনে নেবে। কিন্তু শিক্ষিতরা? সর্বনাশ! ওই কম্মোটি ভুলেও করতে যাবেন না। একেবারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে।

তাই ইদানীং আর ওসব নিয়ে তেমন ভাবিনে। কারণ, ভেবে-ভেবে, ভেবে দেখলাম, ভেবে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া, ভূরি ভূরি কথা বলতে গিয়ে ইন কেস যদি কেউ দু-চারটে ভুল শব্দ ব্যবহার করে বসে, তাই নিয়ে আমারই বা মাথার মধ্যে এত হেডেক্ কেন?

উশ্চারণ



সেই একটা চুটকি রয়েছে না, প্রাইমারি স্কুলের একটি দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াকে স্কুল ইন্সপেক্টর শুধোলেন, কোন্ শ্রেণিতে পড় ? তার জবাবে ছেলেটি বলে, দ্রিতীয় শ্রেণি। শুনে ইন্সপেক্টর সাহেব মুচকি হেসে বললেন, ব্রেশ, ব্রেশ। পড়ুয়াটিকে পরে চেপে ধরাতে পড়ুয়াটি এমন যুক্তিই দেখিয়েছিল যে, যেহেতু প্রথম শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি, সবক'টিতেই রেফ কিংবা র-ফলা রয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণিতেও নির্ঘাত একটি রেফ কিংবা র-ফলা রয়েছেই। 'দ্বিতীয়' কথাটা সম্ভবত 'উশ্চারণেরই' দোষ।

এইরকম আর একটি চুটকি হল, পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে গিয়েছে। মেয়ের নাম বিন্দুবাসিনী। মায়ের নাম বজ্রপ্রভা। পাত্রপক্ষ মেয়েটিকে শুধোলেন, তোমার নামটি কী মা ? মেয়েটি গম্ভীর গলায় জবাব দিল, ব্রিন্দ্রুব্রাসিনী ব্রোস। সম্ভবত মায়ের নামটি বজ্রপ্রভা হওয়ায় মেয়েটির ধারণা হয়েছিল, তার নামটিও একাধিক র্-ফলাখচিত, কিন্তু 'উশ্চারণে'র দোষে তাকে সবাই বিন্দুবাসিনী বলে ডাকে। পাত্রপক্ষ মজা পেয়ে বললো, ব্রা ব্রেশ, ব্রা ব্রেশ।

এর উল্টো উদাহরণও রয়েছে। শিক্ষকের মুখোমুখি হয়ে ছাত্রটি বলল, পণাম স্যার।

শিক্ষক—প'‌'‌মে একটা র-ফলা যোগ কর্।

ছাত্র—ওহো. ভম হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষক—ভ'‌ে একটা র-ফলা যোগ কর্।

ছাত্র—উহ্, আপনার সঙ্গে কথা বলা তো ব্রিপদ।

আমার এক পরিচিত নাট্য-পরিচালকের কাছে একদিন এক যুবক এল। সে ওই পরিচালকের সংস্থায় অভিনয় করতে চায়। পরিচালকের সঙ্গে ওই যুবকের সেদিনের কথোপকথন ছিল এইরকম :

পরিচালক—তোমার নাম কী?

যুবক—পণব চক্কবত্তী।

পরিচালক—কোথায় থাকো?

যুবক—শীরামপুরের পকাশপল্লীতে।

পরিচালক—এখন কোন দলে রয়েছ?

যুবক—পগতি নাট্যগোষ্ঠীতে।

পরিচালক—কার দল? ডাইরেক্টর কে?

যুবক—পভাস তিবেদী।

পরিচালক—এখন কী নাটক চলছে?

যুবক—পনয় পকিতি।

পরিচালক—ওই নাটকে কী রোল কর?

যুবক—বিদ্ধ জমিদারের যুবতী বউয়ের পেমিকের রোল করি।

পরিচালক—তো, ওই দল ছাড়তে চাইছ কেন?

যুবক—ওই দলের তেমন কোনো পচার নেই।

ঘটনাটা বলতেই আমার এক ইছাপুরীয়া বন্ধু বলল, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ এলাকায় বহু মানুষ কোনো এক রহস্যময় কারণে র-ফলা বর্জন করেছে। ওই এলাকায় বালক-ব্রহ্মচারীর আজীবন শিষ্যটি গুরুকে 'বালক-বহ্মচারী' বলে। 'শ্রীশ্রী তারকনাথ' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এমন একজন ইছাপুরীয়া তো 'আপনি যেন কোন্ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন?'-এর জবাবে প্রতিবারই বলেন, 'শীশীতারকনাথ'।

—মানে, শ্রীশ্রী তারকনাথ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শীশীতারকনাথ।

—অনেক মেহনতেও কিছুতেই তাঁর 'শী-শী'কে 'শ্রীশ্রী' করা গেল না।

বেচারি মফস্বলী নাট্যকর্মীদের দুয়ো দিয়ে লাভ কী? আজীবনকাল কলকাতাবাসিনী এক বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকাকে যে মঞ্চ কাঁপিয়ে কতবার গাইতে শুনেছি, তোড়া যে-যা বলিস ভাই, আমাড় সোনাড় হড়িণ চাই..., কিংবা, ওড়ে ভী...ড়ু, তোমাড় উপড় নাই ভুবনেড় ভাড়...। র-কে ড় বলা বাঙালি এখন, আমার তো মনে হয়, ফিফটি পারসেন্ট। তাঁরা সবাই ঘড় ভারা দেন, কাপর পড়েন এবং বই পরেন। আর, আমার সেই ছেলেবেলায়, এক বাঙাল বন্ধু পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে 'নর' শব্দের রূপ 'নড়-নড়ৌ-নড়া নড়ে-নড়ৌ-নড়ান, নড়েন-নড়াভ্যাম্' অবধি বলতেই 'ওরে বুড়ো ভাম' বলে পণ্ডিতমশাই এমনই এক পেল্লায়



চড় মেরেছিলেন ওর গালে যে, ওপরের পাটির একটা দাঁতই নড়ে গিয়েছিল।

ঘোর নস্যি ঠুসে ঠুসে নাকের এমনই বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে যে, সে আর কোনো ন'ই উচ্চারণ করতে পারে না। সে নস্যিকে লস্যি বলে। ওরে, এত লস্যি লিস নি। এত লস্যি লিলে লস্যিকে আর লস্যি বলতে পারবি লি। যদি বলিস, আমি কী করে বলি, তো সেটা হলো অভ্যেসের গুলে (গুণে)।

এই পর্যন্ত ঠিক আছে, কেন কি, আপনি আপনার ছাগলটিকে কোন দিক দিয়ে কাটবেন, অর্থাৎ আপনার কথাটিকে আপনি কেমনভাবে উচ্চারণ করবেন তা সম্পূর্ণত আপনার নিজের ব্যাপার। ব্যাঙকে 'বেঙ' কিংবা ভেক্‌কে 'ভ্যাক্' বলে ডাকলে ব্যাঙ তেড়ে মারতে আসবে না। অন্যেরা বড় জোর আপনার উদ্ভট উচ্চারণ শুনে হাসাহাসি করতে পারে, কিন্তু ভুল উচ্চারণের জন্য যদি বিভ্রাট বেধে যায়? তবে?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই সদ্য বিবাহিত যুবকটির কথা। সে ছিল ঘটি। বউ ছিল বাঙাল। বন্ধুদের পরামর্শমতো যুবকটি ফুলশয্যার রাতে নববধূর গায়ে আলতো হাত রেখে শুধোল, বিয়ের পর বউকে কিছু দিতে হয়। বল, কী চাই তোমার? জবাবে নববধূ লজ্জায় লাল হতে হতে বলল, হরিয়া হোন। স্বামীর কাছে বোধগম্য হল না কথাটা, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, কালই এনে দেব।

পরের দিন কলকাতার এ-দোকান সে-দোকান হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল যুবকটি, কিন্তু হরিয়া-হোন নামক বস্তুটি কোনো দোকানেই পাওয়া গেল না।

দিনভর ঘুরে ঘুরে বিকেল নাগাদ ঝড়ো কাকের মতো ঘরে ফিরছিল যুবকটি, পথে এক প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে দেখা। যুবকটিকে দেখে বন্ধুর ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। বলে, কী ব্যাপার, কালই তো তোদের ফুলশয্যে গেল, আজই এমন হাল কেন?

যুবকটি কাঁদো কাঁদো গলায় তার বিপদের কথাটা খুলে বলল। শুনে হো-হো করে হাসতে হাসতে বন্ধুটি বলল, আর তোকে হরিয়া-হোন খুঁজতে হবে না, বাড়ি যা। তোকে কাল রাতে তোর বউ বলেছিল, সরিয়া শোন। তোকে সরে শুতে বলেছিল।

এ'তো গেল বঙ্গভাষীদের উচ্চারণ-বিভ্রাট। ভিন রাজ্যের মানুষের মধ্যেও উচ্চারণ বিভ্রাট কিছু কম নাকি? প্রথমেই বলি পাঞ্জাবিদের উচ্চারণ নিয়ে গুটিকয় কথা। এটা বোধ করি অনেকেই জানেন, পাঞ্জাবিরা শব্দের প্রথমে থাকা যুক্তাক্ষরকে বড় একটা উচ্চারণ করতে পারে না। স্কুলকে বলে 'সকুল', স্টিলকে বলে 'সটিল', স্টেনলেসকে 'সাটেনলেস'...। তো, একদিন নিজের কারখানার একজন পাঞ্জাবি কর্মচারীকে তার হিন্দিভাষী মালিক একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলল, স্টেশনে যা, এই চিঠি গুড্স-ক্লার্কের হাতে দিবি, কলকাতা থেকে বুক করা স্টেনলেস স্টিলের সামানগুলো এসে পৌঁছল কি না জেনে আসবি। পাঞ্জাবি কর্মচারীটি খানিক বাদে ফিরে এসে জানাল, কোই সমান আয়া নেহি। মালিক শুধোল, তুই চিঠিটা মালবাবুকে দিয়েছিলি? শুনে পাঞ্জাবি কর্মচারীটির স্মার্ট জবাব, খৎকা ক্যা জরুরৎ হ্যায়? ম্যায়নে খোদ পুছা।

—ক্যা পুছা?

—পুছা, সটেনলেস সটিল্‌কা সামান আয়া জী?

শুনে মালিক কর্মচারীটিকে এই মারে তো সেই মারে। চিৎকার করে বলে ওঠে, তুই এমনটাই বলবি, এই আশঙ্কায় আমি মুখে না বলে চিঠি লিখে দিলাম, তুই ফের মুখে বলতে গিয়েছিস হতভাগা।

বলা বাহুল্য, সেদিন ওই কর্মচারীটির সম্প্রদায়গত ভুল উচ্চারণের ফলে তার মালিকটির যারপরনাই ক্ষতি হয়েছিল।

'উশ্চারণ' নিয়ে মজার কথা বলতে বসলে সে আর ফুরোবে না। কিন্তু তা বলে, তাই নিয়ে উচ্চারণকারীকে কিছু বলা চলবে না। বললে কী হবে? এ ব্যাপারে তাহলে ঢাকাই বাঙালদের নিয়ে ওই চালু চুটকিটাই নিবেদন করি। ওই যে, এক ঢাকাই বাঙালকে তার কলকাত্যাইয়া ঘটি বন্ধুটি শুধোল, তোমরা 'শ'কে 'হ' বল কেন? তার জবাবে ঢাকাইয়া বাঙাল খেপে গিয়ে বলে ওঠে, কুন হালায় কয়?

—ওই তো বললে।

—না, না, বলি নাই। তুমি হুনতে ভুল করসো।

—এই তো আবার বললে।

—কইসি তো কইসি, কুনো হমুন্দির তাতে কী?

আ মেরি বাঁগলা ভাষা

বাঁগলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে কিছু পাতি বুদ্ধিজীবী যে এমন খেপে উঠেছে কেন, বুঝি নে। যদিও আমি বাঁগালি, তবুও অ্যাডমিট করতে দ্বিধা নেই, বাঁগলা ভাষায় আমার গিয়ান নিতান্তই ভাসাভাসা। আর, বাঁগালি সংস্কৃতি বস্তুটি যে ঠিক কী, খায় না মাখে, সেটাই আমি ঠিক রিয়েলাইজ করে উঠতে পারিনে। অথচ চারপাশে সবাই যেমন 'বাঁগলা ভাষা, সংস্কৃতি' করে খেপে উঠেছে, ভয় করে।

এই তো সেদিন, আমার থিয়োরিটা শুনে এক বাঁগালি বুদ্ধিজীবী একেবারে খেপে ফায়ার। বললেন, শোচ-সমঝকর রাত বলবেন, মশাই। আফটার-অল, বেঙ্গলি আমাদের মাদার-টাং। বেঙ্গলি কলচরের মতো রীচ কলচর আপনি দেখেছেন কোথাও? সেই রীচ ল্যাংগু আর কলচর কিনা আজ হিন্দি ইমপেরিয়েলিজমের খপ্পরে পড়ে কোথায় পৌঁছেছে! টিভির দিকে তাকালেই তো মালুম হয় সেটা। সারা সন্ধে কেটে যায়, একটা ভাল বাঁগলা সিরিয়াল নেই! বাঁগালির গান, বাঁগালির মিউজিক, ড্রামা, বাঁগালির কত্থক, মণিপুরী, ওরিসি,



কথাকলি, ভরতনাট্যম—আমাদের সেই সনাতন আর্য সংস্কৃতির সবটাই আজ উধাও! এরা ভেবেছেটা কি?

আর একজন বুদ্ধিজীবীর কাছে কথাটা তোলায় তিনি চাঁছাছোলা গলায় বলে উঠলেন, আরে, আর্যরা তো বাঁগলাদেশ অবধি আসেইনি। এসেছিল মুসলমানরা, এবং অবশ্যই ইংরাজরা। তারাই বাঁগালি জাতটাকে যা একটু-আধটু ঘষেমেজে বানিয়ে-টানিয়ে দিয়ে গেছে। ওরাই যা আমাদের একটু-আধটু কলচর-টলচর দিয়ে গেছে। তা, ভাষা বলুন, সংস্কৃতি বলুন, সবই তো ওদেরই দান। ইংরেজি কার্টসি আর ম্যানার্স, এবং মোগলাই সহবত না পেলে আমরা তো বুনোই থেকে যেতুম।

বাস্তবিক, কিছু বুদ্ধিজীবী তো এখনো অবধি রয়েছে, যাদের মতে, অনার্য, অসভ্য বাঁগালিকে কিছুটা সভ্য করে গিয়েছে বৃটিশরা, বাকিটুকু এখন করছে দিল্লি আর মুম্বই। নইলে, এ এমনই এক ভাষা, যাতে একটি সেনটেন্সও পুরো বলবার মতো সাফিসিয়েন্ট ভোকাবুলারিই নেই। আবার, একই শব্দের তিন-চার কিসিমের স্পেলিং হয়। গরু/গোরু, হাতী/হাতি, বলল/বললো/বোললো, ...সবগুলিই নাকি ঠিক। এ ভাষায় বেড়াল মানে ক্যাটও হয়, আবার বেড়ানোও (বেড়ালো) হয়। মানব মানে মানুষও আবার মানবো'ও। খেত মানে চাষের জায়গা, আবার 'খেতো'ও। কমল মানে পদ্মফুল, আবার 'কমে গেল'। স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে এমন চরম মাৎসন্যায় আর কোনো ভাষাতে মিলবে?

—আসলে এলিটদের ভাষাই নয় এটা। একান্তে বললেন এক বাঁগালি বুদ্ধিজীবী,—একেবারে চাষাভুষোদের মুখের ভাষা। কবি তো পদ্য লিখে বলেই গিয়েছেন তা। ওই যে, 'কী যাদু বাঁগলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে ধান কাটে চাষা...'।

—বাঁগলা বলতে ভাই আমি বুঝি দুটো বস্তু। বললেন এক সুরসিক বুদ্ধিজীবী,—বাঁগলা পান আর বাঁগলা গান। বাঁগলা পানে ঝালটা বেশি, বাঁগলা গানে তালটা কম। কেমন যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে, টেনে—টেনে—। বাঁগলা গানে সেই কোমর নাচানো রিদমটাই অ্যাবসেন্ট।

—আপনি বাঁগলা পছন্দ করেন না? প্রশ্ন রেখেছিলাম এক যথার্থ সুরসিক (অথবা সুরাসিক) বাঁগালির কাছে।

প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, করিনে আবার? বাঁগলাই তো আমার পহেলা প্যার। বুঝলে ব্রাদার, এক নম্বর বাঁগলা পেলে চেখে দেখো, কোথায় লাগে তোমার বিলাইতি। কবি কি সাধে লিখেছেন, মদের গরব মদের আশা, আ মেরি বাঁগলা খাসা।

বুদ্ধিজীবীদের একটা মারাত্মক বিউটি হল, তাঁরা কোনোকিছুতেই একমত হন না। এমন কি কথাটা 'একমত' হবে, নাকি 'ঐক্যমত' হবে, নাকি 'ঐকমত্য', এ ব্যাপারেও তাঁরা একমত নন। আসলে, একমত হওয়াটা তাঁদের ধাতে নেই। সেই কারণেই সম্ভবত 'কী যাদু বাঁগলা গানে'র প্রসঙ্গ তুলতেই এক বিপরীত মেরুর বুদ্ধিজীবী বললেন, ওই গানটাতে বোধ করি 'গান' বলতে বন্দুক বোঝাতে চেয়েছেন কবি। বাঁগলা গান বলতে সম্ভবত দেশি বন্দুকই বোঝাতে চেয়েছেন, যার অধুনা সংস্করণ হল পাইপ-গান। গানের জগতে যেমন পপ-গান, বন্দুকের দুনিয়ায় তেমনি পাইপ-গান। আর, পাইপ-গান নামক অভিনব বাঁগলা গানটির যে কতখানি যাদু, তা তো শতমুখে বলেও শেষ করা যাবে না।

শুনতে শুনতে আমার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। শুধু এক বাঁগলা গানেরই এত

অর্থ, এত ব্যঞ্জনা। এই ভাষার সাহিত্য বুঝি এই কারণেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে!

—কে বলেছে বাঁগলায় নোবেল পেয়েছে? মুচকি হেসে বললেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন 'মৌলিক' গবেষক। বললেন,—'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গার্ডেনার'। বাঙালির ভাব, ইংরেজের ভাষা, বাকিটা নিজগুণে বুঝে নিন, কে পেল প্রাইজটা।

—তাও, একজন বাঙালির হাতেই তো তুলে দেওয়া হয়েছে প্রাইজটা।

—বাঙালি! কুশারি, ঠাকুর, এরা যে কেমন বাঁগালি কে জানে, ব্রাদার! বাঁগালি হবে ঘোষ, বোস, মিত্তির, বাঁড়ুজ্যা, চাটুজ্যা, মুখুজ্যা...।

—ঘাবড়াবেন না, হতাশ হবেন না, এবার খোদ সরকার নেমেছে মাঠে। বাঁগলা ভাষার প্রসারের জন্য অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারি অফিসগুলোতে বাঁগলা ভাষা চালু করবার জন্য ইদানীং ঘনঘন চিঠি যাচ্ছে মফঃস্বলের অফিসগুলোতে। যদিও ওই চিঠিগুলোর সবই যাচ্ছে ইংরেজিতে।

—ইদানীং ওই যে বাঁগলা একাডেমিটা হয়েছে, ওটা যদি কিছু করতে-টরতে পারে।

ওই যে বললুম, বুদ্ধিজীবীরা কখনোই একমত হবেন না, ওটাই ওদের বিউটি। তাই বাঁগলা একাডেমির প্রসঙ্গটা তুলতেই খেপে ফায়ার হয়ে গেলেন অপর এক সরকারি মহলে কলকে না পাওয়া বুদ্ধিজীবী। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বাঁগলা একাডেমি। নামেই তো মালুম হয় সেটা। নইলে বাঁগলা ভাষার বিকাশের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা একটি সংস্থার পুরো নামটা নিজের মাতৃভাষায় রাখতে পারল না! কিনা একাডেমি!

—বাঁগলা একাডেমি। ফোঁস করে উঠলেন আর এক বুদ্ধিজীবী—,—আপনি হাসালেন মশাই। তার মুরোদ আর কতটুকু? নামেই তো মালুম তা। সে তো একা এবং সরকারের ডেমি। ওর ঘাড়ের ওপর সর্বদাই নিঃশ্বাস ফেলছে সরকারি দফতর। আর, এটা তো মানবেন যে, যেখানে সরকার ঢোকে, সেখানে সবকিছুর দফা গয়া করে ছাড়ে। সারাক্ষণ 'জিয়ো...জিয়ো...' (মানে G.O.) করতে গিয়ে সবকিছুর মরণঘণ্টা বড় জলদি বাজিয়ে দেয়।

—কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়লে আমাদের অস্তিত্বের কোনো মূল্য থাকে কি? মাতৃভাষা তো মাতৃদুগ্ধের ন্যায়।

—মাতৃদুগ্ধ খাইনি মশাই, গোদুগ্ধও নয়। খিঁচিয়ে উঠলেন এক নব্য বুদ্ধিজীবী,—আমরা এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাগ্যবান। যাকে বলে, সেরা লাকি। মানে, আমাদের কপালে সেই শিশুকাল থেকেই জুটেছে সেরা লাক। অর্থাৎ কিনা, সেরেলাক।

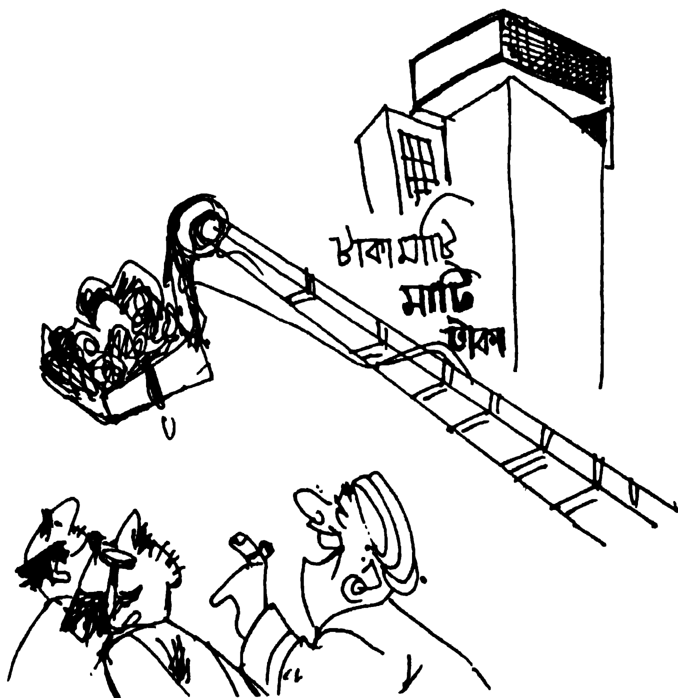
সেরেলাক—সেরেলাক—সেরেলাক। বাহান্নটি প্রয়োজনীয় উপাদানে তৈরি। আপনার শিশুর পুষ্টির জন্য। টিং-টং।

নানা মুনির নানা মতো

ছেলেবেলা থেকেই বড়রা বলে আসছেন, সর্বদা মনীষীদের কথা মেনে চলবে। মনীষীরা কত জ্ঞানী-মানী মনিষ্যি! তাঁদের বাণীগুলি মণিমুক্তোর চেয়েও দামি। মানির নিরিখে তাদের দাম লাখ-লাখ টাকা। সেই কারণেই আমি সেই ছেলেবেলা থেকে বইপত্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞানী-মানীদের বাণীগুলোকে খুব মানি।

কিন্তু মনীষীদের বাক্যি মেনে চলার যে কত ঝক্কি, তা আমি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছি।

এক জায়গায় এক মনীষীর বাণী পড়লাম, 'যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব, সবারে যাব তুষি।' কথাটা খুবই মনে ধরল আমার। সবাইকে, এমনকী দুষ্ট লোককেও তুষ্ট করে চলাটাই আমার জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়াল। ঠিক তেমনি সময়ে অন্য এক মনীষীর বাণী পড়লাম র‍্যাপিড-রিডিংয়ের বইয়ে। সেখানে লেখা হয়েছে, He who tries to please everybody can please nobody, অর্থাৎ যে সবাইকে তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেই তুষ্ট করতে পারে না। শোনা



অবধি ধন্দ লাগল মনে। এ যে একেবারে উল্টো বাণী। দু'জনের মধ্যে কোন মনীষীর কথা মানব তবে! দুত্তোর।

আর একটা বাণী শুনে খুব উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম ছেলেবেলায়। 'সদা সত্য কথা বলিবে।' সত্যবাদিতার পাঠ যখন সবে নিতে শুরু করেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অন্য বাণী পেলাম, 'সত্য কথা বল, তবে কিনা, কদাচ অপ্রিয় সত্য কহিও না।' মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। দ্যাখো কাণ্ড, তাহলে কি আমাকে বাছ-বিচার করে সত্যি কথা বলতে হবে?

এক মনীষী বললেন, 'আ ম্যান ইজ নোন বাই হিজ কম্প্যানি হি কিপ্‌স্'। অর্থাৎ কিনা, মানুষ চেনা যায় তার সঙ্গীকে দেখে। অর্থাৎ কিনা, 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। তাই শুনে যখন খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, ঠিক তখনই আর একজন মনীষী-কবির লেখা পড়লাম, 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে/তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে'। অর্থাৎ কিনা, ভাল ছেলেদের সর্বদাই বদ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। কেবল মিডিওকাররাই খারাপ ছোকরাদের থেকে দূরে থাকে।

বলা হয়, গ্রেট মেন থিংক অ্যালাইক। মানে কিনা, সব মনীষীই একই লাইনে ভাবতে অভ্যস্ত। আবার এও বলা হয়, ফুল্‌স হার্ডলি ডিফার, মানে কিনা, বোকাদের মধ্যে কদাচিৎ মতের অমিল দেখা যায়। অর্থাৎ সব বোকারাই একই লাইনে ভাবে। ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? সব মনীষীই এক লাইনে ভাবে, আবার সব বোকাও একই লাইনে ভাবে। অর্থাৎ বোকা-বুদ্ধিমান নির্বিশেষে সব মানুষই এক লাইনে ভাবে।

এই আপ্তবাক্যটি মেনে নিতে গিয়েও ফের অন্য বিপত্তি। কারণ, এর উল্টো কথাটাও মজুত। 'নানা মুনির নানা মতো'। অর্থাৎ এক-এক মনীষী এক-এক ধারায় ভাবতে অভ্যস্ত। রামকৃষ্ণই তো বললেন, যত মতো, তত পথ।

জীবপ্রেমী একজন বললেন, জীবে দয়া কর। 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। আবার, অহিংসার ধ্বজাধাবী এক কবি হিংস্র জন্তুদের মধ্যে অহিংসার বাণী প্রচার করতে গিয়ে লিখলেন, 'সিংহমশাই, সিংহমশাই মাংস যদি চাও/রাজহংস খেতে দেব হিংসা ভুলে যাও।' পড়তে পড়তে সেই ছেলেবেলাতেই নিদারুণ ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। কেন কী, যে সিংহকে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাকে একটি রাজহাঁস উপহার দেওয়ার মানে কী? রাজহাঁস মেরে খাওয়াটা কী ধরনের অহিংসা। গান্ধীজী বলেছেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। আবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'।

প্রবাদ-প্রবচনও তো মনীষীতুল্য মানুষজনের গাঢ় ও গূঢ় উপলব্ধির নির্যাস। সেখানেও পরস্পরবিরোধিতার অন্ত নেই। 'চোরের মায়ের বড় গলা' আর 'চোরের মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে', এই দুটো প্রবাদের মধ্যে চোরের মায়ের একেবারে উল্টো দু'ধরনের চরিত্র ফুটে ওঠে। কেউ বলেছেন, 'চুরি করা মহাপাপ', আবার কেউ বলেছেন, 'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড় ধরা'। কিংবা একজন বললেন, 'পড়াশোনা করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই', অন্যজন বললেন, 'পড়বি-শুনবি থাকবি দুঃখে, মৎস্য মারবি, খাইবি সুখে'। অর্থাৎ কিনা, পড়াশোনা না করে, ওই সময়টাতে মাছ-টাছ ধর, ফূর্তিফার্তা কর, তাতেই সুখে থাকবে। উপনিষদের এক ঋষি বললেন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। অর্থাৎ কিনা, ঋণ করেও ঘি খেয়ো।

ইউরোপের আর এক মনীষীও ওই সঙ্গে গলা মেলালেন, ইট ড্রিংক, অ্যান্ড বি মেরি। উপনিষদের আর এক জায়গায় বলা হলো, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। মানে, ভোগ নয়, ত্যাগই কাম্য।

এক মনীষী বললেন, দুনিয়ার গভীর বিষয়গুলিকে অন্তর্দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার নামই দর্শন। আবার, বাইবেলের রচয়িতা বললেন, দর্শন হল গাঢ় অন্ধকার রাতে একজন অন্ধের এমনই একটি কালো বেড়ালের সন্ধান করা, বাস্তবে যার কোনোরূপ অস্তিত্বই নেই। বোঝো ব্যাপারটা!

এক মনীষী বললেন, দারিদ্র্য-মানুষের জীবনে এক মহা অভিশাপ। আবার, এক কবি বললেন, হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান...। একজন বললেন, পৃথিবী টাকার বশ। আবার রামকৃষ্ণদেব বললেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।

কেউ কেউ বলেন, বিত্তবানরা দেব-দ্বিজে অর্থ দান করে স্বর্গের পথ প্রশস্ত করেন। আবার বাইবেলে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, একটা সূঁচের ফুটো দিয়ে একটা উটও গলে যেতে পারে, কিন্তু বিত্তবানরা কিছুতেই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারে না। একজন বললেন, বৈরাগ্যেই মুক্তি। অন্যজন বললেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,/অখণ্ড বন্ধন মাঝে মহানন্দময়,/লভিব মুক্তির স্বাদ।

একজন বললেন, দশে মিলি করি কাজ, হারি-জিতি নাই লাজ। অন্যজন বললেন, too many cooks spoil the broth, যাকে বাংলায় বলে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

একই কবি, এক জায়গায় লিখছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' অন্য জায়গায় লিখছেন, মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান।'

একদল বললেন, পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, 'এ জীবন মন সকলি দাও/তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথাও ভুলিয়া যাও।' কিংবা, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' অন্যদল বললেন, পরের কথা পরে ভাববি, চাচা আপন পরান বাঁচা। কিংবা, আপনি, বাঁচলে বাপের নাম। কিংবা নিজের চরকায় তেল দাও। কিংবা, charity begins at home. কার কথা মানি?

গুরুজনেরা প্রায়ই উপদেশ দেন, health is wealth অতএব, স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হও। আবার প্লেটো বললেন, attention to health is the greatest hindrance ro life. অর্থাৎ স্বাস্থ্যের প্রতি খুব মনোযোগ দিলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। ভার্জিলও একই কথা বললেন, he destroys his health by labouring to preserve it অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষায় বেশি যত্নবান হয়ে মানুষ স্বাস্থ্যেরই বারোটা বাজায়।

মানুষের জীবনে মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি কোনটি? কান্ট বললেন, মস্তিষ্ক। হেগেল বললেন, হৃদয়। মার্কস বললেন, উঁহু, উদর। ফ্রয়েড বললেন, আসল নিয়ন্ত্রক হল লিঙ্গ বা যৌনতা (সেক্স)।

একজন বললেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর একজন বললেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

কী গেরো বাবা! একজন বলছে, ব্রহ্ম সত্য, অন্যজন বলছে, মানুষ সত্য। এই দুই সত্যের জাঁতাকলে পড়ে আমাদের মতো অর্বাচীনদের যে নাজেহাল অবস্থা। কার কথা মানি!

জেলের ভাত

কোনো বদখত মানুষকে আমরা হরবখত বলে থাকি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। বলাই বাহুল্য, এমন কথায় কারোরই পুলকিত হওয়ার কথা নয়। কেন না, জেলের ভাত আর যাই হোক, খাদ্য পদবাচ্য বলে ভুক্তভোগীরা কখনই স্বীকার করে না। জেলের ভাত তো ভাত নয়, লপসি। সেটা কী বস্তু, তা পরখ করার সুযোগ এই অধমের এখনও অবধি হয়নি।

কিছুদিন আগে আচমকা একজন জেলারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। অমনি জেল সম্পর্কে আমার আবাল্যলালিত কৌতূহলটা সহসা চাগিয়ে উঠল। কিন্তু জেলের খাওয়া-দাওয়া, জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁকে যতই প্রশ্ন করি, তিনি মিটিমিটি হাসতে থাকেন। জবাব আর দেন না কিছুতেই।

বন্দীপিছু ১.৮১ গ্রাম



একসময় আমি খোঁচা মারার কায়দায় বলে উঠি, জবাব দিচ্ছেন না কেন, মশাই? মন্ত্রগুপ্তি-টুপ্তি নাকি? বাইরে ফাঁস করে দিলে চাকরি-টাকরি চলে যেতে পারে?

লম্বা করে মাথা নাড়লেন জেলার-সাহেব, না, না। চাকরি কেন যাবে?

—তবে? বলতে চাইছেন না কেন কিছুতেই? আর কিছু না বলুন, অন্তত জেলের লপসির উপাদান আর কেমিস্ট্রিটা একটু খোলসা করে বলুন না। তেমন উপাদেয় হলে আমরা সংসারী মানুষেরাও আমাদের খাদ্যতালিকায় তো অ্যাড করে নিতে পারি রেসিপিটা।

একটুক্ষণ চুপ মেরে থাকেন জেলার সাহেব। একসময়ে বলেন, শুধু লপসি কেন, জেলের সব কিসিমের খাবার-দাবারের সম্পর্কেই বলতে পারি।

—পারেনই যদি, তাহলে তখন থেকে খালি কোঁৎ পাড়ছেন আর ঢোঁক গিলছেন কেন?

—আসলে, জেলে বন্দীপিছু যা-যা বরাদ্দ হয়, এবং যে পরিমাণে বরাদ্দ হয়, তার ফর্দটা বেশ জটিল এবং মজার। বলতে বলতে হাসি পেয়ে যেতে পারে।

—জটিল? মজার? হাসি পেয়ে যায়?

—ইয়েস, হাসি পেয়ে যায়। এই যেমন ধরুন, জেলে সকালবেলার জলখাবারের জন্য বন্দীপিছু দৈনিক বরাদ্দ, ৮৭ গ্রাম চিঁড়ে অথবা মুড়ি।

—৮৭ গ্রাম! পরিমাণটা ৮০, ৮৫ কিংবা ৯০ না হয়ে ৮৭ গ্রাম! কেন এমন আজব পরিমাণে বরাদ্দ হয়?

—এই দেখুন, আপনি প্রথম থেকেই এত 'কেন, কেন' করলে শেষ অবধি 'কেন'র বরাদ্দেই টান পড়বে মশাই। এখন কেবল শুনে যান। প্রশ্ন করার অনেক সময় পাবেন। যা বলছিলাম, চিঁড়ে/মুড়ি ৮৭ গ্রাম, সঙ্গে ভেলিগুড়ের বরাদ্দ বন্দীপিছু সাড়ে চোদ্দ গ্রাম।

—সাড়ে চোদ্দ গ্রাম! তেরোও নয়, পনেরোও নয়, সাড়ে চোদ্দ গ্রাম!

—এই দেখুন, আপনি কথায় কথায় অত অবাক হলে শেষের দিকে সামলাবেন কী করে?

—না, না, সরি, বলুন।

—তো, ৮৭ গ্রাম চিঁড়ে-মুড়ি আর সাড়ে চোদ্দ গ্রাম ভেলিগুড় দিয়ে জলখাবার তো সাঙ্গ হল, এবার আসছে দুপুরের খাওয়া। দুপুরের খাওয়া বাবদ চালের বরাদ্দ মাথাপিছু ২৫০ গ্রাম, সঙ্গে ডাল ১৪৬ গ্রাম।

—কেন? চালের চেয়ে ডাল ১০৪ গ্রাম কম কেন?

—দূর মশাই, কথায় কথায় এত 'কেন-কেন' করলে আমি কিন্তু ফর্দটা শেষ করতে পারব না। যাগ্‌গে, দুপুরে তো ভাত। রাতে কিন্তু রুটি। তার জন্য আটার বরাদ্দ বন্দীপিছু দৈনিক ২৪৫ গ্রাম। এবার আসছি সবজিতে। চাল-ডাল-আটার সঙ্গে সবজির বরাদ্দ ২২০ গ্রাম। আর আলুর বরাদ্দ—।

—সবজির মধ্যে আলু নেই? আলু বুঝি সবজি-তালিকার বাইরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আলুর বরাদ্দ আলাদা। মাথাপিছু ৫৮ গ্রাম। দোহাই মশাই, আলুমশাই কেন যে তাঁর সবজি সমাজ থেকে নির্বাসিত, কেন যে তার বরাদ্দ ৫০ কিংবা ৬০ গ্রাম না হয়ে ৫৮ গ্রাম করা হল, এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসবেন না যেন। আর, এও জেনে রাখুন, আমাদের বড় কর্তারা পেঁয়াজকেও সবজির সগোত্র বলে ভাবেননি। এবং পেঁয়াজের

বরাদ্দ দৈনিক মাথাপিছু (অবাক হতে ভুলে যান) ৪.০৮ গ্রাম।

—বলেন কি? ৪.০৮ গ্রাম!

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, অবাক হওয়ার অনেক সময় পাবেন। এখন থেকে অবাক হতে শুরু করলে শেষ অবধি কূল পাবেন না। কারণ, এরপর আসছে আরও জটিল সব অঙ্ক। শুকনো লঙ্কা বন্দীপিছু দৈনিক ১.৮১ গ্রাম। আর, জিরে ও ধনে মিলিয়ে বরাদ্দ শুকনো লঙ্কার ৪৫% এবং হলুদের বরাদ্দ শুকনো লঙ্কার ৯০%। হুঁ-হুঁ, ১.৮১ গ্রামের ৪৫% এবং ৯০%। অঙ্ক কষে সঠিক পরিমাণটা কিন্তু আপনাকেই বুঝে নিতে হবে। আমি ওসব পারব না।

—না, না, ঠিক আছে। আমিই সময় মতো কষে নেব।

—মশলার বরাদ্দ-বলতে এই। এরপর আসছে সরষের তেল। সরষের তেল (রান্নার জন্য) বন্দীপিছু দৈনিক ১৮.১২৫ গ্রাম। এবং সরষের তেল (গায়ে মাখবার জন্য) বন্দীপিছু, অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত দৈনিক ৭.২৫ গ্রাম এবং এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দৈনিক ৩.৬৩ গ্রাম। মাছের বরাদ্দ নেই। তবে, পাঁঠার মাংসের বরাদ্দ প্রতি হপ্তায় বন্দীপিছু ৭২ গ্রাম। ব্যস, খাবারের বরাদ্দ বলতে এই।

—উহ্, বাঁচালেন! আচ্ছা, খাবার-দাবার ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না বন্দীদের?

—দেওয়া হয় বৈকি। বন্দীদের কাপড়চোপড় কাচার জন্য সোডারও বন্দোবস্ত রয়েছে। প্রতি রবিবার বন্দীপিছু সোডার বরাদ্দ (আবার হতবাক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন) আলুর ৫০%। আর, মাথার চুলে মাখাবার জন্য, (কেবল মহিলা বন্দীদের নারকেল তেল দেওয়া হয়)। মহিলা বন্দীপিছু নারকেল তেলের বরাদ্দ হপ্তায় ৮ গ্রাম। আর হ্যাঁ, আরও একটি লোভনীয় বস্তু জেলের কয়েদিদের দেওয়া হয়। সেটা হল তেঁতুল। বন্দীপিছু দৈনিক তেঁতুলের পরিমাণ ৮ গ্রাম।

চোখদুটি আকাশে তুলে বলি, এমন উদ্ভট ফর্দ কে বা কারা বানিয়েছে, মশাই?

—মোটামুটি বলতে পারেন, জেল-কোডেই রয়েছে এসব। আর জেল-কোড তো ইংরেজদের বানানো। কেবল পরিমাণগুলি বোধ করি পরবর্তীকালে দশমিকের অঙ্কে বদলে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজ ছাড়া আর এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি কার হবে বলুন! বন্দীপিছু সোডার বরাদ্দ আলুর ৫০%! ভাবা যায়। কোথায় আলু, আর কোথায় সোডা!

—ইংরেজদের তৈরি এমন আজব জেল-কোডটা বদলে নেওয়া যায় না?

—দূর মশাই, দেশের গোটা সংবিধানটাই বিদেশেব থেকে টুকে মেরে দেওয়া। স্বাধীনতার হাফ-সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছে কবে, কিন্তু বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে এখনও অবধি ব্রিটিশ-প্রণীত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫ বহাল রয়েছে, জানেন তো?

রোগ (Rogue) ও চি-কেচ্ছা

রোগ শব্দটি বাংলা, নাকি ইংরেজি, নাকি আরবি, ফার্সি, বাস্তবিক শব্দটি যে কোন দেশীয়, সে ব্যাপারে অনেকেরই মনে ধন্ধ রয়েছে।

আমার এক সবজান্তা বন্ধু, চপলকুমার, খুব নিশ্চিত গলায় বললো, শব্দটা ইংরেজি। চেয়ার, টেবিলের মতো বাংলায় ঢুকে পড়েছে। আসল ইংরেজি শব্দটি হল, rogue, অর্থাৎ কিনা পাজি।

শুনে আর এক প্রস্থ অবাক হতে হয়।

এটা ঠিক যে, রোগের মতো পাজি জিনিস ভূ-ভারতে দু'টি নেই, তা হলেও শব্দটি কেন কেবল শরীরের বজ্জাতি বোঝাতে বাংলায় এল, বোঝা মুশকিল।



কিন্তু আমাকে আরও তাজ্জব করে দিয়ে এক সংস্কৃতবিদ বললেন, শব্দটি আকাট সংস্কৃত। রুজ্ শব্দের পরে অ-প্রত্যয়-যোগে এর জন্ম। তা সে ইংরেজিই হোক, কিংবা সংস্কৃত, শব্দটির অর্থ কিন্তু হরেদরে এক। রোগ হল বাস্তবিকই এক rogue-বিশেষ। বড়ই পাজি জিনিস।

মানুষের শরীরটা নাকি চৌষট্টি রোগের মন্দির। অর্থাৎ শরীর নামক মন্দিরে চৌষট্টিটি অপদেবতার বসবাস। তাঁদের আকার-প্রকার-বিকার নিয়ে নানা মুনির নানা মতো।

হোমিওপ্যাথি বলে, সোরা, সিফিলিস আর সাইকোসিস এই তিনটিই দুনিয়ার সব রোগের উৎপত্তির কারণ।

কবিরাজি বলে, বায়ু, কফ, পিত্ত। কুপিত হলে আর রক্ষে নেই। তার আবার খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। ওষুধের চেয়ে অনুপান আর পথ্যের বাছবিচার।

আকুপাংচার বলে, শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় পিন ফোটালে রোগ সেরে যাবে।

ন্যাচারোপ্যাথি বলে, মানুষ যতদিন প্রকৃতির নিয়মগুলি মেনেছে, ততদিন তার শরীরে রোগব্যাধি তেমন ছিল না। প্রকৃতির নিয়মগুলিকে অমান্য করতে গিয়েই তার শরীরে যত রোগব্যাধি বাসা বেঁধেছে। যেমন, মানুষ যেদিন থেকে মাছ-মাংস খেতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে নিজের কবরটি নিজে খুঁড়েছে। কারণ, মানুষের মাড়িতে মাংস খাওয়ার দাঁতটি লাগাননি স্রষ্টা। তার মানে, মাছ-মাংস মানুষের জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। মানুষ গা-জোয়ারি করে মাংস খেতে গিয়েই প্রথম বিপত্তিটা বাধিয়েছে। রান্না করা খাবার খাওয়াটা মানুষের দ্বিতীয় অধঃপতন। প্রকৃতির বুকে যখন মানুষ এল, সে তো সবকিছু কাঁচাই খেতো। আচমকা তার রান্না করা খাবার খাওয়ার মতো দুর্মতি হল কেন? সুস্থ থাকতে হলে মানুষকে সবকিছুই কাঁচা খেতে হবে।

শুনে আমার অকালপক্ক বন্ধু চপলকুমার আশঙ্কিত, যদি দিনের পর দিন বানরদের মতো কাঁচা ফলমূল খেতে খেতে আমাদের পিছনের খসে পড়া লেজটা আবা গজাতে শুরু করে!

ন্যাচারোপ্যাথির মতে, মানুষের তৃতীয় ভীমরতি হল নাকি দুধ খাওয়া। কারণ, মানুষ ছাড়া আর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীই যে-যার মায়ের দুধ পান করে। তাও আবার মায়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে একেবারে এয়ার-টাইট অবস্থায় খায়। মানুষই একমাত্র অন্য প্রাণীর দুধ দুয়ে, ফুটিয়ে, ছানা কাটিয়ে, দই পেতে খায়। দুধ নাকি বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র এমনই এক জাতের ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দেয়, যেগুলি নাকি এক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেও মরে না। কাজেই, অন্য পশুর দুধ খাওয়া আর বিষ খাওয়া, মানুষের পক্ষে নাকি দুটোই সমান। মানুষ যেদিন প্রকৃতির নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে, সেদিনই নাকি তার শরীরে আর রোগব্যাধির লেশমাত্র থাকবে না।

এছাড়া, জল-চিকিৎসা, কাদা-চিকিৎসা, যোগ, আসন, ধ্যান-প্রাণায়াম, কত জাতের যে চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে মানুষ বেচারার ওপর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে চলেছেন, দুনিয়ার হরেক কিসিমের চিকিৎসকের দল! আর, যতই চিকিৎসা-পদ্ধতি বাড়ছে, মানুষ বেচারা ততই রোগে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে পড়ছে।

আমার ওই ফাজিল বন্ধু চপলকুমার হোমিওপ্যাথিকে নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা করে। বলে, হোমিওপ্যাথিতে নাকি সব রোগই সারে, তবে তার জন্য আগে এক কোর্স অ্যালোপ্যাথিক

ওষুধ খেয়ে নিতে হয়।

শুনে আমার আর এক হোমিওপ্যাথি-প্রেমিক বন্ধু বিপদভঞ্জন তো রেগে কাঁই। বলে, আসলে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে কোনো রোগই সারে না। হোমিওপ্যাথিটা হল পুরোপুরি একটা বিশ্বাসের ব্যাপার।

শুনে চপলকুমার খুব নিরীহ মুখে মন্তব্য করে, ঠিকই তো। হ্যানিম্যানের পুরো নামটাই তো ছিল হ্যানিম্যান বিশ্বাস।

চপলকুমারের চপলতা থাক, এলিভার ওয়েন্ডেল হোমসও তো বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, মেটিরিয়া মেডিকাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে মানুষ জাতটার ভারি উপকার হবে, যদিও মাছেদের পক্ষে সেটা হবে বেজায় ক্ষতিকর।"

এযুগে চিকিৎসার সবচেয়ে চালু পদ্ধতি হল অ্যালোপ্যাথি। গত এক শতকে তার বাড়বাড়ন্ত খুবই। ইদানীং অ্যালোপ্যাথি তো আবার মানুষের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের আলাদা-আলাদা চিকিৎসা করে। প্রত্যঙ্গভেদে এখন আলাদা-আলাদা চিকিৎসক। চোখের ডাক্তার, নাক-কান-গলার ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, হার্টের ডাক্তার, কিডনির ডাক্তার, সব আলাদা-আলাদা। যতই দিন যাচ্ছে, স্পেশালাইজেশন আরও বাড়ছে। শুনতে পাই নাকি আরও বাড়বে। তখন নাকি উপরের পাটি আর নিচের পাটির দাঁতের জন্য, ডান চোখ ও বাঁ চোখের জন্য আলাদা-আলাদা ডাক্তার হবে।

একটা চুটকি : দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে ডান প'টি ভেঙেছে, এমন এক রোগী অনেক মেহনত করে একজন সার্জেনের কাছে গিয়ে জানতে পারল যে, ডাক্তারবাবুটি সার্জেন বটে, তবে হাড়ের সার্জেন নন। কাজেই, ভাঙা হাড় জোড়া লাগানোর জন্য অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে যেতে হবে। রোগীটি বহু কষ্টে একজন অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে গিয়ে জানতে পারল, তিনি কেবল শরীরের বাঁ দিকের হাড়ের চিকিৎসা করেন। ডানদিকের চিকিৎসা করেন এমন একজন অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে যেতেই তিনি জানিয়ে দিলেন, আমি চারতলা এবং তার চেয়ে উঁচু থেকে পড়লে কেবল তাদেরই চিকিৎসা করি। আপনাকে এমন অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে যেতে হবে, যিনি তিনতলা অ্যান্ড বিলো থেকে পড়লে তার চিকিৎসা করেন।

এ-তো তবু একরকম, আমার এক ভাইপো সম্প্রতি এমবিবিএস পাস করেছে। ছাত্রাবস্থায় তার নিরন্তর কথাবার্তা মন্তব্যাদিতে বুঝেছি, সাড়ে চার বছরের এই কোর্সটিতে প্রফেসররা অনেক বিষয়ই পড়ানোর সময় পান না। সোজা কথায়, সিলেবাস শেষই হয় না। অথচ, পাস করে বেরোনোর পর ডাক্তারবাবুটির কাছে অপঠিত রোগে ভুগতে থাকা রোগী কি আসবে না? কীভাবে সেই রোগীর চিকিৎসা করবেন ডাক্তারবাবুটি?

শুনেই আপনি ভয়ে-তরাসে কাহিল হলেন নাকি? তাহলে একটা চালু চুটকি শুনে বুকের জমাট ভাবটা কিঞ্চিৎ হালকা করে নিন।

একজন সদ্য পাস করা ডাক্তারের কাছে একজন রোগী এসেছেন। তাঁর প্রচণ্ড সর্দি হয়েছে। অবিরাম নাক দিয়ে জল পড়ছে। তৎসহ মুহুর্মুহু হাঁচি এবং খকর-খকর কাশি। ডাক্তারবাবুর বেলায় সর্দি-কাশির চ্যাপ্টারটা পড়ানো হয়নি। কিন্তু সেকথা তো আর রোগীকে বলা চলে না। ডাক্তারবাবু তাই প্রেসক্রিপসন করলেন, আপনি পনেরো মিনিট

হট-বাথ নিয়ে পনেরো মিনিট পাখার তলায় দাঁড়াবেন।

বিভ্রান্ত রোগী মিনমিনে গলায় শুধোল, এতে করে আমার অসুখটা সারবে?

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, সারবে কি না জানিনে, তবে এর ফলে আপনার নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে, আর ওই রোগের চিকিৎসা আমি জানি।

ডাক্তার মানে কি ডাক 'তাঁর'?

শরীর থাকলেই যে রোগ হবে সেটা বুঝি। যন্ত্র মানেই তার কলকব্জা মাঝে মাঝে বিগড়োবে। আর রোগ হলে যে চিকিৎসা করতে হয়, সেটা তো বাচ্চা ছেলেও বোঝে। চিকিৎসা করলে ডাক্তারবাবুদের বড়ই উপকার হয়, কিন্তু রোগীদের কতটা হিল্লে হয় তাই নিয়ে জনমানসে ধন্ধ বড় কম নয়। ডাক্তাররা কি বাস্তবিক কোনো রোগই সারাতে পারেন?

আমার বন্ধু চপলকুমারের মতে, পৃথিবীর কোনো ডাক্তারই নাকি রোগের এ-বি-সি-ডি-ই সারাতে পারেন না। 'এ'-তে অ্যামেবায়েসিস (আমাশা), 'বি'-তে ব্লাড-প্রেসার, 'সি'-তে ক্যানসার, 'ডি'-তে ডায়েবিটিস এবং 'ই'-তে একজিমা।

এটা সম্ভবত চপলকুমারের কাঁচা রসিকতা, কিন্তু দুনিয়ার মানী-জ্ঞানীদের অনেকেই তো অনুরূপ ধারণাই পোষণ করেন। ফ্রান্সিস বেকনের ভাষায়, 'The remedy is worse than the disease', অর্থাৎ রোগের চেয়ে তার চিকিৎসাই মারাত্মক। স্যার টমাস ব্রাউন বুঝি সেই কারণেই বলেছেন, 'death is the cure of all diseases', অর্থাৎ মৃত্যুতেই সব রোগের পাকাপাকি নিরাময়। ডাঃ স্যামুয়েল জনসনও একই কথা বলেছেন, 'শরীরে রোগের উৎপত্তি হলে মৃত্যুতেই তা শেষ হয়।' বাইবেলে বলেছে, 'ঈশ্বরের কাছে যেজন পাপ করেছে, তাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দাও।' আলেকজান্ডার নাকি মৃত্যুকালে হা-হুতাশ করেছিলেন, 'অত্যধিক ডাক্তারই আমার মৃত্যুর কারণ।' মোলেয়ারের মতে, প্রায় সব রোগীই ওষুধ খাওয়ার কারণেই মরে, রোগের কারণে নয়। বুঝুন ব্যাপারটা!

এ ব্যাপারে আমার নিজের লেখা একটা গল্প রয়েছে। একজন সামান্য অসুখের রোগী যত বড় ডাক্তারের কাছে যায় ততই তার রোগ বেড়ে যায়। শেষ অবধি, (সে দাবি করে), যখন সে মৃত্যুর দোর গোড়ায়, একজন দেশবরেণ্য ডাক্তারের কৃপায় সে বেঁচে ফিরতে পারল, কেন না, তাঁকে বারবার কল দিয়েও কিছুতেই পাওয়া গেল না।

এ ব্যাপারে কবিগুরুর ওই বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম গুটিকয় পংক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।

'বিনুর বয়স তেইশ যখন, রোগে ধরল তারে,
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়,
নানা মাপের জমলো শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো,
বছর দশেক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, হাওয়া বদল করো।'

অপরাধ করলে নাকি মানুষের মনে কখনও কখনও অনুতাপ হয়। তখন তারা আরও একজন বড় অপরাধীকে উদাহরণ স্বরূপ কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজেদের অপরাধের

মাত্রা কিছুটা কম ভেবে গ্লানিমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। হাজার হাজার মানুষকে পরপারে পাঠানোর কারণে পৃথিবীর তাবড় যুদ্ধবাজদের মধ্যে যখনই অনুতাপ হয়েছে, তখনই তাঁরা আরও বড় হন্তারক হিসাবে ডাক্তারদের কথা বলেছেন। যেমন, বিখ্যাত জেনারেল ভন লেবনিজ বলেছেন, 'একজন মিলিটারি জেনারেল শত্রুপক্ষের যত সৈন্য মারে, একজন নামকরা ডাক্তার জীবনে তার চেয়ে ঢের বেশি রোগী মারে।' খোদ নেপোলিয়নও একই মতো পোষণ করতেন। তাঁর মতে, ঢের বেশি মানুষ মারবার জন্য, ওপারে গিয়ে, মিলিটারি জেনারেলদের চেয়ে ডাক্তারদের ঢের বেশি কৈফিয়ত দিতে হবে।



হাজার রোগব্যাধিতে ভুগলেও নেহাৎ পাগল না হলে নাকি কেউ ডাক্তারের কাছে যায় না। সামুয়েল গডউইনও আজীবনকাল এমন বিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যায় তার মাথার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা উচিত। এহ বাহ্য। অ্যান্টন চেকভ এক জায়গায় বলেছেন, ডাক্তার এবং উকিলের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। দুজনেই এক জাতের ডাকাত। দুজনেই মক্কেলের যথাসর্বস্ব লুটে নেয়। কিন্তু উকিল তাকে প্রাণে মারে না। ডাক্তাররা লুটে নেওয়ার পর মক্কেলকে মেরে ফেলে।

ডাক্তারকে ডাকাতদের মাসতুতো ভাই বলাটা বোধ করি একটু নির্মমভাবে হক কথা বলা, কিন্তু এটা বোধ করি খুব একটা মিথ্যে নয় যে, ওষুধ খেয়ে সেরে ওঠার পর ডাক্তারের বিল পেয়ে হার্টফেল করে মরেছে, এমন রোগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। জে-সি-দ্য কস্তা বলেছেন, লম্বা bill (চঞ্চু) দেখে যেমন পেলিক্যান পাখি চেনা যায়, তেমনি লম্বা বিল (bill) দেখে কে কত বড় ডাক্তার সেটা বোঝা যায়।'

আর, ডাক্তার যদি কোনো রোগীর উত্তরাধিকারী হয়, তবে চিকিৎসার ফলে সেই রোগীর মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ, সে তো আর তখন কেবল বিল পেশ করেই থেমে থাকবে না। তার নজর তো রোগীর পুরো সম্পত্তিটার উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারের নামে উত্তরাধিকারপত্রে সই করা, যেকোনও রোগীর পক্ষে, তার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করবার সামিল। সেই কারণেই বোধ করি প্যুবিলিলিয়াস সাইরাস মন্তব্য করেছেন, 'যে রোগী ডাক্তারকে তার উত্তরাধিকারী করে যায়, তার মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই।'

অবশ্য রোগীর উত্তরাধিকারী হলে যে সবসময় তা ডাক্তারের পক্ষে ভাল হয় না, সে বিষয়েও ওই চালু গল্পটাকে স্মরণ করা যায়। একজন হার্টের রোগী লটারিতে এক কোটি টাকা প্রথম প্রাইজ পেয়েছে। কথাটা তাকে সইয়ে সইয়ে বলার দায়িত্ব বর্তাল তার পারিবারিক ডাক্তারের ওপর। তিনি সইয়ে সইয়ে বলতে বলতে একসময় কথাটা পাড়লেন। বললেন, আপনি যদি লটারিতে দশ হাজার টাকা পান তো কী করবেন? রোগী বলল, কী আর করব, দশহাজার টাকায় আর কীই বা হয় আজকাল?

—যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পান?

—তাহলে একটুখানি খেয়েদেয়ে, ফূর্তিফার্তা করে উড়িয়ে দেব।—

যদি একলাখ পান?

—তাহলে একটুখানি ঘুরে-টুরে বেড়াব।

—যদি দশলক্ষ টাকা পান?

—তাহলে একটা দামি গাড়ি কিনব।

—যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পান?

—তাহলে একটা জাহাজ কিনব।

—আর, যদি এক কোটি টাকা পান?

—এক কোটি! হা-হা-হা, তাহলে পুরো টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব।

—না, না, ঠাট্টা নয়, বলুন না, এক কোটি টাকা পেলে কী করবেন?

—সত্যি বলছি, পুরো টাকাটা আপনাকেই দিয়ে দেব।

যেই না বলা, অমনি ডাক্তারবাবু রোগীর সামনেই হার্টফেল করে মারা গেলেন।

কিন্তু এমন ঘটনা বোধ করি কদাচিৎ ঘটে। তবে, সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন ডাক্তারের অসুখ করে। *এ বিষয়ে লাখ টাকার এক কথা বলেছেন, জর্জ বার্নাড-শ।* বলেছেন, 'ডাক্তারের অসুখ হলে তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছুই নেই। কারণ, সে ভালভাবেই জানে কোন্ ওষুধে কতটুকু রোগ সারে।'

তাহলে কি এটাই সাব্যস্ত হল যে রোগ হলে ডাক্তারের কাছে কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়? না, মোটেই তা নয়। রোগ হলে অবশ্যই ডাক্তারদের কাছে যেতে হবে। রোগীর স্বার্থে না হলেও ডাক্তারের স্বার্থে তো বটেই। গরু না মরলে যেমন শকুনের বিপদ, মানুষ না মরলে যেমন মড়া বইবার খাটিয়ার দোকানগুলিতে মড়াকান্না পড়ে যায়, তেমনই, 'প্রিয়তম বন্ধুটিরও রোগ না হলে ডাক্তারদের মন খারাপ হবেই।' এ আমার কথা নয়, কথাটি বলেছেন এম-ই দ্য মন্তাই।

তবুও বলি, রোগব্যাধি হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত বিধান রায়ের নামে একটা চালু চুটকি রয়েছে বাজারে। বিধান রায় নাকি একবার তাঁর এক স্নেহভাজনকে বলেছিলেন, বাপু হে, রোগ হলেই ডাক্তারের কাছে যেও, কারণ তাদেরও তো বাঁচতে হবে। আর, ডাক্তার কোনো ওষুধ লিখে দিলে তা অবশ্যই কিনবে, কেন কি, ওষুধের দোকানিদেরও তো বাঁচতে হবে। কিন্তু ওই ওষুধগুলি যেন ভুলেও খেও না, ফেলে দিও, কারণ, তোমাকেও তো বাঁচতে হবে।

শব্দব্রহ্ম

এই রচনায় একটুখানি ভাষা নিয়ে ভাসতে চাই।

প্রথমেই অকপটে নিবেদন করি, এককালে ভাষা নিয়ে আমার জ্ঞানটা নিতান্তই ভাসাভাসা ছিল। ওই জ্ঞান নিয়ে ভাসতে চাইলে শেষ অবধি হাঁটুজলে ডুবতে হ্ত আমায়। তারপর, প্রায় দু'দশকের অক্লান্ত গবেষণার পর, এখন আমি ভাষা নিয়ে ভাষণ এবং প্রয়োজনে ভাষ্য দেওয়ার মতো এলেম অর্জন করেছি। আমার ওই গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকেই কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে চাই।

এটা তো মানবেন যে ভাষার র-মেটেরিয়াল হল শব্দ। শব্দের ফুল দিয়েই ভাষার মালাটি গাঁথা হয়। কাজেই প্রথমে শব্দ দিয়েই শুরু করা যাক। কথায় বলে, শব্দব্রহ্ম। অর্থাৎ শব্দ নাকি ব্রহ্মের তুল্য। ব্রহ্ম নাকি ওমনিপোটেন্ট, ওমনিপ্রেজেন্ট। তিনি নাকি সবখানে, সবকিছুতেই অমনি-অমনি থাকেন। অনায়াসে। অবলীলায়। এমনই অপার লীলা তাঁর।



বাস্তবিক, তাঁর ভাবগতিক, গতিবিধি, বিধিনিয়ম বড়ই, বড়ই রহস্যময়। ঠিক তেমনি, শব্দ নামক ব্রহ্মেরও রহস্য অতুল। তারাও ব্রহ্মের মতোই রহস্যময়। কিংবা বলা যায়, র-হাস্যময়। শুনলে পয়লা চটকায় আপনার হাসি পেতে পারে হয়তো-বা, কিন্তু তাদের অতুল রহস্যের আদি-অন্ত বোঝার পর আর আমার কোনো গবেষণালব্ধ তথ্যকেই বোঝা বলে মনে হবে না।

প্রথমত বলি, শব্দ হল এক-একটি বহুরূপী। তার একই অঙ্গে কত রূপ! 'হার' নামক শব্দব্রহ্মটির কথাই ধরা যাক। রমণীর গলায় কত ছাঁদেই না দোলেন, কিন্তু যুদ্ধ করে পেলে কেউই ওটা গলায় পরতে চায় না। 'উপ' যোগে তিনি সব মানুষের কাছে কতই না কাঙ্খিত! আবার কোনো অভাগার পিঠের উপর তিনি যদি প্র-কাণ্ড হয়ে আছড়ে পড়েন (প্রহার) তো বেচারা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে। তিনি 'আহার' কিংবা 'বিহার' এর বেলায় বড়ই আনন্দময়ী, কিন্তু যখন 'সংহার' মূর্তি ধরেন, তখন তাঁকে সবাই 'পরিহার' করে চলেন। 'রণ' শব্দটা বড়ই খারাপ। তার অর্থ হল, যুদ্ধ। যুদ্ধ কি ভাল জিনিস? আজকের দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মানুষই 'রণ' চায় না। 'রণ' মানেই বহু নিরীহ মানুষের অকারণে 'মরণ'। কিন্তু রণের সঙ্গে একটা মাত্র 'চ' জুড়ে দিলে যে শব্দটি তৈরি হয়, সেটা না হলে কারোরই চলে না। আর, আগে একটা 'আভ' যোগ করে দেখুন, একদিকে আপনার গৃহিনী ওটা পাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বেন, অন্যদিকে চোর চূড়ামণির দল ওটা 'হরণ' করবার জন্য তলে তলে সিঁদ কাটবে।

একজাতের শব্দব্রহ্ম আছে, যার দুটো অংশের অর্থ হুবহু এক। কিন্তু দুটি শব্দের মিলনে অর্থটা পুরোপুরি বদলে যায়। ধরুন কম এবং less দুটোর অর্থ একই, কিন্তু জোড়া লাগলেই কমলেশ। তেমনি, অলক ও কেশ, দুইয়ের মিলনে অলকেশ। No ও না, দুইয়ের মিলনে নোনা। আবার এক জাতের শব্দব্রহ্ম রয়েছে, যার প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের একই অর্থ, দুটি অংশ মিলেমিশেও সেই একই অর্থ। যেমন, song ও গীত, মিলেমিশে সঙ্গীত। দুটি বাংলা শব্দ মিলে একটি ইংরেজি শব্দের জন্ম দিল, এমন উদাহরণ চাইলে হাতের কাছেই রয়েছে 'পাপেট' শব্দটি। বাংলা পা ও পেট মিলে শব্দটি তৈরি। রূপসী শব্দটি যে কেমন করে তৈরি হল, তা নিয়ে অনেকদিন ভেবেছি। রূপ শব্দটির মানে বুঝি। কিন্তু রূপের অধিকারিণী রমণীকে কেন রূপসী বলা হয়, অনেকদিন তার রহস্য ভেদ করতে পারিনি। সম্প্রতি সেই রহস্য ভেদ হয়েছে। আসলে, রূপ শব্দের সঙ্গে ইংরেজি she শব্দ যোগ করে রূপসী শব্দটা বানানো হয়েছে। অর্থাৎ রূপবতী রমণীই হল she; আর, রূপবান বলতে এমন পুরুষকেই বোঝানো হয়, যার শরীরে রূপের বান ডেকেছে।

দুটো-তিনটে শব্দকে জোড়া লাগিয়ে একটি নতুন শব্দ বানানোর কৌশল তো আমরা স্কুলে পড়াকালীন সন্ধি-সমাস পড়তে পড়তেই জেনে গিয়েছি। কচু, আলু, এবং আদা, সন্ধির নিয়মে জুড়ে দিলে যে কচ্চাম্বাদা হয়, এটা যখন বুঝতে পারলুম, তখনই মনে কৌতূহল জেগেছিল, তিনটি কন্দজ বস্তুর সমন্বয়ে যে খাদ্যটি দাঁড়াল, তার স্বাদটি কেমন হতে পারে? সমাস পড়তে গিয়ে যেদিন শিখলুম, 'বীণাপাণি' শব্দটি না বীণা, না পাণি (হাত), শব্দটির আসল অর্থ দেবী সরস্বতী, সেদিন মা-সরস্বতীর ক্ষুরে শত-সহস্র দণ্ডবৎ জানিয়েছিলুম। জল ও যা, পানিও তা, কিন্তু দুটো মিলে যখন 'জলপানি' হল, তার মানেটাই

গেল বদলে, অর্থাৎ কিনা মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ মাসোহারা বৃত্তি। ইংরেজিতে যাকে বলে, স্কলারসিপ। আর এই 'পাণি' শব্দটার মধ্যে কী মজা দেখুন, 'বীণা' তে জুড়লে এক অর্থ, জলে ডোবালে (জলপানি) অন্য। সত্যি কথা বলতে কি, যেদিন জানলুম, করমর্দন মানে হ্যান্ডশেক, আর পাণিপীড়ন মানে বিবাহ করা, সেদিন আমার পাণি (হাত) ও যে পীড়ন করবার জন্য নিশপিশ করছিল, এটা অস্বীকার করলে নিতান্তই ভ্রষ্টাচার করা হবে।

এই দুনিয়ায় কত শব্দ যে এল, গেল! তাদের উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে আমার দীর্ঘকালের গবেষণা। তারই গুটিকয় নমুনা সমঝদার মহলে পেশ করতে চাই।

'আড্ডা' শব্দটার কথাই ধরুন। আমার মতে, ওটা ইংরেজি 'আইডিয়া' শব্দ থেকে এসেছে। আইডিয়া...আইড্যা...আড্ডা। এটা তো মানেন যে, নির্ভেজাল আড্ডা থেকেই দুনিয়ার তাবৎ মহৎ আইডিয়াগুলির সৃষ্টি। 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি আসলে ইংরেজি আর বাংলার মিশেলে গড়ে ওঠা একটি শব্দ। অর্থাৎ big+জ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন তো আসলে big জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থাৎ যা বড় করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। বিজ্ঞান শব্দটাও এমনই এক দোঁআশলা শব্দ। big+জ্ঞান, অর্থাৎ কিনা বড়সড় জ্ঞান। আমার তো মনে হয়, স্ত্রী এবং ইস্ত্রী কথা দুটো একই শব্দজাত। দুটোই গরম থাকে এবং চাপ তৈরিতে দক্ষ। অবশ্য ইস্ত্রী থেকে স্ত্রীর জন্ম, নাকি স্ত্রীর থেকে ইস্ত্রী, এ বিষয়ে আমি এখনও অবধি যোলআনা নিশ্চিত নই। স্বামী ও আসামি শব্দ দুটোও একই শব্দজাত। এক্ষেত্রেও কার থেকে কে জন্ম নিয়েছে, বলা মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে 'সংসার' শব্দটির কথা। সেখানে একজন (পড়ুন স্বামী) হল সং, আর অন্যজন (পড়ুন স্ত্রী) হলেন স্যার। কিংবা ধরুন, আপস ও পাপোশ শব্দ দুটো। দুটি শব্দের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কি মনে হয় না যে একই উৎস থেকে ওদের জন্ম? আপস করতে করতে একেবারে পাপোশের মতো পদপ্রান্তে পড়ে থাকতে দেখেননি কি কাউকে? চরিত্রের দিক থেকে ইংরেজি 'হামবাগ' শব্দটি যে সরাসরি হিন্দি থেকে গিয়েছে, এ ব্যাপারে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যে সর্বদাই ভাবে, 'হাম বাঘ হ্যায়, অন্যরা সব চুহা হ্যায়,' তাকেই তো ইংরেজিতে হামবাগ বলা হয়। মাংকি (বানর) শব্দটি আসলে ম্যান ও কি (key) এই দুটি শব্দের যোগফল। আসলে, শব্দটির মধ্যে মানুষের বিবর্তন তত্ত্বটিই ভরে দেওয়া হয়েছে। বানরই যে মানুষ সৃষ্টির চাবিকাঠি, এটা তো আর মিথ্যে নয়। আচ্ছা, 'পরিণয়' শব্দের অর্থ কোন হিসাবে 'বিয়ে' হয় বলুন তো? আমারও প্রথম প্রথম খুবই অবাক লাগত। কিন্তু অনেক গবেষণা করে অবশেষে শব্দটার মধ্যে এক গভীর ব্যঞ্জনা খুঁজে পেলাম। তাতেই ভেদ হল শব্দটার অন্তর্গত রহস্য। আসলে, বিয়ের আগে তো সব মেয়েকেই পরীর মতো লাগে। বিয়ের পরই পুরুষের সেই মায়াভুল দু'দিনেই ভেঙে যায়। তখন স্বামীর চোখে মেয়েটিকে একেবারে মামুলি, আটপৌরে লাগে। তো, যে অনুষ্ঠানের পরই স্ত্রীকে 'পরী নয়' বলে মনে হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বিয়ে বা পরিণয় বলা হয়। কামান শব্দটি যদি পুংলিঙ্গ হয়, তবে তা স্ত্রীলিঙ্গে কী হবে, ভেবেছেন কখনও? আমি ভেবেছি। এবং ভেবে ভেবে এমনই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কামানের স্ত্রীলিঙ্গ কামিনী না হয়ে যায় না।

শব্দব্রহ্ম নিয়ে এরকম অনেকানেক গবেষণা-কর্ম রয়েছে আমার। পরে কখনো তা নিবেদন করবার ইচ্ছে রইল।

শব্দের ঘণ্ট

সত্যি, কী অভিনব রসায়নে যে দুনিয়ার হরেক ভাষার শব্দভাণ্ডার তিলতিল করে গড়ে উঠেছে! শব্দ নিয়ে এমন নিশ্ছিদ্র গবেষণা না করলে তা বোধ করি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারতুম না।

এই 'গবেষণা' শব্দটিকেই ধরুন না। গো + এষণা = গবেষণা। এষণ মানে অনুসন্ধান। আর, গো শব্দের কত অর্থ জানেন? গো মানে গরু, পৃথিবী, মাতা, বাণী, স্বর্গ, চক্ষু, ইন্দ্রিয়,



দৃষ্টি, দিক, কেশ, কিরণ, জল, বাণ, সূর্য, চন্দ্র, ঋষি—অ্যান্ড হোয়াট নট! অর্থাৎ আপনি যদি বলেন, 'আমি গবেষণা করছি', তার মানে হতে পারে, আপনি গরু খুঁজতে বেরিয়েছেন, কিংবা আপনি আপনার মা-কে খুঁজছেন, অথবা আপনি দুনিয়া টুঁড়ে বেড়াচ্ছেন, কিংবা একটুখানি জল খেতে চাইছেন। বুঝুন ব্যাপারখানা।

কিন্তু এই কিস্তিতে আমি বলতে চাইছি নতুন নতুন শব্দ গড়ে ওঠার ইতিহাস।

যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনে কত চলতি শব্দ যে নতুন নতুন অর্থ পেয়েছে! 'ঘেরা' শব্দটি তো আমরা বহুদিন ধরে জানতুম। কিন্তু তার সঙ্গে একটি 'ও' যোগ করে একটা নতুন শব্দ তৈরি করে ফেললুম। তিন-অক্ষরের এই শব্দটির মানেটাই বেমালুম বদলে গেল। এখন এটি আর স্রেফ একটা জায়গাকে ঘিরে ফেলা নয়। এটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্যোতক, কিনা দাবিদাওয়া পূরণ করার দাবিতে মালিকপক্ষকে সমবেতভাবে অবরোধ করা। তার ছোটবাইরে অবধি বন্ধ করে দেওয়া। এখন তো শব্দটি কেবল স্বদেশের মাটিতেই আবদ্ধ নেই। শব্দটি ইংরেজি অভিধানেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। একে আবার ক্রিয়াপদেও ব্যবহার করা হয় ইংরেজিতে। পাস্ট টেন্সে হয়, 'ঘেরাওড'। এমনই আর একটি রাজনৈতিক শব্দ হল 'ধর্মঘট'। সাবেক আভিধানিক অর্থ হল, ধর্ম রক্ষার্থে ঘট বা কলসদান ব্রত। কিন্তু শব্দটি এখন পুরোপুরি বদলে ফেলেছে তার যাবতীয় অর্থ। এখন তো সব্বাই জানে, ধর্মঘট মানে হল কোনো রাজনৈতিক দাবিতে সমস্ত ধরনের কাজকর্ম এক্কেবারে বন্ধ করে দেওয়া। এরই এক বর্ধিত রূপ হল 'বন্‌ধ'।

আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণার দ্বারা এমন কিছু শব্দ তৈরি করেছি, যাতে বাংলা অভিধান যথেষ্টই সমৃদ্ধ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষার শিথিলতা ও পল্লবগ্রাহিতা কতখানি কমিয়ে ফেলা সম্ভব, দু'চারটি উদাহরণ পেশ করলেই বুঝতে পারবেন তা। ধরুন, আমি বললাম, 'তিনি বাতের ব্যথায় কাতরাচ্ছেন'। তার বদলে আমি বলতে পারি, 'তিনি বাতরাচ্ছেন'। কিংবা, 'তিনি কাতর আর্তনাদ করছেন' না বলে আমি সচ্ছন্দে বলতে পারি, 'তিনি কার্তনাদ করছেন।' কিংবা ধরুন, আমি বললুম, 'দুষ্ট ছেলেটি গাছ থেকে আছাড় খেয়ে হাত-পা ভেঙেছে।' তার বদলে বলতে পারি, 'দুষ্টু ছেলেটি গাছাড় খেয়েছে।' ঠিক এইভাবে, দশরথের চারটি ছেলের জায়গায় আমরা সচ্ছন্দে 'দশরথের চৌবাচ্চা' বলতে পারি। কোনো আঁতেল আকণ্ঠ মদ খেয়ে খুব লম্বা-চওড়া বক্তিমে করছে, আমরা বলি, 'আঁতেল লোকটা মাল খেয়ে খুব আঁতলামো করছে।' এই কথাটাকেই আমরা ছোট করে নিয়ে বলতে পারি, 'লোকটা মাঁতলামো করছে', অর্থাৎ কিনা ম-কারযুক্ত আঁতলামো করছে। মানুষটি যে আঁতেল এবং সে যে আকণ্ঠ মদ খেয়ে আঁতলামো করছে, কেবল 'মাঁতলামো' শব্দটি দিয়ে কেমন অ্যাতোগুলি কথা বুঝিয়ে দেওয়া গেল। মাত্র একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ করতেই 'মাতলামো' শব্দটার অর্থ, ব্যঞ্জনা, সবকিছু কেমন শতগুণ বেড়ে গেল! আরও আছে। ধরুন, আপনি শুধোলেন, 'কোথায় চললেন?' তার জবাবে আমি বললুম, আড্ডায়। আপনি বুঝলেন, আমি আড্ডা মারতে যাচ্ছি। আপনি শুধোলেন, 'শুধুই আড্ডা, নাকি খানাপিনারও বন্দোবস্ত রয়েছে?' তার জবাবে আমাকে সাতকাহন করে বলতে হল যে, আড্ডার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আড্ডায় অনেক সুন্দরী মহিলা আসবেন, তাদের সঙ্গে একটুখানি নাচা-গানা-ফূর্তিফার্তাও

হবে। কিন্তু ধরুন, অ্যাতো কথা না বলে আমি যদি প্রথমেই বলে দিতুম যে, আমি 'মাড্ডায়' চলেছি, এবং আপনার যদি মৎপ্রণীত নব শব্দকোষখানা পড়া থাকত, তাহলে আপনি নির্ঘাৎ এক লহমায় বুঝে ফেলতেন যে, আমি একটি ম-কারযুক্ত আড্ডায় চলেছি, যেখানে মদ, মাংস ও মেয়েছেলেসহ পঞ্চ ম-কারের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। ভেবে দেখুন, আড্ডার বদলে 'মাড্ডা' শব্দটি ব্যবহার করে আমরা কত বাড়তি বকবকানির হাত থেকে রেহাই পেলুম। আর একটা কথা, একটা শব্দ কি কেবলমাত্র একটি অর্থই বহন করবে? সে-তো শব্দের দুর্বলতা। এ বিষয়েও আমার প্রচুর গবেষণা রয়েছে। চলতি শব্দগুলিকে ঠিকঠাক ঘসেমেজে নিতে পারলে, তা থেকে হরেক কিসিমের অর্থ বিচ্ছুরিত হবে। তবে তার আগে আমার নব শব্দকোষটিকে হাতের কাছে রাখতে হবে। বাস্তবিক, একটা শব্দকে কত অর্থেই না ব্যবহার করা যায়! ধরা যাক 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটি। আপনার মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান দিতে গিয়ে আমি যদি বলি, 'ছেলেটা ভালই, তবে বেজায় সংক্ষিপ্ত।' আপনি ভাববেন বুঝি ছেলেটা সবদিক থেকেই ভাল, তবে খুবই বেঁটেখাটো, প্রায় বামনতুল্য। কিন্তু আমি তা বলতে চাইনি। এখানে 'সংক্ষিপ্ত' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, song-ক্ষিপ্ত, অর্থাৎ কিনা, গান শুনলে বেজায় ক্ষেপে ওঠে। আচ্ছা বলুন তো, 'নগরীটি স্তম্ভিত, প্রতারিত ও উদ্ভাসিত হইল'—কথাটার মানে কী? পুরো বাক্যটিকে অর্থহীন বোগাস মনে হচ্ছে তো? কিন্তু আমার নব শব্দকোষটি পড়ুন, দেখবেন, এই একটি ছোট্ট বাক্য দিয়ে একটি নগরীর বিদ্যুতায়নের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, নগরীটিতে প্রথমে স্তম্ভ অর্থাৎ পোল পোঁতা হল, তখন সে স্তম্ভিত হল। তারপর ওই পোলে প্রকৃষ্ট রূপে তার ঝোলানো হল। তাতে করে প্রতারিত হল। সবশেষে আলো জ্বলল, তখন সে উদ্ভাসিত হল।

এই যাহ্। এখনও অবধি পি-এইচ-ডি'ই পেলুম না, এরই মধ্যেই সবকিছু ফাঁস করে দিচ্ছি যে। কেউ যদি টুকে-ফুকে নিয়ে একটা পেপার বানিয়ে আগাম জমা দিয়ে দেয়! এ ব্যাপারে তো আমরা বাঙালিরা এক নম্বরের টুক্‌লিখোর। কী বললেন? টুকলিখোর শব্দটা কোনো অভিধানেই নেই? বা-রে, যে একের কথা অন্যের কানে তুলে ফায়দা তোলে, তাকে যদি হিন্দিতে চুকলিখোর বলতে পারি, তবে যারা একের বই বা খাতা থেকে মাল নিজের খাতায় টুকে নিয়ে ফায়দা তোলে, তাকে টুকলিখোর বলতে পারব না কেন? এই দেখুন, এইমাত্র একটু নতুন শব্দ গবেষণা করে বের করলুম। বাংলা শব্দভাণ্ডারে একটি নতুন শব্দ যুক্ত হল। টুকলিখোর।

সাহেবরাও চুরি করে

চিরটাকালই তো শুনে আসছি, বাংলা শব্দভাণ্ডারে অজস্র বিদেশি শব্দ ঢুকেছে। আমরা নাকি স্রেফ চুরির মাল দিয়ে গড়েছি আমাদের অভিধানের শরীর। সংস্কৃতকে যদি আর্যদের ভাষা বলে স্বীকার করি, আর আর্যদের যদি বিদেশি বলে মেনে নিই, তবে তো বাংলা অভিধানের শরীরটি চোদ্দআনাই বিদেশি র-মেটেরিয়েল দিয়ে তৈরি। আর, সংস্কৃতকে যদি দেশীয় ভাষা বলে মেনে নিই, তা হলেও নাকি রাশি রাশি বিদেশি শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকেছে। এ ব্যাপারে নাকি বিদেশি শব্দভাণ্ডারের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই।

সকালে যে 'চা-বিস্কুট' খাই, দুটোই বিদেশি। 'অফিসে' যে 'চাকরি' করি, সেই অফিসটাও বিদেশি, চাকরিটাও। এ ছাড়া, অফিসের যত 'কেরানি, আসবাব, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাতা, কাগজ, কলম, দোয়াত, পেন, আলপিন' এবং সর্বোপরি 'মাইনে', সবই বিদেশি। যে 'হাওয়া-বাতাসে' নিঃশ্বাস নিই, তাও বিদেশি। এদেশের যত 'আদালত, আইন-কানুন, উকিল, মোক্তার, দলিল, দস্তাবেজ', সবই বিদেশি। সন্ধে হলে যে 'লণ্ঠন'টি জ্বালাই, রাতে ঘুমোবার জন্য 'লেপ, তোশক, গদি, বালিশ' সহকারে যে একটি 'নরম বিছানায় আরাম' করি, এসবই কিন্তু বিদেশি। মা-দুর্গা এদেশি, কিন্তু তাঁর পুজো উপলক্ষ্যে আদায় করা 'চাঁদা', মা-কে ভোগ হিসেবে প্রদত্ত 'চিনি, বাতাসা, পেয়ারা, বাতাবি, আঙুর, নাশপাতি, আনারস, পেঁপে, আতা', সবই কিন্তু বিদেশি। 'ময়দা' বিদেশি, কিন্তু তা দিয়ে তৈরি লুচি কিন্তু এদেশি। গামছা দেশি, কিন্তু তোয়ালে বিদেশি। আমরা নাকি বিদেশি 'চাবি' দিয়ে



দেশীয় 'তালা' খুলি। এ ছাড়া, 'দোকান, বাজার, আমদানি, রফতানি, মসলা, মিছরি, মনিব, চাকর, জমি, ফসল, বাদাম, আলু, পেঁয়াজ, কপি, আসল, নকল, খবর, কম, পছন্দ, জামা, গরিব, শলা, সাদা, আয়না, শিশি', মায় বুড়োদের 'হুঁকো, তামাক' অবধি সবই বিদেশি। বাবাকে আধুনিক ছেলেমেয়েরা ড্যাডি বা ড্যাড বলে ডাকলে আমরা নাক সিঁটকোই, কিনা, নিজের বাবাকে অবধি বিদেশি ভাষায় ডাকে! মাতৃভাষায় ডাকতে পারে না? শুনলে তাজ্জব হবেন, 'বাবা, কাকা', এ সবই বিদেশি। নিজের বাবাও বিদেশি! ভাবতে কেমন লাগে না?

শব্দের ব্যাপারে বিদেশের কাছে আমাদের নাকি ঋণের অন্ত নেই। শুনতে শুনতে কান পচে গেল। কিন্তু বিদেশি শব্দভাণ্ডারে যে কত বাংলা শব্দ ঢুকে গিয়েছে, তার খোঁজ কে রাখে! ঠিক করলাম, মাতৃভাষার এই অপমান আর সইব না। এবার আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবই। তাই, বিগত দু'দশক যাবৎ নিরলস গবেষণা করে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করেছি, যা শুনলে নাকউঁচু সাহেবদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

কঠোর গবেষণা করে আমি এমন অসংখ্য ইংরেজি শব্দ খুঁজে পেয়েছি, যা-কিনা সরাসরি বাংলা ভাষা নিদেন কোনো ভারতীয় ভাষা থেকে স্রেফ ঝেড়ে দেওয়া। তারই গুটিকয় এবারের কিস্তিতে নিবেদন করতে চাই।

যেমন ধরুন, ইংরেজি 'এইট' শব্দটা যে বাংলা 'আট' শব্দেরই বিবর্তিত রূপ, এ বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। আট-আইট-এইট। বলতে পারেন, উল্টোটাও তো হতে পারে। ইংরেজি এইট থেকে আট। এইট—আইট—আট। তো বলি, না, হতে পারে না। কারণ, আটেরও যে চাবিকাঠিটি আমাদেরই হাতে। সংস্কৃত অষ্ট থেকেই তো আট। সংস্কৃত হল আমাদের বাপকেলে সম্পত্তি। সে সম্পত্তিতে হাত দিতে এলে ইংরেজদের খুপরি ফাটিয়ে দোব। যদিও সেই বাপকেলে সম্পত্তিটিকে আমরা কবেই মেরে ফেলেছি। ওটা এখন ডেড-ল্যাংগুয়েজ।

তেমনি, বাংলা (সংস্কৃতজ) 'ত্রি' শব্দ থেকেই তো ইংরেজি 'থ্রি' শব্দের জন্ম। ইংরেজি 'ব্যাড' শব্দটা যে বাংলা 'বদ' শব্দেরই তির্যক রূপ, কিংবা এদেশীয় 'শয়তান'-এর ঔরসেই যে ইংরেজি 'Satan'-এর জন্ম, এটা নিশ্চয়ই কাউকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না। তারপর গিয়ে ধরুন, ইংরেজি anger শব্দটি। ওটা আসলে বাংলা অঙ্গার শব্দ থেকেই বিদেশি শব্দকোষে পাচার হয়েছে। কিনা, রেগে আগুন অর্থাৎ একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার কিংবা অ্যাঙ্গার্। ধরুন, কনস্টেবল শব্দটি। ওটা তো আসলে আমাদের 'কনিষ্ঠ বল'-এরই ইংরেজি রূপ। পুলিশের মধ্যে কনস্টেবলরাই তো কনিষ্ঠ বল অর্থাৎ ক্ষমতার নিরিখে একেবারে কনিষ্ঠ। খুব গভীর সমুদ্র, তল মেলে না, আমরা কোনোকালে তার নাম দিয়েছিলাম, অতলান্তিক সমুদ্র। আর, ইংরেজরা কিনা, ওটাই চুরি করে সমুদ্রটার নাম রাখলো, আটলান্টিক! চোখের চামড়া থাকলে কেউ এমন নির্লজ্জ চুরি করে! বাংলা 'বর্ম' শব্দটা ইংরেজিতে 'আরমার' হল কেমন করে, শুনবেন? শব্দটার প্রাথমিক রূপ ছিল, 'আরো মার'। আসলে, এদেশে প্রথম বর্ম পরা শুরু করেন যেসব যোদ্ধা, তাদের বুকে প্রতিপক্ষ যখন আঘাত করত, তাঁরা 'আরো মার্, আরো মার্, যত খুশি মার্, কিছুই হবে না' বলে উল্লাস প্রকাশ করতেন। বিদেশিরা ওই 'আরো মার্' সহযোগে উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে বর্মটাকেই ভাবলেন, 'আরো মার্'। কালক্রমে তাদের জিহ্বায় তা হয়ে দাঁড়াল 'আরমার'।

'আর্মচেয়ার' শব্দটি কি আসলে 'আরাম-চেয়ার' নয়? বসে খুব আরাম হয় বলেই না চেয়ারটার এমনতরো নাম। আর, 'আরাম' শব্দটি তো পুরোপুরি এদেশি। যাঁরা আরাম বলতে আকণ্ঠ রাম ভাবেন, তাঁরা গোমুখ্যু। এমন কি, যাঁরা আরাম শব্দটাকে ফার্সি শব্দ বলে ভাবেন, তাঁদের সবিনয়ে জানাই যে, আরাম ফার্সি শব্দ হতে পারে, কিন্তু তা Far sea থেকে আসেনি। আরাম ষোলআনা দেশীয় শব্দ। সম্ভবত রাম শব্দটিরই বর্ধিত রূপ। আর, রাম তো ভারতবর্ষের আদি অকৃত্রিম তুরুপের তাসটি, কৈকেয়ী থেকে বিজেপি অবধি ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে।

এবার আসি ইংরেজি অ্যারেস্ট শব্দটাতে। 'অ্যারেস্ট' করা মানে যে আসামিকে বন্দী করে 'আড়ষ্ট' করে দেওয়া, এ ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় থাকবার কথা নয়। বাংলা 'আড়ষ্ট'ই সাহেবি জিহ্বায় গিয়ে 'অ্যারেস্ট' হয়েছে। ঠিক একইভাবে আমাদের 'ঝাঁপ' শব্দটি চুরি করে সাহেবরা ঢুকিয়ে নিয়েছে ওদের অভিধানে। কেবল, ওদের জিহ্বায় শব্দটা হয়েছে জাম্প (Jump)। ঝাঁপ—ঝাঁপ—জাম্প।

ইংরেজি আগস্ট মাস তো আসলে অগস্ত্য মাস। অগস্ত্য মুনি ১লা ভাদ্র তারিখে বিন্ধ্য পর্বত টপকে দাক্ষিণাত্যের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। তাই, বাঙালির কাছে ভাদ্র মাসই অগস্ত্য মাস। আর, ওরা কিনা স্রেফ ডাকাতি করে মাসটার নাম রাখল আগস্ট মাস!

আমার মতে, ইংরেজি horrible শব্দটির বয়েস দু'-আড়াইশো বছরের বেশি নয়। ইংরেজরা তখন বাংলাদেশে এসে সবে বসবাস শুরু করেছে। তখন তারা গভীর রাতে শুনতে পেতো, সামনের রাস্তা দিয়ে একদঙ্গল লোক একটা মড়ার খাটিয়া কাঁধে নিয়ে 'বলহরি হরিবো-ল' বলে চেল্লাতে চেল্লাতে চলেছে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মেই মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার বেলায় অত বিকট হল্লা তোলার নজির নেই। তো, গভীর রাতে অমন হাড় হিম করা 'হরিবোল' ধ্বনি শুনতে শুনতে আতঙ্কিত ইংরেজরা অজান্তেই নিজেদের শব্দভাণ্ডারে একটি শব্দ জুটিয়ে নিল, কিনা, horrible.

ডাইনোসর নামে যে বিশালকায় জন্তুটির নাম ইংরেজি অভিধানে রয়েছে, তা তো এদেশের 'ডাইনেশ্বরে'রই বিকৃত রূপ। ডাইনি প্রথা এদেশের অতি প্রাচীন প্রথা। তখন হয়ত বা ওই বিশালকায় জন্তুটি আমাদের দেশে পালে পালে ঘুরে বেড়াতো। ডাইনি প্রথার সাধক-সাধিকারা ওই জন্তুগুলোকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। ডাইনোসোর আসলে ডাইনেশ্বর অর্থাৎ ডাইনিদের দেবতা। ওটাই সাহেবদের মুখে পড়ে হলো, ডাইনোসোর।

অস্থি মানে যে হাড়, এবং এটা যে পুরোপুরি এদেশি শব্দ, এ ব্যাপারে কারোর মনে কোনোরূপ সংশয় থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই যে সাহেবরা অস্থিবিদ্যার নাম রাখল অস্থিওলজি (osteology), এটা চুরি নয়? 'যে-কোনো কষ্টের বিনিময়ে' কথাটাকে ওরা কি বলে? at any cost (কষ্ট)। আমাদের 'মশক' কে ওরা একটুখানি বদলে নিয়ে বলে 'মসকুইটো'। লজ্জা করে না?

হলফ করে বলতে পারি, এমনতরো শয়ে শয়ে এদেশি শব্দ সাহেবরা স্রেফ চুরি করে একটুখানি বেঁকিয়ে-চুরিয়ে নিজেদের অভিধানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথচ সর্বদা এমন ভাব করে, যেন আমরাই চোর, আর ওরা-সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। কতখানি নির্লজ্জ বেসরম হলে চালুনি হয়ে সূঁচের ছিদ্র অন্বেষণ করতে যায়, একটিবার ভেবে দেখুন।

চপলকুমারের রবীন্দ্রচর্চা

আমার বন্ধু চপলকুমারকে তো আপনারা চেনেন। সেই যে বিশ্বপাকা, সবজান্তা, হাফ-বয়েলড, দরকচা-মারা, আধা-আঁতেল বন্ধুটি আমার, সৃষ্টিছাড়া কথা বলায় যার জুড়ি নেই। কিন্তু সে যে ভেতরে ভেতরে একজন ঘোরতর রবীন্দ্র-গবেষক, কবিগুরুর একজন গুরুতর অনুরাগী, সেটা বুঝতে পারলুম, যেদিন ও আমাদের কাজের মাসিদের ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়ার উপযোগী একটি মোক্ষম রবীন্দ্রসঙ্গীত বেছে দিল।

একসঙ্গে এতগুলো আঁতেল-মার্কা 'দাদাবাবু' দেখে আমাদের বাড়ির কাজের ঠিকে-ঝি কাঞ্চি-মাসি ঘর মোছা থামিয়ে আমাদের কাছটিতে এসে একটা আজব বায়না ধরেছিল, কিনা, তাদের 'সারা বাংলা ঠিকে-ঝি ইউনিয়ন'-এর বার্ষিক সভার জন্য একটা গান বেছে দিতে হবে। ওই যে, সভা শুরু করার আগে বেশ থমথমে মুখ করে একটা গান গাওয়া হয় বাবুভায়াদের সভাসমিতিতে। ওই রকম একটা গান। ঠিকে ঝি-দের যে একটা রাজ্যব্যাপী ইউনিয়ন রয়েছে, সেই ইউনিয়নের যে রীতিমতো বার্ষিকসভা হয় এবং সেই সভার উপযোগী একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত চাই, কাঞ্চী-মাসির এ হেন আবদারে আমরা যারপরনাই চমৎকৃত।

ঠিক সেই মুহূর্তে চপলকুমার আমাদের আড্ডার সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে অবলীলায় বলে উঠল, আছে। রবীন্দ্রনাথই তোমাদের জন্য লিখে গিয়েছেন তেমন গান।

একটুখানি ভেবে নিয়ে চপলকুমার বলল, তোমরা তো ওই গানটা গাইতে পার মাসি, ওই যে, 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজে...'। পুরো গানটা পরের দিন লিখে এনে দেবে, চপলকুমারের এমন প্রতিশ্রুতিতে কাঞ্চি-মাসি একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে শুধোই, গানটা গাইবে কে, মাসি?

কাঞ্চি-মাসি বলে, সে ভাবনা নেই। সারা বাংলা জুড়ে কত-কত গাইয়ে বাড়িতেই তো আমাদের মেম্বাররা কাজ করে সম্বৎসর। তেনাদের একজনকে বললেই রাজি হয়ে যাবে নে। অমত করলে পরের দিন থেকে ওই বাড়িতে আর ইউনিয়নের কেউই কাজ করতে যাবেনি।

কাঞ্চি-মাসি চলে যাওয়ার পর আমরা চপলকুমারকে চেপে ধরি। এবং আমাদের সমবেত জেরায় একসময় সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সে নাকি প্রায় দু'দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের উপর এক প্রাণান্তকর গবেষণা চালিয়ে সম্প্রতি একটি বিশাল পেপার তৈরি করেছে, এবং পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ওটাকে বিশ্বভারতীতে পাঠাতে চলেছে। তার গবেষণার বিষয় নাকি, 'রবীন্দ্রনাথকে ছ'অক্ষুরি আঁতেলদের খপ্পর হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের সর্বস্তরের, সব বৃত্তির মানুষের ভোগ্য করিয়া তুলিবার সহজ প্রণালী এবং রবি ঠাকুরের গানকে সর্ব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সহজ নিদানসমূহ'।

চপলকুমার গোমড়া মুখে বলে, আরে, এতকাল তো কবিগুরু কেবল ছ'অক্ষুরিদের খপ্পরে পড়ে রয়েছেন। এতকাল বভ্রুবাহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষাদসিন্ধু চক্রবর্তী, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বিপদভঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এরাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লোকাল গার্জিয়ান। অন্তত ছ'টি অক্ষরযুক্ত নাম ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলার অধিকারীই ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ তো সকলেরই কবি। সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্যই তিনি ভেবেছেন, লিখেছেন। আমার তো মনে হয়, এই ভাবে চলতে থাকলে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষ শেষ অবধি ভুলেই যাবে। এমনিতে রবীন্দ্রনাথকে তো ইদানীং কেউই আর পড়ে না। তাঁকে আর কারোরই তেমন মনে পড়ে না। বছরে একটি দিন, ২৫ বৈশাখ, তাও তাঁর জন্মতিথিটা পালন করার একটা রেওয়াজ ছিল। কালক্রমে তাও অবলুপ্ত হওয়ার পথে। একমাত্র



রবীন্দ্রসঙ্গীতই যা একটু-আধটু টিমটিমিয়ে জ্বলছে। তাও ইদানীং তা কেবল উদ্বোধনী সংগীতে এসে ঠেকেছে।

চপলকুমার নিজের উরুতে মোক্ষম চাপড় মেরে বলল, ওই এক গানই কবিগুরুকে বাঁচিয়ে রাখবে, দেখিস। আরে, গানেই তো তাঁর নোবেল প্রাইজ। গীতাঞ্জলি। তবে, গুরুদেবের গানকে সর্বত্রগামী করতে হবে। আঁতেলদের খপ্পর থেকে তাদের মুক্ত করে আপামর জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। রবিবাবু তো আর কেবল আঁতেলদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সমাজের সব স্তরের, সব বৃত্তির মানুষের তরে তিনি গান লিখেছেন। সবার জন্যই কলম ধরেছেন তিনি। তবে সেসব গান আর ইদানীং ক'জনাই বা শুনছে! এখন তো রবীন্দ্রসঙ্গীত স্রেফ উদ্বোধনী সংগীতে এসে ঠেকেছে। ভাগ্যে কিছু অনুষ্ঠানে আজও উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়ার রেওয়াজটা টিকে রয়েছে, নইলে...।

আমরা ওর কথায় সায় দিয়ে বলি, সেটা অবশ্য ঠিক, তবে ওই জাতের অনুষ্ঠান তো হাতে গোনা যায়। ধরো, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে, 'হে নতুন, দেখা দিক আর বার, জীবনের প্রথম শুভক্ষণ'। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু...' কিংবা 'দিন ফুরলো হে সংসারি...'। ফেয়ারওয়েলে, 'ভরা থাক, স্মৃতিসুধায় জীবনের পাত্রখানি...' কিংবা, 'তবু মনে রেখো...।' কৃষিমেলায় 'আমরা চাষ করি আনন্দে...' গোছের কিছু মার্কামারা গান।

চপলকুমার আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলে, আরে, ও সব তো খানদানিদের বাছাবাছা কিছু অনুষ্ঠানের গান। কিন্তু এই ক'টি মাত্তর অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে রবিবাবুকে আর ক'দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? আসলে, রবি ঠাকুর তো আর কেবল ওই ক'রকম অনুষ্ঠানের জন্যই গান লেখেননি, তিনি সব শ্রেণির, সব বৃত্তির মানুষের সব অনুষ্ঠানের জন্যই গান লিখে গিয়েছেন।

কাঞ্চি-মাসিদের ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে দেওয়ার পর সেই খবরটা যে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, সেটা বুঝি স্বয়ং চপলকুমারও ভাবেনি। ফলে, পরের রোববারই, আমাদের আড্ডাটা তখন জমে উঠেছে, আচমকা রামু গোয়ালা এসে হাজির। রামু আমাদের বাড়িতে মাস-কাবারি দুধ দেয়। মাঝে মাঝেই তার দুধে রঙ থাকে না বটে, তবে এমনিতে লোকটি সিধে সরল। বলে, আমাদের 'সারা বাংলা খাটাল-মালিক সঙ্ঘ' একটা গো-প্রদর্শনী-কাম-গো-বেবি শো-কাম-গো-মেলা করতে চলেছে। একজন জবরদস্ত এম-পি উদ্বোধন করবেন। একটা জুতসই উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে দিতে হবে দাদা। যেন ধন্যি-ধন্যি রব ওঠে চতুর্দিকে।

শুনে আমাদের তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। গরুর হাটের জন্য উদ্বোধনী সঙ্গীত! তাও লিখে রেখে গিয়েছেন কবিগুরু! তাজ্জব কি বাত!

চপলকুমার কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হয় না। একটুখানি মাথা চুলকে ভাবে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, খাটাল-মালিকদের নিয়ে কবিগুরু তো অনেক গানই লিখেছেন...'ওই তো তোমার আলোক-ধেনু...' কিংবা গাওয়া যেতে পারে 'ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু...', সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় ওই গানটা 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে...।'

রামু গোয়ালা চলে যাওয়া মাত্তর আমরা সবাই একযোগে চপলকুমারকে চেপে ধরলুম,

তুমি বলতে চাও, সত্যি সত্যি সমাজের সব রকমের মানুষের সব রকমের অনুষ্ঠানের উপযোগী গান রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন?

—আলবৎ। চপলকুমার কপালের তাবৎ বলিরেখায় ভাঁজ তুলে, সারা মুখে প্রাজ্ঞতার মুদ্রা রচনা করে বলে, ধরো, রেস্টুরেন্ট, বিউটিপার্লার, সেলুন, পাবলিক ইউরিন্যাল কিংবা লন্ড্রি উদ্বোধন হবে, সদ্য ভোটে জেতা নেতাটিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, গো-প্রদর্শনী কিংবা গ্যারেজ উদ্বোধন, বিদ্যুৎ দফতরের কিংবা টেলিফোন দফতরের কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে শুরু করে মাতাল, পকেটমার, ছিনতাইবাজদের বার্ষিক অনুষ্ঠান, সব কিছুর জন্যই একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে। কেবল এ দেশের ছ'অক্ষরি গবেষকরাই তাঁর গানকে আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে দিচ্ছে না। আমি কিন্তু গবেষণা করে সমাজের সব শ্রেণির মানুষের সব ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত খুঁজে বের করেছি। পেপারটা ছেপে বেরোলে তোমরাও তা পুরোপুরি জানতে পারবে।

—সে তো জানবোই। আমরা চপলকুমারকে সমবেতভাবে চেপে ধরি, ...আপাতত দু'চারটে স্যাম্পল ছাড়ো না। কৌতূহল যে আর বাগ মানছে না।

চপলকুমার মুচকি হেসে বলল, আজ নয়, পরের হপ্তার আড্ডায় কিছু মোক্ষম স্যাম্পল ছাড়ব। ততদিন অবধি ধৈর্য ধর বৎসগণ। জানোই তো, সবুরে মেওয়া ফলে।

পরের হপ্তায় আড্ডাটা সবে শুরু হতে যাচ্ছে, এমনি সময় 'চপলকাকু...চপলকাকু... বলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পাড়ার প্রায় হাফ-ডজন ছেলে। তাদের স্কুলের বদরাগী, প্রহারপটু অঙ্কের মাস্টারটি চলে যাচ্ছেন। তাঁব ফেয়ারওয়েলের জন্য উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে দিতে হবে।

চপলকুমার মুচকি হেসে বলল, এমনি সাধারণ ফেয়ারওয়েল হলে অত কিছু ঝামেলি ছিল না। 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়' কিংবা 'তবু মনে রেখো' দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যেত।

ভাবতে অবশ্য বেশি সময় নিল না চপলকুমার। বলল, তোমরা বরং ওই গানটাই গাইতে পার। ওই যে, 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান...।' খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে।

ছেলেগুলো চলে যেতেই আমরা চপলকুমারকে চেপে ধরি, তুমি আগের আড্ডায় কথা দিয়েছিলে রবীন্দ্রসংগীতের সর্বত্রগামিতা নিয়ে কিছু স্যাম্পল ছাড়বে, কই, শোনাও।

চপলকুমার উৎসাহ পেয়ে বলে ওঠে, শোনাচ্ছি, তবে একটা রিকোয়েস্ট, বিশ্বভারতী পেপারটা অ্যাকসেপ্ট করবার আগে যেন ওগুলো পাঁচকান করো না। কে আবার শুনে-টুনে, টুকে-ফুকে মাঝের থেকে কেল্লা ফতে করে বেরিয়ে যাবে। যা চোর-ছ্যাঁচোড় বেড়েছে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু, তাই...।

এরপর, চপলকুমার একে একে স্যাম্পল পেশ করতে থাকে।

বলে, পুষ্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবে? গাও, 'পুষ্পবনে পুষ্প নাই, আছে অন্তরে...,' খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। কিংবা বিবাহবার্ষিকীতে,

'দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ,
কল্যাণ-করে মঙ্গল ডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।'

এই উপলক্ষ্যে 'দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিল যদি...। গানটাও মন্দ হবে না।

একটা বিউটি পার্লার উদ্বোধন হবে? বোম্বে-ফিল্মের কোনো সুপার-স্টারিকা আসবেন



ফিতে কাটতে? উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে,

'তোমায় সাজাবো যতনে, কুসুমরতনে,
কেয়ুর-কঙ্কনে, কুমকুমে চন্দনে
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা
সীমন্তে সিন্দুর অরুণবিন্দুর, চরণ রঞ্জিব অলক্ত অঙ্কনে...।' গানটা খুবই মানানসই হবে।

তারপর-গে ধর, তিন-তিনবার ভোটে জেতা কোনো নেতার সংবর্ধনা-সভায় অনায়াসেই গাওয়া চলে, 'মাঝেমাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই নে' কিংবা

'ক্ষণিক আলোয় আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে..।'

দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা সচ্ছন্দে গাওয়া যায়। যে কোনো একটাই বা কেন? আজকাল তো উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পর পর দু'তিনটে গান গাইবার রেওয়াজ হয়েছে। কারণ, পরের গায়করা তো দিব্যি পাঁচ-ছটা গান গেয়ে তবেই আসর ছাড়বে। মাঝের থেকে একটা মাত্তর গান গাইলে উদ্বোধনী গায়ক বেচারার ডাহা লোকসান। কাজেই, সেও একটা গান শেষ করেই কেউ কিছু বোঝার আগেই দ্বিতীয়টা ধরে দেয়। কর্মকর্তাদের যতক্ষণে হুঁশ হল, ততক্ষণে তিনটে গেয়ে ফেলেছে। তাই বলছিলুম, এক্ষেত্রে গায়ক ইচ্ছে করলে ওই দুটো গানই গাইতে পারে।

তারপর ধরো, বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির অনুষ্ঠানে, 'আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে।

সব দুখশোক সার্থক হল লভিয়া তোমারি আলো হে...' গাওয়া যেতে পারে।

বিদ্যুৎ দফতরের কর্মচারী সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে...'। আবার, যারা হুক করে বিদ্যুৎ নেয়, তাদেরও তো ইদানীং অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে। তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে গাইতে পারে 'আলোক চোরা লুকিয়ে এল ওই...।' টেলিফোন দফতরের কর্মচারী সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, 'তুমি রবে নিরবে...।' কিংবা 'একদিন কোন হাহারবে,/তার ছিঁড়ে গিয়েছে কবে...,'। সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়া যায় ইঙ্গিতে...।' পরিবেশ দফতরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, 'না গো, এই ধূলা আমার না এ...।' কিংবা দমকল দফতরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'ওরে আগুন আমার ভাই,/আমি তোমারই জয় গাই...'। কিংবা 'আগুনে হল আগুনময়/জয় আগুনের জয়...'। সারা বাংলা ভাড়াটে সমিতির সভায়, 'হায় হায় রে পরবাসী,/হায় গৃহ ছাড়া উদাসী...।' কিংবা, 'এই পরবাসে কে রবে...।' কিংবা, 'পরবাসী চলে এস ঘরে...।' গানগুলো তো মনে হয় খুবই লাগসই হবে।

একটা রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন হবে, স্বচ্ছন্দে গাওয়া যায়,

'কতকাল রবে বল ভারত রে,
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মাটন...।'

মদের বার উদ্বোধনে, 'সুধাসাগর তীরে হে, এসেছে নরনারী সুধারস পিয়াসে...।' কিংবা 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে এলো ওরে,/তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে...'। আবার সারা বাংলা মাতাল সঙ্ঘের সভায়, 'ফেরালে মোরে বারে বারে (bar)' কিংবা 'অভয় দাও তো বলি আমার Wish কি/একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিনপোয়া হুইস্কি...' গানগুলোও জমে যাবে। আবার, ওইসব বার-রেস্টুরেন্টে যেসব পার্টি হবে, তাতে মাগনায় খেতে আসা আমন্ত্রিতরা সহর্ষে গাইতে পারে, 'যদি জোটে রোজ,/এমনি বিনি পয়সার ভোজ,/ডিসের পর ডিস,/শুধু মাটন-কারি ফিশ,/সঙ্গে তার হুইস্কি-সোডা দু'চার রয়্যাল ডোজ...।'

উদ্বোধনী সঙ্গীত বিচিত্রা

ইদানীং চারদিকে হরেক পেশা ও বৃত্তির মানুষজনদের নিজস্ব অ্যাসোসিয়েশন গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো। সেটা ভাল কি খারাপ তা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে, এতে করে আমাদের বন্ধু চপলকুমারের কপাল ফিরে গিয়েছে। কারণ, সে আর ইদানীং মাগনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে দিচ্ছে না। এর জন্য রীতিমতো ফি'জ নিতে শুরু করেছে।

সেদিন আড্ডায় এসে খুব চাপা গলায় বলল, দক্ষিণাটা, বুঝলে, একেবারে দক্ষিণা-বায়ুর মতো। মনপ্রাণ জুড়িয়ে দেয়। কাজে মন আসে। এই দ্যাখো না, সেদিন রকবাজদের অ্যাসাসিয়েশন তাদের বার্ষিক সভার জন্য উদ্বোধনী সঙ্গীত নিয়ে যাওয়ার সময় কড়কড়ে একশো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। কী ভাল যে লাগল! পরের দিনই তাদের পাল্টা অ্যাসোসিয়েশনটি এল নগদ দুশো টাকা নিয়ে। তারপর থেকে কাজে বেশ ইনসেনটিভ এসেছে। ব্যাপারটাকে নিয়ে বেশ ইনটেনসিভ স্ট্যাডি করতে শুরু করেছি। ইনসেনটিভ ছাড়া কি ইনটেনসিভ হওয়া যায়, বল?



বলি, একই জাতের দুটো অ্যাসোসিয়েশন? ভারি মুশকিল তো। তা, কাকে গানটা দিলে? কাকেই বা ফিরিয়ে দিলে?

সারা মুখে উদার হাসি ফুটিয়ে চপলকুমার বললো, ফেরাব কেন? দস্তুর মতো হাতে লক্ষ্মী নিয়ে এসেছে। হাতের লক্ষ্মীকে কি পায়ে ঠেলা ভাল?

বলি, সে কি! একই গান দু'জনকে দিলে? দুটো প্যান্ডেলে যখন একই গান গাওয়া হবে, দু'দলই চাঁদা করে প্যাঁদাবে যে তোমায়।

চপলকুমার মুচকি হেসে বলে, বালাই ষাট। একই গান দেব কেন? রবীন্দ্র-ভাণ্ডারে কি গানের দুর্ভিক্ষ পড়েছে নাকি? দু'দলকে আলাদা গানই দিলাম। প্রথম দলটাকে দিলাম, 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্মপত্রে জল, সদা করছি টলমল...।' আর দ্বিতীয় দলটাকে দিলাম, 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না...।'

শুনে আমরা যারপরনাই মজা পাই। বলি, সে না হয় হল, কিন্তু আড্ডাটায় কামাই দিচ্ছ কেন? গেল-হপ্তায় ডুব মেরেছ।

—সাধে কি ডুব মেরেছি? একেবারে রবীন্দ্র-কাব্যে ডুব দিয়েছি যে। এখন আমার হাতে প্রচুর কাজ। উদ্বোধনী-সংগীতের বরাত এসে জমে রয়েছে না হলেও এক ডজন। অ্যাডভান্স গুঁজে দিয়ে গেছে হাতে। কবিগুরুর বিশাল গীতসমুদ্র থেকে সেসব বেছে বের করা, বলা যায়, সিন্ধু ছেঁচে মুক্তো তোলার শামিল। আমার তো এখন দিনরাত একাকার।

মজা করে বলি, গীতসমুদ্র কোথায় হে? সমুদ্রের একটা মাত্তর অঞ্জলি বৈ তো নয়। গীতাঞ্জলি। কবি নিজেই তো দিয়েছেন ওই নাম।

চপলকুমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ওই এক অঞ্জলিতেই আমার ডুবে মরবার উপক্রম। সমুদ্র হলে তো...।

—তা, গান বাছা হল?

—হল বৈকি। অ্যাডভান্স দিয়ে গেছে। ছাড়বে নাকি? বলতে বলতে চোখের কোণে হাসে চপলকুমার। বলে কয়েকটা স্যাম্পল শুনবে নাকি? শোন তবে। গ্যারাজ উদ্বোধন করবে লিচুবাগানের মধু ভঞ্জ। গ্যারাজ উদ্বোধনের জন্য তো একাধিক উত্তম গান লিখেছেন কবি। আর, আজকাল যে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে একাধিক গান গাওয়া চলে, বলেছি তো তোমাদের। কাজেই, প্রথমে বেদমন্ত্র গানের ঢং-এ গাওয়া যেতে পারে, 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র...' গানটা, দ্বিতীয় গান হিসাবে গাওয়া যায়, 'দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি,/কখন তব রথ আসে, ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি...।' মনে হচ্ছে না যে গ্যারাজ উদ্বোধনের কথা ভেবেই গানটি লিখেছিলেন কবি? তারপর ধরো, লন্ড্রি উদ্বোধন করবে কেয়াতলার মানিক দাস। ওকে দিলাম, 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার,/আমার এই মলিন অহংকার...।' তারপর ধর গিয়ে...দিলাম...চোরেদের সমিতির জন্য একটা, গেরস্তদের প্রতিরোধ কমিটির জন্য একটা, পকেটমারদের সঙ্ঘের জন্য একটা, ছিনতাইবাজদের একটা, সারা বাংলা পাগল-সমিতিকে একটা...এইসব আর কি।

—বলো, বলো, থামলে কেন? কাকে কোনটা দিলে? আমরা হৈ হৈ করে উঠি।

আমাদের এমন অকপট উৎসাহ (কিংবা বলা যায়, অকপাট উৎসাহ, অর্থাৎ কপাটহীন, মানে আগলহীন উৎসাহ) দেখে চপলকুমার মনের কপাটটি হাট করে খুলে দেয়। বলে,

শোন তবে। গেরস্তদের প্রতিরোধ-কমিটিকে দিলাম, 'ধর ধর, ওই চোর, ওই চোর...।' গানটা।

চোরেদের অ্যাসোসিয়েশনকে দিলাম, 'নই আমি, নই চোর,/নই চোর, নই চোর.../
অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে...।'

পকেটমার-সঙ্ঘকে দিলাম, 'জানি বন্ধু জানি, তোমার আছে তো হাতখানি/
লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে...।'

ছিনতাইবাজ-সমিতিকে দিলাম,

'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে
কখন তুমি এলে হে নাথ মৃদু চরণপাতে...।'

বলতে বলতে এক চোখ ছোট করে হাসে চপলকুমার। বলে, শুধু এই নাকি? এইসব বায়নার মাল ছাড়াও আরও অনেক গান আমি আগাম বেছে রাখছি। বরাত পেলেই হাতে-গরম সাপ্লাই করে দেব। আর, যে হারে নাম ছড়াচ্ছে আমার, বরাত আমি পাবোই। আরও ঢের ঢের বরাত। কাজেই, আগে থেকে যদি তৈরি না থাকি তো টাইম্‌লি মাল সাপ্লাই করতে পারব না। লক্ষ্মী দোরগোড়ায় এসেও ফিরে যাবে। এই যেমন ধর, ভিখিরিদের অ্যাসোসিয়েশন তাদের বার্ষিক সভা করে-টরে তো। ভিখিরিদের বার্ষিক সভার উদ্বোধনের জন্য কোন্ মন্ত্রী অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবেন বল দেখি? পারলে না তো? অর্থমন্ত্রী। তা ওই সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে অনায়াসে গাওয়া যেতে পারে,

'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই
তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে...।'

ধর, একটা পাবলিক ইউরিন্যাল বানিয়েছে রায়বাগানের হৈ-হৈ সঙ্ঘ। শুনেছি, শিগগির উদ্বোধন করাবে। লোক্যাল এম পি নাকি ফিতে কাটবে। যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে আমার কাছে। আমি অবশ্য ওদের জন্য আগাম বেছে রেখেছি গান। কোন্ গানটা বাছলাম বল তো? ভেরি সিম্পল গান। 'সবারে করি আহ্বান...।' খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।

আচমকা আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাল চপলকুমার। সন্দেহে কুঁচকে গেল ভুরুজোড়া। বলল, খুব যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছ, অত কৌতূহল কেন তোমাদের? টুকে-ফুকে ঝেঁপে দেবার ধান্দা নাকি?

বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায় চপলকুমার, ইস, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। খুব দেরি হয়ে গেল।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলি, আরও অনেকগুলো শুনতে বাকি থেকে গেল যে।

হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চপলকুমার জবাব দেয়, পরের হপ্তা-য়।

উকিল নামক কোকিল

সেই যে, রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে রামকানাইয়ের উদারতা ও মহত্ত্বকে নিজের সওয়ালের গুণ বলে চালাতে চেয়েছিলেন উকিলবাবুটি, কি না, 'বাই জোভ, লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।' তখন থেকেই উকিলদের সম্পর্কে আমার উৎসাহ ও মনোযোগের শুরু।

এমনিতে তো, জে-বি-কুইনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায়, উকিলরা হলেন রাস্তার টোল-ব্রিজের অপারেটরের মতো। আদালতে বিচার চাইতে গেলে প্রত্যেক বিচারপ্রার্থীকে তার তলা দিয়ে যেতে হবেই। আর, অ্যামব্রোস বিয়ার্স-এর কথায়, আইনি ব্যাপার-স্যাপার হল এমন একটি কল, যাতে (বিচারপ্রার্থী) মানুষ আস্ত শুয়োর হয়ে ঢোকে এবং সসেজ হয়ে বেরিয়ে আসে।



এখন প্রশ্ন হল, সেই সসেজ বানানোর কলটি চালায় কে? অবশ্যই মামলায় নিযুক্ত দু'পক্ষের উকিলবাবুরা। তাঁরা দু'পক্ষতে মিলে দুই মক্কেলের পক্ষ নিয়ে করাতটিকে দু'দিকে চালান বলেই, এবং করাতটি শাঁখের করাতের মতো দু'দিকেই সমান ধারালো বলেই, বেচারা মক্কেল নামক শুয়োরটি অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসেই সসেজে পরিণত হয়।

সসেজ-কলকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে অ্যামব্রোস মক্কেলকে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাস্তবিক, মক্কেল শব্দটি আরবি 'মোআক্কিল' থেকে এলেও, কোনো কোনো শব্দবিদ এ ব্যাপারে ভিন্ন মতো পোষণ করেন। তাঁদের মতে, মরলেও আক্কেল হয় না বলেই তাদের বলা হয় মক্কেল (মরা + আক্কেল = মরাক্কেল—ময়াক্কেল—মক্কেল)। আর, তেমন আক্কেলহীন মানুষজনকে তো আমরা হরহামেশা শুয়োর বলে গালাগাল দিয়েই থাকি। কাজেই অ্যামব্রোস সাহেব মক্কেলকে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করে বোধ করি অন্যায় কিছু করেননি।

তবে অ্যামব্রোস সাহেব যেটা বলেননি, তা হল, সসেজ-কলের পাশাপাশি একটি আখ মাড়াইয়ের কলও চালান উকিলবাবুরা। এবং সেই কলটিতে আখের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মক্কেল নামের অভাগা মানুষটি। না, অ্যামব্রোস সাহেব তেমন কথা বলেননি, আবার বলেছেনও। একটু ঘুরিয়ে নাক দেখিয়েছেন তিনি। বলেছেন, যারা আইনি উপায়ে লোক ঠকানোয় দক্ষ, তাদেরই উকিল বলা হয়। বাস্তবিক, ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বেআইনি করে আইন হয়েছে, কিন্তু উকিলদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসকে বেআইনি করবার কথা এখনও অবধি কোনো উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরোয়নি। কাজেই, মেনে নিতেই হয় যে, তাঁরা মক্কেলের উপর যত বড় কাঁঠালই ভাঙুন না কেন, তা আইনি উপায়েই ভাঙেন। আর, আইন হল, জোনাথন সুইফ্‌ট-এর ভাষায়, একটি মাকড়সার জাল। ছোটখাটো, হালকা-পলকারা সেই জালে আটকে যায়, কিন্তু সমাজের ভারি-সারি রথী-মহারথীরা অবলীলায় সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

বলছিলুম আখমাড়াইয়ের কলের কথা। মক্কেল নামক পুরুষ্টু আখটিকে মাড়াই করে রস নিষ্কাশন করতে গিয়ে উকিলবাবুরা যে কতদূর অবধি যেতে পারেন, একটা চালু চুটকি থেকে তা খানিকটা বোঝা যায়। একজন প্রতিষ্ঠিত উকিলবাবু খুবই মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরলেন। বউ শুধোল, আজ অ্যাতো মনমরা কেন? মামলায় হেরেছ নাকি? উকিলবাবুটি বিমর্ষ মুখে জবাব দিলেন, না, না, একটা খুব বড় মামলায় জিতেছি আজ। কোর্টের রায়ে মক্কেল প্রচুর টাকা পেয়ে গেল। বউ বলল, তবে অ্যাতো দুঃখী দুঃখী লাগছে কেন? উকিলবাবু জবাব দিলেন, দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে এই কারণে যে, মামলায় জিতে যত টাকা পেল আমার মক্কেল, উকিলের ফি ইত্যাদি মিটিয়েও আরও কিছুটা টাকা থেকে গেল ওর কাছে।

ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ বলেন, উকিল আর কোকিল নাকি একই ডালের পাখি। দু'জনেই কালো পাখনায় ঢেকে রাখে শরীর। দু'জনেই আপাদমস্তক পরস্মৈপদী। অন্যের ঘাড়ে চড়েই কাটিয়ে দেয় জীবন। আর, মক্কেলের দুঃসময়ে কেটে পড়ে। যাকে বলে একেবারেই 'বসন্তের কোকিল'। ফাঁসির হুকুম পাওয়া মক্কেলের উদ্দেশে নাকি তার সর্বস্বহরণকারী উকিলবাবুটিকে বলতে শোনা গিয়েছে, আপনি আমার ফি'টা আগাম চুকিয়ে

দিয়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলে পড়ুন, আমি আপনার হাড় ক'টা নিয়ে উচ্চতর আদালতে লড়ে যাব।

তবুও আন্তন চেকভ মশাই ডাক্তারবাবুদের চেয়ে উকিলবাবুদের অন্তত একটা ব্যাপারে কিঞ্চিৎ বেশি নম্বর দিয়েছেন। তাঁর মতে, অর্থলুণ্ঠনের প্রশ্নে উকিল আর ডাক্তার একই গোত্রের পাখি, কেবল দু'জনের মধ্যে তফাত হল, উকিলরা তাদের মক্কেলদের টাকাকড়ি লুঠ করেই ক্ষ্যান্ত থাকে, কিন্তু ডাক্তার প্রথমে তার রোগীটির যথাসর্বস্ব লুঠ করে, তারপর তাকে মেরে ফেলে। অর্থাৎ আইনি ভাষায়, ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩৯৬ (ডাকাতি ও খুন) ধারাটি প্রযোজ্য, কিন্তু উকিলবাবুদের ক্ষেত্রে কেবল ৩৯৫ (ডাকাতি) ধারা।

এ-তো গেল তাদের অর্থগৃধ্নুতার কথা। উকিলদের বুদ্ধি আর চাতুর্যের প্রসঙ্গ তুললে সে এক মহাভারত হয়ে যাবে। বাস্তবিক, প্রতি মুহূর্তে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে ওকালতিতে পসার জমানো কঠিন। কারণ, আইন তো আর উকিলপিছু বদলে যাচ্ছে না। একই আইনের ওপর সবাইকে করে খেতে হয়। কাজেই, এক কুমিরছানাকে যে উকিলবাবু যতভাবে উল্টেপাল্টে দেখাতে পারবেন, কুমিরছানাটির রূপ যত চাতুর্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, ততই তাঁর জয় ; ততই তাঁর নামডাক। শেক্সপিয়রের 'মারচেন্ট অফ ভেনিস' নাটকটা তো স্রেফ একজন উকিলবাবুর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর চাতুর্যের ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটিবার ভেবে দেখুন, শেষ পর্বে উকিলবাবুর ওই চমৎকার চাতুর্যটুকু (সাইলক তার ঋণগ্রহীতার শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারে, কিন্তু খবরদার, এক ফোঁটা রক্ত যেন না বেরোয়। কারণ, চুক্তিতে মাংস কেটে নেওয়ার কথা বলা আছে, কিন্তু রক্ত বেরনোর কথা বলা নেই।) না থাকলে পুরো নাটকটা একেবারে নুলো-খোঁড়া হয়ে যেত।

উকিলি বুদ্ধির আর একটা গল্প বলেই এই কিস্তি শেষ করব। এক উকিলের ছেলে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে প্রতিবেশীর জানালার কাচ ভেঙেছে। প্রতিবেশী গেলেন উকিলের বাড়ি। মান্যগণ্য উকিলবাবুটিকে সরাসরি চার্জ না করে তিনি একটু রেখেঢেকে অভিযোগটা জানালেন। বললেন, আচ্ছা বলুন তো, কারও বাচ্চা যদি অন্যের জানালার কাচ ভাঙে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটির কী করা উচিত?

উকিলবাবুটি বললেন, ছেলেটির বাবার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা উচিত। আদালতে মামলা ঠুকে দিলে ছেলেটির বাবা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে।

প্রতিবেশী বলল, তাহলে আপনারই সেই ক্ষতিপূরণটি দেওয়া উচিত। কারণ, আপনার ছেলে আমার জানালার কাচ ভেঙেছে।

উকিলবাবুটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, তাই নাকি? তা, কত টাকা ক্ষতিপূরণ চাইছেন?

—অন্তত পঞ্চাশ টাকা।

—বেশ, তাহলে আপনি আমাকে দেড়শো টাকা দেবেন। কারণ, আমার কনসালটেশন ফি দু'শো টাকা। অন্যের জানালার কাচ ভাঙা নিয়ে আপনাকে যে এইমাত্র কিছু পরামর্শ দিলাম আমি, সেই বাবদ দু'শো টাকা পাওনা হয়েছে আমার। তার থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে...।

উকিলের কিল

উকিলবাবুদের উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে আগের কিস্তি শেষ করেছিলুম। কিন্তু শেষ করতে চাইলেও কি তা অত অল্পে শেষ হয়? উকিলবাবুদের উপস্থিত বুদ্ধির কি কোনো ইয়ত্তা আছে!

ওই নিয়ে আরও একটা চালু গল্প মনে পড়ছে।

একজন বোকাসোকা গ্রাম্য মানুষ শহরের আদালতে এসেছে একজনের নামে অভিযোগ জানাতে। বেচারা তো অত শত জানে না, সে সরাসরি হাকিমের সামনে গিয়ে হাতজোড় করে তার অভিযোগ জানাতে লাগল।

হাকিমসাহেব বুঝলেন, লোকটি অতি মাত্রায় সরল। আদালতের হাল-হকিকত কিছুই বোঝে না। অন্য কেউ হলে পেয়াদা দিয়ে তাড়িয়ে দিত, কিন্তু ওই হাকিমসাহেবটি ছিলেন খুবই দয়ালু আর সহানুভূতিপ্রবণ। তিনি ওই গ্রাম্য মানুষটিকে একটি লিখিত আর্জি পেশ করার পরামর্শ দিলেন।



গ্রাম্য মানুষটি তো আর্জি লিখতেই জানে না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হাকিমের দিকে।

হাকিমসাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, ওই তো বটতলায় কালো কোট পরে গাদা গাদা উকিল বসে রয়েছে। ওদের একজনকে গোটা পাঁচেক টাকা দিলেই আর্জি লিখে দেবে।

গ্রাম্য লোকটি বটতলায় গিয়ে উকিলবাবুদের কাছে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করে কথাটা।

শোনা মাত্রই একজন উকিলবাবু বলে ওঠেন, যাও গিয়ে হাকিমকে বলো, পাঁচ টাকায় আর্জি লেখার মতো উকিল বর্তমানে একজনও নেই বটতলায়। পাঁচ টাকায় যারা আর্জি লিখে দিত, তারা সবাই ইতিমধ্যেই হাকিম হয়ে গিয়েছে।

মক্কেল নির্বাচনে উকিলবাবুদের নাকি কোনো ছুঁৎমার্গ থাকে না। চোর, ডাকাত, লম্পট, স্মাগলার, মাফিয়া, খুনি, ভেজালদার, সবাইযের ত্রাতা হিসেবে তাঁরা অবলীলায় অবতীর্ণ হতে পারেন। কি না, আদালতে দোষ প্রমাণ না হওয়া অবধি সমাজের এইসব দুষ্ট কীটগুলি নাকি নিষ্কলঙ্ক।

উকিলবাবুদের মক্কেল নির্বাচন নিয়ে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখে শোনা। বন্ধুটি তখন মফস্বলের একটি আদালতের বিচারক। একদিন একজন উকিল একটি মামলায় তাঁর মক্কেলের পক্ষে সওয়াল করতে চাইলেন। ততদিনে মামলার শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে। উকিলবাবুটি তাঁর মক্কেলের পক্ষে পাক্কা দু'দিন সওয়াল করেছেন। সওয়াল-জবাব সব কিছুই শেষ হয়ে সেদিন ছিল রায় শোনানোর দিন। আমার বিচারক বন্ধুটি ওই পর্যায়ে আর সওয়াল করতে দিতে রাজি নন, উকিলবাবুটিও নাছোড়বান্দা। একে মফস্বল শহর, তার উপর এই উকিলবাবুটি আবার যারপরনাই মান্যগণ্য, প্রভাবশালী। কাজেই, এক সময় বিচারক বন্ধুটি সদ্য লেখা রায়টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উকিলটিকে জনান্তিক জানিয়ে দেন যে, রায় তাঁরই মক্কেলের পক্ষে গিয়েছে, অতএব আর নতুন করে সওয়াল করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাও উকিলবাবুটি আরও এক প্রস্থ সওয়াল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বিচারক বন্ধুটি বুঝতে পারেন, রায় দেওয়ার তারিখেও এক প্রস্থ সওয়াল করতে পারলে উকিলবাবু তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে ওইদিনের জন্যও মোটা ফি আদায় করতে পারবেন। সেই কারণেই মক্কেলের সামনে আবারও এক প্রস্থ বকবক করতে চাইছেন। কিছুতেই সওয়াল করার অনুমতি না পেয়ে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে গেলেন উকিলবাবুটি।

যা হোক, যথাসময়ে রায় তো পড়ে শোনানো হল। কিন্তু একটু বাদেই উকিলবাবুটি বিচারকের খাস-কামরায় ঢুকে আবেদন জানালেন, রায়ের কপিটা আজকেই দিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার। আমরা হায়ার কোর্টে আপিল করব কি না, তাই।

বিচারক অবাক হয়ে বলেন, মামলা তো আপনার মক্কেলের পক্ষে গিয়েছে। আবার আপিল কী জন্যে?

তার জবাবে উকিলবাবুটি নির্বিকার গলায় বলেন, আমি এখন অপোজিট পার্টি, অর্থাৎ যারা মামলাটায় হারল, তাদের পক্ষে আপনার কাছে এসেছি। তারা আমাকে এজন্য এইমাত্র নিয়োগ করল।

বিচারক বন্ধুটি অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু আপনি যে ওদের ব্রিফটা নিলেন, আপনার চোখে তো ওরা ঘোরতর অপরাধী। গত ক'দিন তো আপনি তথ্য-প্রমাণ সহযোগে সেটাই সাব্যস্ত করলেন।

উকিলবাবুটি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, ঠিকই, তবে ওরা যে তিলমাত্র দোষী নয়, বরং যারা এই মামলা জিতল, তারাই যে দোষী, এবার হায়ার কোর্টে সেটাই প্রমাণ করে ছাড়ব।

শুনে বিচারক বন্ধুটি তো থ।

উকিলদের নিয়ে সেদিন আমার সবজান্তা বন্ধু চপলকুমার দিল আর এক তথ্য।

বলে, উকিলের করাত দু'দিকেই কাটে। অর্থাৎ পশার জমলে ভালো, না জমলে আরও ভালো।

—মানে?

চপলকুমার মুচকি হেসে বলে, একটা সময় ছিল, যখন উকিলবাবুরা ওকালতির পাশাপাশি পলিটিক্সেও নাম লিখিয়ে রাখতেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশের বাঘা বাঘা উকিল-ব্যারিস্টাররাই তো রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে শোভা পেয়ে এসেছেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু, তস্য পুত্র জওহরলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে তস্য দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর, অশোক সেন, রাম জেঠমালানি, অরুণ জেটলি, মায় অজিত পাঁজা অবধি সবাই তো ওকালতি ও রাজনীতি দু'দিকেই কেটেছেন। চপলকুমার এক চোখ ছোট করে বলে, এ-ব্যাপারে মোক্ষম উদাহরণ গান্ধীজী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতিটা জমাতে পারলেন না বলেই না দেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে ছক্কাগুলো মারলেন। 'ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস'-এর এমন জ্বলন্ত উদাহরণ আর দু'টি নেই। ভেবে দ্যাখো দিকি, ভদ্রলোক ওকালতিতে ফেল না মারলে সারা জাতি পিতৃহীন হয়ে থাকত।

শেক্সপিয়র বলেছেন, উকিলদের খুন করা উচিত। অতীব মহৎ প্রস্তাব, কিন্তু মরবার পর তারা যাবে কোথায়? এই নিয়ে একটা চালু চুটকি দিয়েই এই প্রসঙ্গের ইতি টানব।

স্বর্গ আর নরকের মাঝখানের পাঁচিলটা ভেঙে গিয়েছে। নরকবাসীরা মাঝেমাঝেই স্বর্গে ঢুকে উৎপাত বাধায়। দেবরাজ ইন্দ্র যমরাজকে বারবার চাপ দিচ্ছেন পাঁচিলটা সারিয়ে ফেলার জন্য, কারণ তাঁর মতে, নরকবাসীরাই নাকি স্বর্গে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য পাঁচিলটা ভেঙেছে। কিন্তু যমরাজ পাঁচিল সারানোর খরচ দিতে একেবারেই রাজি নয়।

ইন্দ্র তখন একটা রফা করতে চাইলেন।

বললেন, তা হলে অন্তত পাঁচিল সারানোর খরচটা দু'পক্ষ আধাআধি দিক।

যমরাজ তাতেও রাজি নয়।

এই নিয়ে বিতণ্ডা চলতেই থাকে। অবশেষে যমরাজ প্রস্তাব রাখেন, চল, আমরা ট্রাইবুনালে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করি। দু'পক্ষের উকিল সওয়াল করুক। সব শুনেটুনে ট্রাইবুনাল যা রায় দেবে, আমরা মেনে নেব।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন প্রস্তাবটা। যমরাজকে বললেন, সেক্ষেত্রে আমি তো উকিলই পাব না। সব উকিলই তো তোমার জিম্মায়।

আবহাওয়া সংক্রান্ত

আমার এক নিচু ক্লাসের সহপাঠী পড়বার ও লিখবার বেলায় হামেশাই ইংরেজি ওয়েদার আর হোয়েদার শব্দদুটিকে গুলিয়ে ফেলত। সেই কারণে তাকে শিক্ষকদের থেকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যঙ্গবিদ্রূপবাণে জর্জরিত হতে হত। কিন্তু বড় হয়ে বুঝেছি, বন্ধুটিই ঠিক ছিল। অর্থাৎ, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ওয়েদার-হোয়েদারে এমন গুলিয়ে যাওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

আসলে, ওয়েদার তো সর্বদাই একটি বড়সড় 'হোয়েদার'। অর্থাৎ টু-বি অর নট-টু-বি। হবে কী হবে না। 'বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি' হবে কিনা, নিম্নচাপ আচমকা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আছড়ে পড়ে ঝড়ঝঞ্ঝা বাধাবে কি না, আকাশ 'আংশিক মেঘলা' থাকবে নাকি পরিষ্কার থাকবে, গরম বাড়বে নাকি কমবে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত



হবে, তাই নিয়ে সারাক্ষণ এক-একটি বিগ 'হোয়েদারের' সামনা-সামনি হতে হয় প্রত্যেক মানুষকে। আর, আবহাওয়াবিদরা আমাদের ঘাড় থেকে সেই হোয়েদারের বোঝা খানিকটা লাঘব করতে গিয়ে আমাদের আরও বিপাকে ফেলে দেন। আমরা ছাতা হারাই, সর্দি-জ্বর নিউমোনিয়া বাধাই, সে প্রসঙ্গ পরে।

শ্রীমতী খনা ছিলেন আমার জানা এ দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আবহাওয়াবিদ। তাঁর সময়ে থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, হাওয়ামোরগ, স্যাটেলাইট ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি কেবল প্রকৃতির হরেক নিয়মাদি পর্যবেক্ষণ করেই জলবায়ু, আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর বিশাল আবহাওয়া ফোরকাস্টের বিদ্যেটি। খনার বচন। আবহাওয়া ফোরকাস্টের উপর সম্ভবত এটাই এ দেশের প্রাচীনতম উদ্যোগ।

খনার আবহাওয়া ফোরকাস্টের ধরনটি কেমন? বামুন, বাদল, বান/দক্ষিণা পেলেই যান। অর্থাৎ বামুন, ঝড়-বাদল এবং নদী ও সমুদ্রে জোয়ার, এই তিনটি বস্তু দক্ষিণা পেলেই নিবৃত্ত হয়। বামুনের বেলায় দক্ষিণা বলতে নগদ-বিদায়, আর বাদল ও বানের বেলায় দক্ষিণা বলতে দক্ষিণা বায়ুর আগমন। কিংবা ধরুন, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ/যদি বর্ষে মাঘের শেষ। অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষদিকে বৃষ্টি হলে, সে-বছর ফসল খুব ভাল হবে। অর্থাৎ কেবল পুণ্যবান রাজার রাজত্বেই মাঘের শেষে বৃষ্টি হয়, যাতে ফসল ভাল হয়, এবং প্রজারা সুখে থাকে। আমে ধান,/ তেঁতুলে বান। অর্থাৎ যে বছর আমের ফলন ভাল হবে, সে-বছর ধানের ফলনও ভাল হবে। কিন্তু যে বছর তেঁতুলের ফলন ভাল হবে, সে বছর বন্যা অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমতি খনা যে কোন পদ্ধতিতে এবংবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা আর আমাদের পক্ষে জানবার উপায় নেই, কিন্তু মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, খনার বচনগুলি নাকি শতকরা একশো ভাগ ফলতে দেখা গিয়েছে।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যখন আবহাওয়া দফতরে জয়েন করল, তখন বুঝিনি তার জীবনের হাওয়া কোনদিকে বইছে।

এমনিতেই হাওয়া এবং আবহাওয়া দুটো শব্দই ভারি গোলমেলে। এবং যৎপরোনাস্তি খামখেয়ালি আর রহস্যময়। 'হাওয়া বড় প্রতারক...' কোনো এক কবির একটি কবিতার পংক্তি এটা। মোরগের মতো অনুগত ও বিশ্বস্ত খাদ্যপ্রাণীটিও হাওয়ার টানে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। তার ঘুরপাক খাওয়ার মানে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খান তাবড় হাওয়া-বিশারদরাও।

বন্ধুটি হাওয়া-অফিসে জয়েন করার কথা শুনে তার গৃহিণী নাকি তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, দ্যাখো বাপু, ওয়েদার ফোরকাস্টের নামে আলফাল বকেটকে শেষমেষ আমার বাপের বাড়ির লোকজনের মুখে যেন কালিটালি ছিটিও না। শেষ অবধি সামাল দিতে না পারলে চারপাশের মানুষজন আমার বাপের বাড়ির লোকজনকেই দুয়ো দেবে।

বাস্তবিক, যে আবহাওয়াবিদ নিত্যদিন নিজের গৃহিণী ও শালিকার কাছে মুখ ঝামটা খান না, তিনি আবহাওয়াবিদই নন। আ...হা, কেমন সোনামুখ করে বল, কি না, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে! মুরোদ নেই, তাও পাকাপাকা কথা বলা চাই। আরে বাবা, হাওয়া নিয়ে কথা চলে? ভাবো তো, নিম্নচাপ হল কোন আন্দামান দ্বীপের কাছে, আর তুমি কি না এখানে



বসে হিসেব কষে বলে দিলে, কবে, ঠিক ক'টায়, সেই নিম্নচাপ ভারতের কোন উপকূলে আছড়ে পড়ে কোন অনর্থ ঘটাবে। কত সেঃমিঃ বৃষ্টি হবে, ক'বার বাজ পড়বে, কতখানি শব্দ হবে তার, কত মাইল বেগে হাওয়া বইবে, তাতে কতগুলি ঘর উড়িয়ে নিয়ে যাবে, ক'জোড়া বক মরবে কোন গাছের চুড়োয়...বোগাস। বন্ধুটির মুখ থেকেই শোনা, ইদানীং নাকি সে রেডিওতে 'প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা' গোছের ফোরকাস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই তার বউ আর মেয়ে বাড়ির যাবতীয় কাপড়চোপড় কাচতে লেগে যায়। কি না, যাক, একটা পুরো খটখটে শুকনো দিন পাওয়া যাবে তবে। শুনেছি, প্রত্যেক দিন অফিসে বেরোবার সময় আমার সেই আবহাওয়াবিদ বন্ধুটির গৃহিণী নাকি একেবারে শেষ মুহূর্তে স্বামীকে সতর্ক করে দেন, সেই কথাটা মনে আছে তো? রাস্তায় ঘাটে ভুলেও যেন নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলো না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে। বাস্তবিক, 'আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে' —এমন ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ছাতা না নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে কত মানুষ যে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি-জ্বর বাধিয়েছেন, কিংবা 'আজ প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা' এমন কথায় ভুলে ছাতা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে কত মানুষ যে ছাতা হারিয়ে ঘরে ফিরেছেন, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। ফলে রাস্তায় ঘাটে পাবলিক কোনো গতিকে চিনে ফেললে যে আবহাওয়াবিদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

দেখে শুনে আমার বন্ধু চপলকুমারের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ হল, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে তথাকথিত আবহাওয়াবিদকে না পুষে আবহাওয়া দফতর যদি কিছু পিঁপড়ে আর

ব্যাঙগোছের প্রাণীকে পুষত, তবে ওরা অনেক অল্প খরচে অনেক ঠিকঠাক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত। কারণ, পিঁপড়ে, ব্যাঙ, মাগুর মাছ ইত্যাদি ইতর প্রাণীরা নাকি, তার মতে, মানুষের চেয়ে ঢের অ্যাকুরেট ফোরকাস্ট করতে পারে। পিঁপড়েরা খাবার বয়ে নিয়ে চলেছে, কিংবা খটখটে দিনে ব্যাঙেরা তারস্বরে ডেকে চলেছে, তার মানে বৃষ্টি আসছেই। মাগুর মাছ নাকি ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দেখা দিলেই অস্বাভাবিকভাবে লাফাতে থাকে।

চপলকুমারের কথাগুলি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কেন কী, সম্প্রতি আন্দামানে সুনামি হওয়ার পর একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী নাকি কবুল করেছেন, সুনামি আসার ঢের আগে থেকে তাঁদের গৃহপালিত পশুগুলি নাকি খুবই অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। আবহাওয়া দফতরের কর্তাব্যক্তিরা ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারেন।

দীর্ঘকাল ধরে আবহাওয়ার হাজারো 'সম্ভাবনা'র কথা বলতে বলতে আবহাওয়াবিদরা নাকি কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াটা প্রায় ছেড়েই দেন। এমনকী, 'তুমি কি আজ অফিসে যাবে?' গৃহিণীর এবংবিধ প্রশ্নের জবাবে সাচ্চা আবহাওয়াবিদ কখনওই বলেন না যে "হ্যাঁ, যাবো"। তার বদলে বলেন, "আজ আমার অফিসে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে।"

একজন প্রখ্যাত আবহাওয়াবিদ নাকি তাঁর কন্যার বিয়ের নেমন্তন্নপত্রটি এইভাবে লিখেছিলেন, 'আগামী অমুক মাসের তমুক তারিখে আমার একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমুকের সহিত অমুক জায়গা নিবাসী তমুকের পুত্রের শুভ পরিণয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পাত্র বাবাজি যদি শেষ মুহূর্তে অন্য কোনো দিকে ঘুরে গিয়ে অন্য কোনো কন্যার পাদদেশে আছড়ে না পড়ে, তবে উক্ত তারিখে বিবাহ বাসরে আপনি সবান্ধবে উপস্থিত থেকে বর-বধূকে আশীর্বাদ করে যাবেন...।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতই খাদ্য

চপলকুমারের উদ্বোধনী-সংগীতের বাজারটা যে দিনদিন বেশ জমে উঠেছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছিলুম বেশ। কাজের চাপে আড্ডায় আসা তো কিছুদিন হল বেশ কমিয়ে দিয়েছেই, ইদানীং বাড়ি থেকেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে না পেয়ে লোকজন আমাদের আড্ডা অবধিও ধাওয়া করে আসছে, কি না, চপ্পলকুমারকে দেখেছেন আপনারা? কোথায় পাব বলতে পারেন?

বলি, চপ্পলকুমার? মানে? আপনারা কি চপলকুমারের খোঁজ করছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চপ্পলকুমার। লোকগুলো একেবারে হামলে পড়ে,...কোথা পাব বলতে পারেন?



আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোই, কেন? কী করেছে ও? টাকা-পয়সা মেরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি?

ওরা দু'দিকে লম্বা করে মাথা দোলায়, আরে না, না। টাকা মেরে পালাবে কেন? আমরা বলে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ওর হাতে গুঁজে দেব বলে। কিন্তু পেলে তো।

গেল রোববারে এক লহমার জন্য আড্ডায় এসেছিল চপলকুমার।

আমরা চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরি ওকে। বলি, ভাগ্যি করে এসেছিলে বটে। একটা টাকা রোজগার করতে আমাদের হাড়-মাস একাকার হয়ে যায়, আর তোমার পিছনে কি না টাকা নিয়ে মানুষ হন্যে হয়ে দৌড়চ্ছে, আর তুমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছ, টাকাটা যাতে না নিতে হয়! এরই নাম কপাল।

চপলকুমার খুব বিমর্ষ মুখে বলে, সাধে কি আর পালিয়ে বেড়াচ্ছি। দেখতে পেলেই জবরদস্তি টাকা গুঁজে দিচ্ছে যে।

--ভালই তো। টাকা তো লক্ষ্মী। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছো কেন?

—আ-হা, বলে তো দিচ্ছ খুব। টাকা নিয়ে শেষ অবধি জুতসই উদ্বোধনী সঙ্গীত যদি সময়মতো দিতে না পারি? হাড়মাস এক করে দেবে না?

বলি, অ্যাদ্দিন ধরে অনেক অ্যাসোসিয়েশনকে তো দিলে। আবার কারা আসছে?

– অ্যাসোসিয়েশনের অভাব আছে নাকি দেশে? মস্তান, পালিশওয়ালা, মুটে, মজদুর, কাগজওয়ালা, মাইকওয়ালা, মায় হাসপাতালের রোগীরাও অবধি একটা করে অ্যাসোসিয়েশন করে ফেলেছে। অ্যাতো-অ্যাতো উদ্বোধনী-সঙ্গীত বাছা কী সোজা কথা নাকি?

—তা, আজ যে বাইরে বেরিয়েছ? খোঁজ পেয়ে যদি চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরে?

চপলকুমার মুচকি হেসে বলে, কিছু পুঁজি সঙ্গে নিয়ে তবেই না বেরিয়েছি।

হৈ-হৈ করে বলে উঠি, শোনাও শোনাও, শোনাও।

চপলকুমার বলে, তার আগে একটা কথা শুধোই তোমাদের। মস্তানরা সম্প্রতি একটা সমিতি বানিয়েছে, জান কি?

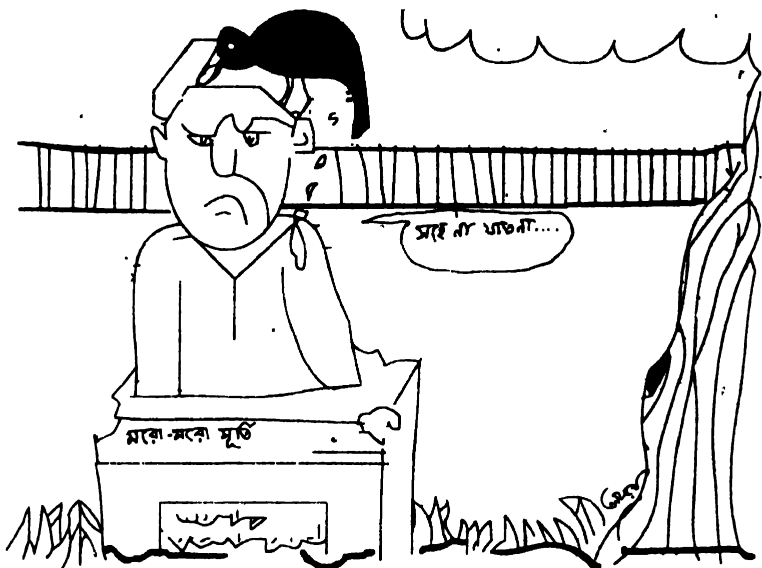
বলি, তাই নাকি! শুনিনি তো।

চপলকুমার বলে, তবে আর বলছি কী? সমিতির নাম দিয়েছে, 'সারাবাংলা বলজীবী সঙ্ঘ'।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, বলজীবী মানে?

চপলকুমার নির্বিকার গলায় জবাব দেয়, ওই বুদ্ধিজীবীদের আদলে নিজেদের নামটা রেখেছে আর কী। যাকগে, ওদের জন্যও আগাম উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে রেখেছি। কেন কি, অন্যদের বেলা হয়তো বা ভাববার সময় পাব। কিন্তু ওরা তো ঝড়ের মতো আসবে, আর একেবারে তোলাবাজের কায়দায় চোটপাট শুরু করবে। মস্তানদের সভায় গাওয়া যেতে পারে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে...।'

এ ছাড়া, পালিশওয়ালারাও তাদের সমিতির জম্পেস নাম রেখেছে। 'সারা বাংলা পাদুকাশ্রী সমিতি'। তাদের সমিতির জন্য রয়েছে, 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে/নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে...।' সারা বাংলা মুটে-মজদুর সঙ্ঘের অনুষ্ঠানের জন্য আগাম বেছে



রেখেছি, 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা...।' পাড়ায় পাড়ায় কাগজওয়ালারাও তো সমিতি বানিয়েছে। তাদের বার্ষিক সভার জন্য বেছে রেখেছি, 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে, কেউ তা জানে না...।' পাড়ায় পাড়ায় মাইকের জুলুমে অতিষ্ঠ মানুষজনও ইদানীং প্রতিরোধ সমিতি গড়ে তুলেছে। নাম দিয়েছে, 'অমায়িক সঙ্ঘ'। তাদের সভায় গাওয়া যেতে পারে, 'বেজে ওঠে পঞ্চম স্বর/কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর...।' আর, অলিতে গলিতে দু'দিন অন্তর 'সারারাত্রিব্যাপী বিনিদ্র বিচিত্রা' নামক প্রাণঘাতী জলসাগুলোর বিরুদ্ধেও ইদানীং প্রতিরোধ সমিতি গড়ে উঠেছে। তাদের বার্ষিক সভার জন্য বেছে রেখেছি, 'পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে/মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে...।'

অবাক হয়ে শুধোই, এটা রবিবাবুর গান?

চপলকুমার উরুতে চাপড় মেরে জবাব দেয়, আলবৎ। তিনি ছাড়া আর কে লিখবেন এমন জুতসই গান!

—তারপর গে ধর, হাসপাতালগুলোতে ইদানীং রোগীদেরও তো ইউনিয়ন হয়েছে। মাঝেমাঝেই আন্দোলন-অবরোধ করছে ওরাও। ওদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, 'আরও, আরও, প্রভু আরও আরও/এমনি করে আমায় মারো...।' গানটা খুবই জুতসই হবে। আর, শিশু হাসপাতালের রোগীরা, হোক না বাচ্চা, বড়দের দেখাদেখি যদি একটা ইউনিয়ন গড়ে বসে তো, তাদের সভায়, 'এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে/ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে/বল হরি হরিবোল...।' গানটা, যাকে বলে একেবারে সুপার্ব। পুরুত ঠাকুরদের সমিতি তাদের বার্ষিক সভায় কোন গান গাইতে পারে, তাও বেছে রেখেছি। শুনবে? শোন তবে। 'ঠাকুরমশায়, দেরি নয়, তোমার আশায় সবাই বসে,/শিকারেতে যেতে হবে মিহি কাপড় বাঁধ কষে...।'

এমন কি, আজকাল গুরুদেবদেরও ইউনিয়ন হয়েছে, জান তো? কোন দিন আচমকা এসে পড়বে, তাই তাদের জন্যও আগাম উদ্বোধনী সঙ্গীত বেছে রেখে দিয়েছি। গানটা হল, 'গুরুপদে মন কর অর্পণ, ঢাল ধন তাঁর ঝুলিতে/লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর, ভবের দোলায় দুলিতে...।'

দুটো পাগল সঙ্ঘের একটাকে দিলাম, 'যে তোরে পাগল বলে, তারে তুই বলিস নে কিছু...।' অন্যটাকে দিলাম, 'পাগল তুই, কণ্ঠভরে/জানিয়ে দে তাই সাহস করে,/দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া/থাকিস কোণে, দিস নে সাড়া/সবাই বলুক 'সৃষ্টিছাড়া'...।

—এমন কি, বললে বিশ্বাস করবে না, কাল রাতে আমার কাছে কারা এসেছিল জানো?

—কারা?

—কোলকাতার গলিতে গলিতে, পার্কে, রাস্তার মোড়ে যত মহাপুরুষের মূর্তি বসানো রয়েছে, তাদের এক প্রতিনিধি দল এসে হাজির।

—বল কি! একেবারে সশরীরে?

—আরে, না, না, স্বপ্নে। তাঁরা তো স্বপ্নেই দেখা দেন। মরবার পর কেউ সশরীরে আসতে পারে নাকি?

—তো, কী বললেন তেনারা?

খুব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ঝড় বৃষ্টিতে, শীতে-গ্রীষ্মে একঠাঁই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যে কী কষ্ট। মাথার ওপর কাগে হাগে। আশেপাশে পাবলিক পেচ্ছাব করে। একেবারে অসহ্য। আমরাও তাই একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়েছি। 'সারা বাংলা নিপীড়িত মরো-মরো মূর্তি সমিতি'। প্রথম সভা বসছে আসছে হপ্তায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত চাই।

চোখ ছানাবড়া করে শুধোই দিলে?

—দিলাম বৈকি। ঐ গানটা। সহে না যাতনা/দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে/নিশিদিন বসে থাকি শুধু পথ পানে চেয়ে'।

আমরা হাঁ...করে শুনছিলাম। তাই দেখে চপলকুমার চোখ নাচিয়ে বলে, একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছ তো? হুঁ-হুঁ বাবা, এর নাম গবেষণা।

নিজের উরুতে চাপড় মেরে বলে, দ্যাখ না, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমি কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিই।

বলতে বলতে চপলকুমারের চোখদুটোতে ঘনিয়ে আসে ঘোর। আবেগে থরোথরো হয়ে ওঠে কণ্ঠ। বলে, এইভাবে যদি চালিয়ে যেতে পারি, তবে আগামী দিনে ভাতের বদলে রবীন্দ্রসঙ্গীতই হবে আপামর মানুষের প্রধান খাদ্য। রবীন্দ্র সুধাই হবে প্রধান পানীয়। সমাজের সব স্তরের মানুষই কথায় কথায় কবিগুরুকে আঁকড়ে ধরবে, জাপটে ধরবে, একেবারে ফেভিকলের মতো লেপটে যাবে কবিগুরুর সঙ্গে। তখন শয়নে-স্বপনে-নিশিজাগরণে কেবলই রবীন্দ্রনাথ। সেদিনের অপেক্ষায় থাক সবাই। সেদিনের আর দেরি নেই। দিন আগত প্রায়।

সেই প্রথম আমাদের মনে সন্দেহটা দেখা দিল।

এ তো স্রেফ রসিকতা নয়। ছোকরার মাথাটা তবে কি সত্যিসত্যিই গ্যাছে! এবং আমরা সবাই একমত হলাম, এইবেলা একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া ভাল।

সে যুগের বাঙালির ইংরেজি বলা

ইংরেজরা তখন সবে আমাদের দেশে এসে রাজা হয়েছে। রাজ্যপাট সবে গোছাচ্ছে ওরা। তখন অবস্থাটা এমনই, এদেশের লোকেরা ওদের ভাষা বোঝে না, ওরাও বোঝে না আমাদের ভাষা। অথচ শাসক আর শাসিতের মধ্যে ভাবার যোগাযোগটি না গড়ে উঠলে সে তো এক মহা বিড়ম্বনা, দু'পক্ষেরই। অন্তত কাজ চালানোর মতো ভাষা তো দু'পক্ষের মধ্যে গড়ে ওঠা চাই-ই। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণটি একদিক থেকে ভারি মজার। সেদিন দু'পক্ষের মধ্যে পরস্পর ভাবপ্রকাশের মাধ্যমটি কেমন করে গড়ে উঠল, শেষ অবধি কী দাঁড়াল তা, সেই ইতিহাস কেউ তেমন করে লিখে রাখেনি। তবে পরবর্তীকালে কিছু খুচখাচ লেখাপত্তর এবং কিছু জনশ্রুতি থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র।

যতদূর জানা যায়, ইংরেজি ভাষাটা সর্বপ্রথম শিখেছিল মূলত ইংরেজদের সংস্পর্শে আসা কিছু উচ্চবর্ণের আলোকপ্রাপ্ত মানুষ। তারা মূলত সাহেবদের আদালতে এদেশীয় মানুষজনের হয়ে আর্জি পেশ করত। তারাই পরবর্তীকালে মোক্তার নামে অভিহিত হয়। সাহেবরা তাদের বলত 'মুকটিয়ারবাবু'। আর ছিল সাহেবদের কুঠিতে নিযুক্ত কেরানিবাবু আর সাহেবদের খাস



চাকরবাকরদের দল। তাদের থেকে সাহেবরাও শিখে নিয়েছিল কাজ চালানোর মতো দেশীয় ভাষা। এদেশীয় মুখে যবনের ভাষাটি কিংবা সাহেবদের মুখে এদেশীয় ভাষাটি কী ধরনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার নমুনাগুলি শুনলে আজ হাসিই পায়।

চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব গিয়েছেন হাটে। এক কাঁদি কলা পছন্দ করলেন।

চাকর বলল, এই কাঁদির একটা কলা পচতে শুরু করেছে সাহেব।

সাহেব কথাটাতে পাত্তা দিলেন না। এত বড় কাঁদির মধ্যে মাত্র একটা কলা পচেছে তো কী হয়েছে? এত বড় কলার কাঁদি, অথচ দামটা কত সস্তা! সাহেব কলার কাঁদিটা কিনে ফেললেন।

বাংলোর একটা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হল পুরো কাঁদিটা। সাহেব-মেমসাহেবরা ইচ্ছেমতো কলা ভেঙে ভেঙে খেতে লাগলেন।

কিন্তু দিন-দুয়েক বাদে সাহেব দেখলেন, কাঁদির সবগুলি কলাই পচে গিয়েছে। সাহেব তো রেগে কাঁই। ব্যাটা কলা-বিক্রেতা একটা বাজে কলার কাঁদি গছিয়ে দিয়েছে তাঁকে। সাহেব ওই কলা বিক্রেতাকে ধরে আনার হুকুম দিলেন।

যথাসময়ে কথাটা কুঠির এদেশীয় 'বাবু'টির কানে গেল। সে বুঝল, কলা-বিক্রেতার তেমন কোনো দোষ নেই। কাঁদির মধ্যে একটা পচে-যাওয়া কলা থাকাতেই এই বিপত্তি।

সে ব্যাপারটা সাহেবকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করল। বলল, সাহেব, ক্লা (কলা ইংরেজি উচ্চারণে) সেলার'স নো ফল্ট। ইফ এ ক্লা পচেস ইন দ্য ক্যান্ডি (কাঁদি), দেন অল ক্লাজ উইল পচেন ইন দ্য ক্যান্ডি। অর্থাৎ কি না, যদি কাঁদির একটা কলা পচে যায় তো অচিরেই কাঁদির সবগুলি কলা পচে যাবেই।

ওইসব দিনের কোর্ট-কাছারিতে তৎকালীন মোক্তারবাবুরা যে ভাষায় সাহেব বিচারকদের সামনে সওয়াল করতেন কিংবা আর্জি পেশ করতেন, তারও কিছু কিছু নমুনা খুঁজেপেতে পেশ করা যেতে পারে।

একজন মোক্তারবাবু সাহেব-হাকিমকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, দু-জন মুটিয়া (মুটে) শ্রেণীর লোক কাস্তের বাঁট দিয়ে পরস্পরকে পিটিয়েছে। কথাটা বোঝাতে মোক্তারবাবুটি বললেন, টু মুটিয়াজ ওয়্যার পিটাপিটি বাই দ্য বান্ডেল অফ কাস্তের বাঁট।

সাহেব শুধোলেন হোয়াট ইজ কাস্টে?

মোক্তারবাবু অনেক কষ্টে বোঝালেন, ইজ এ হাফ-রাউন্ড সোর্ড, ওয়ান সাইড খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা।

এব্যাপারে আরও একটি মামলার কথা মনে পড়ছে। একজন লোক তার প্রতিবেশির ছিটেবেড়ার ঘরটিকে ভেঙে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি সাহেবের কুঠিতে মামলা করেছে। লোকটির হয়ে তার মোক্তারবাবুটি আদালতকে ব্যাপারটা কোনো গতিকে বোঝাতে পেরেছে। কেবল সাহেব-হাকিম ছিটেবেড়া বস্তুটি কী, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

তিনি শুধোলেন, হোয়াট ইজ ছি-টে-বে-রা?

তার জবাবে মোক্তারবাবুটি বললেন, ছিটেবেড়া ইজ, ব্যামবু'জ এন্ড কঞ্চি'জ আর আড়াআড়ি এন্ড খাড়াখাড়া। দেন লেফিফাইড বাই কাদা।

আমাদের সবজান্তা বন্ধু চপলকুমার দিল আরও একটি অজানা তথ্য। যদিও ইদানীং

তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আমাদের মনে যারপরনাই সংশয় দেখা দিয়েছে, তবুও তার দেওয়া তথ্যটা আমবা মন দিয়ে শুনলাম।

চপলকুমার বলল, এই যে মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি গোছের পদবিগুলি, ওগুলির উৎপত্তি কী করে হল, জানো?

বলি, জানি জানি। সে যুগে ব্রাহ্মণদের যে অংশটি মূলত টোলে ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা অর্জন করতেন, তাদের বলা হত উপাধ্যায়। তো, মুখ্যপ্রদেশের উপাধ্যায়দের বলা হত মুখোপাধ্যায়। বন্দ্যঘটি এলাকার উপাধ্যায়দের বলা হল বন্দ্যোপাধ্যায়। আর, চট্টলপ্রদেশের উপাধ্যায়দের বলা হত চট্টোপাধ্যায়। ওগুলিই সাহেবদের মুখে পড়ে হল মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি।

চপলকুমার সারা মুখে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বলল, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! আরে বাবা, কৃষ্ণ থেকে কানাই, চন্দ্র থেকে চাঁদ, কিংবা হস্ত থেকে হাত হতে পারে। বিবর্তনের একটা নিয়ম মেনে ওরা বদলেছে। কিনা, কৃষ্ণ—কানহো—কানু—কানাই। চন্দ্র-চন্দ-চাঁদ। হস্ত-হত্ত-হাত। কিন্তু মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় বিবর্তনের কোন রুট ধরে মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি হয়, বল দেখি? আসলে, সাহেবদের কুঠিতে এদেশীয়দের আর্জি পেশ করার পথ ধরেই ওই পদবিগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

—কী রকম, কী রকম? আমরা নড়েচড়ে বসি।

চপলকুমার বলে, জানোই তো, তখনকার দিনে সাহেবদের কুঠিতে নিয়মিত বিচার বসত। কুঠিয়ালরাই হতেন বিচারক। তাদের সামনে এদেশীয়রা নানান অভিযোগ নিয়ে হাজির হত। কিন্তু এদেশীয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সাহেবদের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলাটা তো সোজা ব্যাপার ছিল না সেকালে। ভাষাই হত প্রধান অন্তরায়। কাজেই, তখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কিছু আলোকপ্রাপ্ত মানুষ, যারা ইতিমধ্যে সাহেবদের সঙ্গে গা ঘসাঘসি করে ওদের ভাষাটা সামান্য রপ্ত করেছে, তারাই মুশকিল আসানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। দেশীয় মানুষদের হয়ে সাহেবদের কাছে তারাই আর্জি পেশ করত। তোমরা একটু আগে যে মোক্তারবাবুর কথা বললে, এরা ছিল তাদেরই প্রাথমিক সংস্করণ। এরা কিন্তু তখনও অবধি ইংরেজিটা লিখতে পড়তে শেখেনি। কেবল শুনে শুনে ইংরেজিটা একটু আধটু রপ্ত করেছিল। কাজেই তারা কেবল মুখেই আর্জি পেশ করত। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, মুখে আর্জি পেশ করত বলেই ওদের বলা হল মুখার্জি (মুখ+আর্জি)। এদের মধ্যে কিছু ছিল মূলত চট্টগ্রাম এলাকার মানুষ, তারা মুখে আর্জি পেশ করতে গিয়ে এমন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলত যে, সাহেবদের মনে হত, ওরা চ্যাটার করছে অর্থাৎ কিচিরমিচির করছে। চ্যাটার করতে করতে আর্জি পেশ করত বলে সাহেবরা এদের বলত চ্যাটার্জি (চ্যাটার+আর্জি)। আর, কেউ কেউ আর্জি পেশ করার বেলায় এতটাই চিৎকার চেঁচামেচি করত যে, সাহেবরা আর পরবর্তীকালে ওদের আর্জি পেশ করতেই দিত না। যাদের আর্জি সাহেবরা একেবারেই ব্যান (নিষেধ) করে দিয়েছিল, তাদেরই বলা হত, ব্যানার্জি (ব্যান+আর্জি)।

চপলকুমারের উর্বর মস্তিষ্কজাত তত্ত্বটি বাদ দিলেও দিনের পর দিন রাজকার্য চালাতে গিয়ে সেইকালের সাহেব ও 'বাবু'রা যে এমনিতরো কত কত মজার গল্পের জন্ম দিয়েছিল, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই।

দেয়ার ইজ আ ব্যান্ড অফ ক্রো

কথা হচ্ছিল সে যুগের বাঙালিদের ইংরেজি বলা নিয়ে।

এসব হল সেই সময়কার কথা, যখন এদেশীয়রা সাহেবদের 'মহাশক্তি কালী' বোঝাতে বলত, 'অল পাওয়ারফুল ব্ল্যাকি গডেস।' সুন্দরবনকে সাহেবরা সুন্ড্রীবন (সুন্দরীবন) বলত, অর্থাৎ কি না, 'ফরেস্ট অফ বিউটিফুল উইমেন'। আর, হাড়গিলে পাখি বোঝাতে বলা হত, 'বোন-সোয়ালোড বার্ড'।

এক সাহেব তাঁর খোট্টা দারোয়ানটিকে নিয়ে ভারি সমস্যায় পড়েছেন। সে সাহেবের একটি কথাও বুঝতে পারে না। সাহেব দরজা বন্ধ করতে বললে খুলে রাখে, খুলে রাখতে বললে, বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে সাহেব রোজদিনই চেঁচামেচি করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না।

একদিন সাহেব তাঁর কুঠির 'বাবু'টিকে ডেকে সমস্যার কথাটা বোঝালেন। অবশেষে সাহেব বললেন, দারোয়ানটি যদি কেবল দরজা খোলা আর বন্ধ করার নির্দেশ-দুটি ঠিকঠাক পালন করে, তো তাই দিয়ে কোনোগতিকে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

একটু ভেবে নিয়ে বাবুটি সাহেবকে বলল, সাহেব, যখন দরজা খোলার দরকার হবে, আপনি বলবেন, 'দেয়ার ইজ আ ক্রো'। আর, যখন দরজা বন্ধ করবার দরকার হবে, আপনি বলবেন, 'দেয়ার ইজ আ ব্যান্ড অফ ক্রো।' কিংবা 'দেয়ার ইজ এ কুল ডে'।

শুনে সাহেব তো রেগে ফায়ার। বললেন, আমার সঙ্গে মশকরা হচ্ছে? দরজা খোলা,



বন্ধ করার সঙ্গে কারের কিংবা শীতল দিনের কী সম্পর্ক হে?

বাবুটি মুচকি হেসে বললেন, অধমের পরামর্শটা একটিবার মেনে চলুন না, সাহেব।

আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে সাহেব তাঁর বাবুটির বাতলানো পরামর্শটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে দেখলেন। প্রথমে, দরজা খোলার হুকুম দিতে গিয়ে তিনি বললেন, দেয়ার ইজ আ ক্রো। সাহেবি উচ্চারণে তা, দাঁড়াল, দে'র ইজ অ্যা খ্রো...। দারোয়ানটি বুঝলে, দরোয়াজা খোলো। অমনি সে চটপট দরজা খুলে দিল। এবার সাহেব বললেন, দেয়ার ইজ আ ব্যান্ড অফ ক্রো। সাহেবি উচ্চারণে সেটা শোনাল, দে'র ইজ অ্যা বন্ড ও-ক্রো। দারোয়ানটি বুঝল, দরোয়াজা বন্ধ করো। সে তৎক্ষণাৎ দরজাটি বন্ধ করে দিল। সাহেব তখন দ্বিতীয় টোটকাটি প্রয়োগ করার জন্য বললেন, দেয়ার ইজ আ কুল ডে। সাহেবি উচ্চারণে কথাটা দাঁড়াল, দে'র ইজ অ্যা খুল ডে। দরোয়ান বুঝল, দরোয়াজা খুল্ দে। তৎক্ষণাৎ সে দরজা খুলে দিল।

পরপর দু'তিনবার পরখ করে সাহেব দেখলেন, দারোয়ান তাঁর নির্দেশ ঠিক ঠিক পালন করছে। চমৎকৃত সাহেব তখন বাবুটিকে মোটা টাকা বকশিস দিলেন।

সাহেবের খাস পিয়ন যদু সাতদিন ধরে কামাই দিয়েছে। সাহেব তো রেগে আগুন। পারলে পিয়নটিকে ফাঁসিতে লটকান। বিপদটা আঁচ করে যদুর ছোটভাই মধু এসেছে সাহেবকে দাদার অনুপস্থিতির কারণটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে। সাহেবের সামনে এসে আভূমি সেলাম জানিয়ে সে প্রথমেই নিজের পরিচয় দেয় এইভাবে :

'যদু'জ স্মল ব্রাদার মধু আই/ভেরি উনডেড বিগার ভাই।' অর্থাৎ আমি যদুর ছোট ভাই মধু। বড় ভাই খুবই আহত। এরপর সে সাহেবকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, যদু বেচারা এক ক্ষ্যাপা হনুমানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে খুবই আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এমন একটি জটিল ঘটনা বোঝাতে গিয়ে মধু বলল, 'যদু ওয়াক ফ্রি (খোলামনে হাঁটছিল)/মাংকি স্যাট অন্য দ্য ট্রি। মাংকি কেম ডাউন অ্যান্ড ঝাম্প (যদুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল),/যদু অল্‌সো জাম্প (হনুমানের ওপর লাফ দিয়ে পড়ল)। মাংকি বাইট, যদু ফাইট। মাংকি বাইট, বাইট, বাইট। যদু ফাইট, ফাইট, ফাইট। যদু ওন (জিতল),/মাংকি গন (মায়ের ভোগে চলে গেল)। মাংকি ডেড,/যদু উনডেড। মাংকি কমিট সীন (পাপ),/যদু ইটিং মেডিসিন।'

ইংরেজ সাহেব তাঁর কেরানিবাবুটির প্রতি কোনো কারণে রুষ্ট হয়েছেন। কেরানিটি সাহেবকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলল, মাস্টার ক্যান লিভ, মাস্টার ক্যান ডাই (মনিব ইচ্ছে করলে বাঁচাতে পারে, ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পারে।)

সাহেব ক্ষেপে গিয়ে বললেন, কি? আমি মরে যেতে পারি?

ভুলটা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দেওয়ার বাসনায় কেরানিটি বলে উঠল, থুড়ি থুড়ি, নট মাস্টার ডাই (মনিব মরবে না), মাস্টার ক্যান ডাই মি (মনিব আমাকে মেরে ফেলতে পারেন)। ইফ মাস্টার ডাই, আই ডাই, মাই কাউ ডাই, মাই ব্ল্যাক-স্টোন ডাই, মাই ফোর্টিন'-জেনারেশন ডাই (সাহেব মরলে আমিও মরে যাব, আমার গরুগুলিও মরে যাবে, আমার বাড়ির শালগ্রাম শিলাটিও মরে যাবে, আমার চোদ্দপুরুষ মরে যাবে)।

এক সাহেবের বাঙালি কেরানিটি রথের দিনে কামাই করল। সাহেব তো রেগে আগুন।

পরের দিনই কৈফিয়ত তলব করল।

কেরানি পুঙ্গব বুঝে উঠতে পারে না, রথের ব্যাপারটা সে কীভাবে সাহেবকে বোঝাবে? অনেক ভাবনা চিন্তার পর তার মনে হল, রথটাকে দেখতে খানিকটা খ্রিস্টানদের চার্চের মতো। তবে চার্চ ইট দিয়ে তৈরি হয়, আর রথ কাঠ দিয়ে।

সে বলে উঠল, গান (গিয়েছিলাম) টু সি দ্য উডেন চার্চ, স্যার। তারপর ব্যাপারটা সে সাহেবকে জলবৎ তরলং করে বোঝাতে লাগল। উডেন চার্চ, থ্রি- স্টোরিজ হাই (তিনতলার সমান উঁচু)। গড অলমাইটি সিট আপন (জগন্নাথ ঠাকুর তার ওপর বসে রয়েছেন), লং লং রোপ (লম্বা লম্বা রশি), থাউজেন্ড মেন ক্যাচ (হাজার মানুষ সেই রশি ধরেছে), পুল, পুল, পুল (টানছে, টানছে, টানছে) রান-অ্যাওয়ে, রান-অ্যাওয়ে (রথটা ছুটছে তা ছুটছেই), টেল 'হরিবোল, হরিবোল' (সবাই হরিবোল ধ্বনি দিচ্ছে)।

এ ব্যাপারে ইংরেজ যুগের একেবারে শেষের দিকের একটি গল্প বলে এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই।

এক সাহেব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বদলি হয়েছে। তাঁর জায়গায় অন্য এক সাহেব এসেছেন। তখনও অবধি দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর হয়নি। বিদায়ী সাহেব চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। নবাগত সাহেব পাশটিতে বসে অপেক্ষা করছেন। বিদায়ী সাহেব শেষ মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো দ্রুতগতিতে সই করে চলেছেন। নবাগত সাহেব কেবল সময় কাটানোর জন্য অলস ভঙ্গিতে ডাঁই করা ফাইলগুলোর থেকে এক আধটা টেনে নিয়ে উল্টে-পাল্টে চোখ বুলোচ্ছেন।

একটা ফাইল খুলে তিনি দেখলেন, ফাইলের মধ্যে একটা চিঠির খসড়া পেশ করা হয়েছে। চিঠিটা জেলাশাসকের সইয়ে অন্য কোনো অফিসে যাবে। কিন্তু চিঠির খসড়াটা পড়ে তিনি তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলেন না। যদিও তাঁর মনে হচ্ছিল, চিঠিটা ইংরেজি ভাষায় লেখা, কিন্তু খোদ ইংরেজ হয়েও তিনি তার মর্মার্থ বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না। ফাইলটি বন্ধ করে তিনি যথাস্থানে রেখে দিলেন।

একটু বাদেই বিদায়ী সাহেব ওই ফাইলটি সই করার জন্য টেনে নিলেন, এবং চিঠিটার উপর একপ্রস্থ হালকা চোখ বুলিয়ে, তলায় খসখস করে সই করে দিলেন।

নবাগত সাহেব তো তাই দেখে অবাক। বললেন, তুমি চিঠিটাতে সই করে দিলে?

মুখ তুলে তাকালেন বিদায়ী সাহেব। বললেন, কেন, সই না করার মতো কিছু রয়েছে কি? এনিথিং রং?

নবাগত সাহেব বললেন, চিঠিটা কোন ভাষায় লেখা?

বিদায়ী সাহেব বললেন, কেন, ইংরেজিতেই তো লেখা হয়েছে।

নবাগত সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ইংরেজিতে? কিন্তু চিঠিটা পড়ে তো আমি কিচ্ছু বুঝলাম না।

এতক্ষণে বুঝি বিদায়ী সাহেবের ব্যাপারটা বোধগম্য হল। তিনি হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, সেজন্য ভাবনা নেই ব্রাদার, চিঠিটা এই অফিসের কোনো হরিবাবু লিখেছেন, ওই অফিসের কোনো হরিবাবু পড়বেন। এই অফিসের হরিবাবুর বক্তব্য ওই অফিসের হরিবাবু ঠিকই বুঝে নেবেন। আমরা আর ব্যাপারটার মধ্যে খামোখা নাক গলাই কেন?

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ

অনেকদিন বাদে আমাদের বন্ধু চপলকুমারকে দেখে মনে হল, বেশ কিছুদিন মনোচিকিৎসকের দাওয়াই খেয়ে বোধ করি সেরে উঠেছে।

পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওকে শুধোই, কী হে, তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে গবেষণাটা কদ্দুর এগোল?

শুনে চপলকুমারের মুখে কান-এঁটো করা হাসি।

বলে, এখন আর কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতেই ব্যাপারটা থেমে নেই হে। চারপাশে হু-হু করে রবীন্দ্রচেতনাও বাড়ছে। এখন সবাইয়ের মুখে কথায় কথায় শুনতে পাবে কবিগুরুর গান, কবিতা..., এক কথায়, রবীন্দ্রবাণী। এমন একটা দিন আসছে, যেদিন আপামর বাঙালি রবীন্দ্রসুধা দিয়ে ভাত মেখে খাবে, রবীন্দ্রধারা দিয়ে কুলকুচো করবে মুখ ধোওয়ার বেলায়। রবীন্দ্রবাণী দিয়ে মুখশুদ্ধি। কবিগুরুর গান আর কবিতাই হবে তাদের ভাব প্রকাশের একমাত্র



মাধ্যম। সারাক্ষণ, ওই যাকে বলে, 'গানের ভেলায় বেলা-অবেলায়' ভাসতেই থাকবে।

—কী রকম? আমরা চোখজোড়াকে ছানাবড়া বানিয়ে শুধোই।

—ধরো, এমন দিন আসছে, লোডশেডিংয়ে কাহিল গেরস্তটি বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে গাইবে, 'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও...।' শিক্ষিত বেকার যুবকটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে বুক চাপড়ে গাইবে, 'ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ/তিনটে চারটে পাশ করেছি নিতান্ত নই মুক্‌খ...।' চাকরি না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠা ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে মা গাইবে, 'ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি/শেষে তোর কী যে হবে দশা...।'

দুনিয়ার সব গৃহিণীই চায়, তার স্বামীদেবতাটি সারা জীবন মুখে কুলুপ এঁটে থাকুক। সেই কথাটা স্বামীকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বাসরঘরেই নববধূ গাইতে পারে, 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম...।'

রাজনৈতিক নেতারা তো ভোটারদের কতই না মিথ্যে আশ্বাস দেয়। সেসব কথা বাস্তবে একেবারেই মেলে না। তেমন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ভোটার নেতাটির উদ্দেশ্যে গাইতে পারে, 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি,/তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি...।' নেতাটিও তাই শুনে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে গাইতে পারে, 'অনেক কথা বলেছিলাম কবে তোমার কানে কানে/কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে/সে কি তোমার মনে আছে?'

আজকের দিনে ভোটাররাও চালাক হয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে গিয়েছে তাদের। বুঝতে পেরেছে, ডান-বাম, সবুজ-গেরুয়া-লাল, সব দলই সমান। বিষ্ঠার এপিঠ-ওপিঠ। তারা তাই সব দলকেই চাঁদা দেয়, সব দলের মিটিংয়ে-মিছিলেই হাজির থাকে। সব দলের সঙ্গেই মাখামাখি করে। এ নিয়ে তাদের কোনো প্রশ্ন করলে তারা কবিগুরুর ভাষাতেই জবাব দিতে পারে, 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে. .।'

ভোটের কথাই যদি উঠল, তবে ভোটের সঙ্গে জড়িত আর এক জাতের মানুষের কথাই বা বাদ পড়ে কেন? তারা হলেন ভোটের সময় নির্বাচন-কমিশন নিযুক্ত অবজারভার। ভোটের সময় তাঁদের ভূমিকাটি ঠিক কী হবে, তাই নিয়ে নির্বাচন-কমিশন গবেষণা করেই চলেছেন। প্রায় ফি-ভোটেই অবজারভারদের ভূমিকা বদলে বদলে যায়। অ্যাদ্দিনে সম্ভবত সার কথাটি বুঝে গিয়েছেন তাঁরাও। কাজেই, অবজারভাররাও গলা ছেড়ে গাইতে পারেন, 'মনেতে সাধ, যেদিকে চাই, কেমনে চেয়ে রব,/দেখিবো শুধু, দেখিবো শুধু, কথাটি নাহি কবো।'

তারপর গিয়ে ধরো, বেহেড মাতালের মদের গ্লাসটি হাত ফস্কে মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে মদের দোকানির সামনে অঞ্জলি পেতে মাতালটি গেয়ে উঠতে পারে, 'পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে.../অঞ্জলি মোর প্রসাদ দিয়ে দাও না পূরে...।'

কিছুই মনে রাখতে পারে না, এমন ছাত্রের কান পাকড়ে রাগী মাস্টার যদি শুধোন, সবকিছু এমনি করে ভুলে যাস কেমন করে, অ্যাঁ? তো, তার জবাবে ছাত্রটি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে গেয়ে উঠতে পারে, 'কেন যে মন ভোলে, আমার মন জানে না.../কেন যে...।'

দরজার বাইরে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা খদ্দেরটিকে দেখে বারবিলাসিনী গেয়ে উঠতে পারে, 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়,/ও তোর পার হতে সংশয় ..।'

বাংলা বন্ধ-এ গৃহিণীকে এক কাপ চা চাইলেও তিনি মুখ বেঁকিয়ে গেয়ে উঠবেন, 'আজকে মোরে বলো না কাজ করতে...।'

বেস্পতিবার কোনো বার-রেস্তোরাঁয় মদ না পেয়ে হতাশ মদ্যপটি গেয়ে উঠতে পারে, 'ফেরালে মোরে বা-রে বা-রে...।' রেইডে ধরা পড়া পার্টি আশ্রিত মস্তান-তোলাবাজটি হাজতের ভিতর থেকে থানার বড়বাবুর উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়বে, 'হা-রে রে-রে-রে-রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে,/যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে...।' তার জবাবে বড়বাবুও হয়তো-বা গেয়ে উঠবে, 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না...।' তখন হয়তো বা বাধ্য হয়ে উকিল ধরবে হাজতের আসামিটি। জামিন পাওয়ার জন্য উকিলকে গান গেয়ে অনুরোধ জানাবে, 'আমি কারে ডাকি গো, আমার বাঁধন দাও গো টুটে,/আমি হাত বাড়ায়ে আছি, আমায় লও কেড়ে লও লুটে...।' নিরক্ষর মেয়ে টেঁপি পাড়ার ছেলে ট্যাঁপার থেকে প্রেমপত্র পেয়েছে। টেঁপি তো পড়তেই পাবে না। সে তখন তার স্কুল পড়ুয়া বান্ধবীদের হাতে প্রেমপত্রটি তুলে দিয়ে বলতে পারে, 'দে পড়ে দে আমায় তোরা, কী কথা আজ লিখেছে সে/দে...।' শিক্ষিকারা যাতে খুব সাজুগুজু করে স্কুলে না আসে সেজন্য রক্ষণশীল বড়দিমণি তাদের গান গেয়ে বোঝাতে পারেন, কিনা, 'অলকে কুসুম না দিও,/শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো/কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।' ভেবে দ্যাখো, বিদেশিনী অপবাদে বিপর্যস্ত সোনিয়া গান্ধী কলকাতায় এসেছেন, তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে সোনিয়া ফ্যান-ক্লাবের সদস্যরা এয়ারপোর্টে গাইছে, 'তুমি আমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা/তবে তোমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা. .।' এমনকী, সুদীপ-নীতীশ-সুব্রত-অরুণাভদের দলত্যাগের পর ক্ষুব্ধ মমতাদেবী অজিত-সাধন-পঙ্কজদের উদ্দেশে গাইতে পারেন, 'যেতে দাও গেল যারা, তুমি যেও না যেও না...।' কিংবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,/তবে একলা চলো রে...।' মনমোহন সিং মমতাকে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালে তার জবাবে মমতা গাইতে পারেন, 'তোমার পথের থেকে অনেক দূরে/গেছে বেঁকে, গেছে বেঁকে, আমার এ পথ...।/আমার ফুলে আর কি কবে/তোমার মালা গাঁথা হবে...?' বারবার চেষ্টা করেও মমতাকে কংগ্রেসে আনতে না পেরে বিরক্ত সোনিয়া গেয়ে উঠতে পারেন, '(ওকে) ধরিলে তো ধরা দেবে না.../(ওকে) দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে...।'

বলতে বলতে চপলকুমার খুব গদগদ মুখে তাকায় আমাদের দিকে। বলে, ভাবো একটিবার, এইভাবে সবাই যদি দিনে দিনে ষোলোআনা রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠে, যদি আপামর জনগণের মুখে কথায় কথায় রবীন্দ্রবাণীর ফোয়ারা ছোটে চতুর্দিকে, স্বর্গলোক থেকে রবিবাবু সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কী খুশিই না হবেন!

আমরা তখন কেবলই ভাবছিলাম, চপলকুমারকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করাচ্ছেন, তার নেওয়া তাবৎ ফি ফেরত চাইব কি না।

চোর-পুলিশের রবীন্দ্রচর্চা

দিনকতক আগে একটি বাংলা দৈনিকে একটা খবর বেরিয়েছিল।

'ডাকাতদের গ্রামে রবীন্দ্রজয়ন্তী'। তার তলায় খবরটা ছিল এইরকম, সারা গ্রামের সবাই ডাকাত, কিন্তু তারাও ধুমধাম করে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেছে। খবরের সঙ্গে মঞ্চসহ জমায়েতের একটা ছবিও ছেপেছিল।

বেলা দশটা নাগাদ ওই কাগজের একটা কপি নাচাতে নাচাতে চপলকুমার এসে হাজির। বলে, কেমন? কী বলেছিলুম তোমাদের? দ্যাখ, কেমন হাতে হাতে ফল ফলতে শুরু করেছে।

আমরা খবরটা পড়ি। চপলকুমার চোখ নাচিয়ে বলে, রবীন্দ্রনাথকে কদ্দুর অবধি পৌঁছে দিয়েছি, দ্যাখ তবে। এরপর এই ধরনের ডাকাতদের মধ্যে আরও রবীন্দ্রচেতনা বাড়বে। তখন তারা হয়তো বা সিধে ভাষায় কথা না বলে সারাক্ষণ রাবীন্দ্রিক ভাষায় বলবে। তেমন দিন এল বলে। আমরা উৎসাহ দেখানোর ভাব করে বলি, কেমন হবে ব্যাপারটা?

—কেমন হবে? চপলকুমার খুবই উৎসাহিত বোধ করে। বলে, শোন তবে। ধর, রাতের



বেলায় গেরস্তের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। ডাকাত-গেরস্ত-পুলিশে কথা চালাচালি হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে। ডাকাতরা দরজার বাইরে গাইছে, 'ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্...খোল্ দ্বার খোল্...।' তাই শুনে ভীত-ত্রস্ত গেরস্ত গেয়ে উঠল, 'কে এলো আজি এ ঘোর নিশীথে,/সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।' ডাকাতের সর্দার একটুখানি শ্লেষ মাখানো গলায় গাইল, 'ভাল মানুষ নই রে মোরা, ভাল মানুষ নই/গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই...' বলেই ডাকাতরা দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা মারতে লাগল। গেরস্ত তখন দ্বিগুণ ভয় পেয়ে গাইল, 'কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে/এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে, খুঁজিতে আসিলে কাহারে...।' তাই দেখে ডাকাতদের সর্দার অসহিষ্ণু গলায় গেয়ে উঠল, 'খোল খোল দ্বার, রাখিও না আর, বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।' কিন্তু গেরস্ত কি আর ডাকাতকে সহজে দরজা খুলে দেয়? বাধ্য হয়ে ডাকাতের সর্দার গাইল, 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, gun দিয়ে দ্বার খোলাব।'

ডাকাতেরা যখন দরজা ভাঙতে শুরু করেছে, গেরস্ত থানায় ফোন করল। ওপ্রান্তে ফোন ধরে ছোটবাবু ঘুম-জড়ানো গলায় গাইলেন, 'কেন তোমরা আমায় ডাকো, আমার মন না মানে...।' গেরস্ত তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে ডাকাতদের খবরটা দিল। তাই শুনে ছোটবাবু আবার গাইলেন, 'যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে/সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?' গেরস্ত যখন খুবই কান্নাকাটি করতে লাগল, ছোটবাবু গেলেন বড়বাবুর কোয়ার্টারে। বড়বাবু সব শুনে গাইলেন, 'তুমি যেও না এখনি/এখনো আছে রজনী/পথ বিজন, তিমিরসঘন/আনন কণ্টকতরুগহন...আঁধারে ধরণী...।' ছোটবাবু তখন আবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওদিকে শেষ অবধি সদর-দরজা ভেঙে ফেলল ডাকাতের দল। তারপর গেরস্তের উদ্দেশে গাইল, 'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে,/ভয় পেও না সুখে থাকো,/বেশিক্ষণ থাকবো নাকো,/এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে।' গেরস্ত তখনও অবধি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাকাতদের ঘরে ঢুকতে দিতে নারাজ সে। বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে ডাকাত-সর্দারের হুঙ্কার, 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে,/পথ জুড়ে কী করবি বড়াই, সরতে হবে।' গেরস্ত তখন প্রাণের দায়ে ডাকাতদের তোয়াজ করতে গান ধরল, 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,/তোমারই হোক জয়...।' বাড়ির গিন্নি কাঁদতে কাঁদতে গাইলেন, 'তোমায় যে সব দিতে হবে, তা তো আমি জানি...।' গেরস্তের স্তুতিতে খানিক নরম হল ডাকাতরা। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। গেরস্ত কাঁদো কাঁদো গলায় গেয়ে ওঠে, 'এবার উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল...।'

ডাকাতরা গেরস্তের সর্বস্ব লুটপাট করে চলে যাওয়া মাত্র গেরস্ত থানায় আবার ফোন করল, 'এসো, এসো, আমার ঘরে এসো, আমা-র ঘরে...।' তার জবাবে ছোটবাবু ঘুম-জড়ানো গলায় গাইলেন, 'না, না গো না, করো না ভাবনা/নিশি না পোহালে যাবো না, যাবো না...।/না, না গো না...।' থানা থেকে কেউ আসবে না বুঝতে পেরে গেরস্ত এবার পাড়াপড়শিকে খবর দেওয়ার জন্য দরজা খুলতে গিয়ে দেখতে পেল, ডাকাতরা সদর-দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছে। কাজেই, গেরস্ত তখন ঘরের ভিতর থেকে চিল-চিৎকার জুড়ল রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' সেই চিৎকারে পড়শিরা এসে সদর-দরজা খুলে দিল বাইরে থেকে।



পরের দিন অনেক বেলায় বড়বাবু উদয় হলেন গেরস্তের উঠোনে। উঠোনে পা দিয়েই তিনি গান ধরলেন, 'ও-গো, পুরবাসী/(আমি) দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।' গেরস্ত বড়বাবুকে দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে গাইল, 'জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে,/জানি জানি...।' বড়বাবু মৃদু হেসে বললেন, 'রাগ কোরো না, কাল রাতে ফোন পেয়েও আসতে পারিনি।' বলেই অপ্রস্তুত গলায় গাইলেন, 'কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন...।' সারা রাত পুলিশের আসার অপেক্ষায় ক্ষণ গুণতে থাকা গেরস্ত তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,/দেখা নাহি পাই।' বড়বাবু হেসে বলেন, শুধু শুধু কেন অপেক্ষা করছিলে? ফোনেই তো বলে দিয়েছিল ছোটবাবু, নিশি না পোহালে, যাবো না, যাবো না।' শুনে কেবল গেরস্তই নয়, পাড়ার তাবৎ মানুষও তো রেগে কাঁই। বলে, 'ছি ছি, নিজেদের জনগণের সেবক বলেন আপনারা? এই বুঝি সেবার নমুনা?' বড়বাবু মুচকি হেসে গাইলেন, 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি।' গান থামিয়ে বড়বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জান, আমাদের কি কেবল চোর ধরে বেড়ালে চলে? দিনভর কত কাজ আমাদের! মিটিং-মিছিল সামলানো, নেতাদের সিকিউরিটি, ওদের জন্য ভোট আদায়, নিজেদের জন্য হপ্তা আদায়...। কাজেই, বুঝতেই তো পারছ, 'কোন খেলা যে খেলবো কখন, ভাবি বসে সেই কথাটাই...।' তাছাড়া ধরো গিয়ে, দেশে তো আর একটিমাত্র পার্টি নয়। হাজারে হাজারে পার্টি। বাম, ডান, মাঝামাঝি, উগ্রপন্থী, নরমপন্থী...। কাজেই, 'কার হাতে যে ধরা দেব হায়,/(তাই) ভাবতে আমার বেলা যায়,/ডানদিকেতে

তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি কাঁদে যে মন,/বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন, দখিন ডাকে, আয় রে আয়।' আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ তো? সর্বস্বান্ত গেরস্তটিকে তাও কেঁদে বুক ভাষাতে দেখে বড়বাবু তাকে সান্ত্বনা দিতে গাইলেন, 'ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি/এবার কঠিন হয়ে থাক না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি...।' তারপর সাহস জোগাতে গাইলেন, 'মুক্ত করো ভয়/আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে কর জয়...'। কী বুঝলে? এ দুনিয়ায় নিজের যেটুকু শক্তি তাই নিয়েই চলতে হবে। বিপদের সময় পাড়াপড়শি, পুলিশ কেউই আসবে না। কাজেই, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

ঠিক সেই সময় একজন সিপাইয়ের গলায় ঝোলানো বন্দুকটি কে যেন ভিড়ের মধ্যে টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল। সিপাইটি কঁকিয়ে গেয়ে উঠল, 'আমার কণ্ঠ হতে gun কে নিল/নিলো ছিনায়ে...।'

বেশ বলে যাচ্ছিল চপলকুমার। আচমকা ভোম্বল বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'ছিনায়ে' নয়, 'ভুলায়ে' হবে।

সেকথায় চপলকুমার কথা থামিয়ে আচমকা ক্ষেপে উঠল। বলল, তোমরা অত শুচিবাঈ কেন বল দেখি? চোর-ডাকাত-পুলিশ কথায় কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে, এটাই কি শতাব্দীর সেরা পিলে চমকানো ঘটনা নয়? তার উপর ওই সিপাইটা আবার হিন্দুস্থানি। তাও সে যে ওইটুকু গাইতে পেরেছে, এই কি যথেষ্ট নয়? এই যে কথায় কথায় বিশ্বভারতীর মতো ভুল ধরছ, মাতব্বরি করছ, কবিগুরুকে আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের কাজ একটুখানি করে দেখাও না। কার কত মুরোদ রয়েছে, দেখি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল চপলকুমার। আমাদের শত ডাকেও আর ফিরে তাকাল না।

আমি বউকে ভয় পাইনে

বিগত কোনো এক রচনায় বুঝি কোনো এক প্রসঙ্গে কামানের স্ত্রীলিঙ্গ 'কামিনী' লিখেছিলুম। তাই নিয়ে আমার মতো মশার প্রতি যে পরিমাণ কামান দাগা হয়েছে, তা আর কহতব্য নয়। মাসটাক তো গৃহিণীর ভয়ে একেবারে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আমার দুর্গতি দেখতে দেখতে চপলকুমার তো হেসেই খুন। বলে, বউকে আবার অ্যাতো ভয় পাবার কী আছে? অবলা নারী বৈ তো নয়।

চপলকুমার বলে কী। নারী নাকি অবলা! সেই ক-ত বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র নারী সম্পর্কে এমন রটনা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে গান লিখে গিয়েছেন, কি না, অবলা কেন মা তোরে বলে, বহু বল ধারিণীং নমামি তারিণীং...ইত্যাদি ইত্যাদি।

চপলকুমার এমন কথা বলতেই পারে, কারণ সে বিয়ে করেনি, বউয়ের মর্ম বোঝে



না। কাজেই, বউয়ের হাতে মার খেয়ে, মরোমরো হয়ে, অবশেষে তাকে মর্মর-মূর্তি হতে হবে না কোনদিনও।

বলি, শোন ভাই চপল, দিল্লিকা লাড্ডুটি না খেলে তো তার সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। আগে সেই লাড্ডুটি খাও, তখন বুঝবে।

চপলকুমার খুব আগ্রাসী ভঙ্গিতে বলে, কী বুঝব? বোঝার আছেই বা কী?

বলি, বিয়ে করলে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবে যে, পৃথিবীতে দুই ধরনের পুরুষ রয়েছে। বিবাহিত ও মৃত। আমার কথা নয় এটা। স্বয়ং শিব্রাম চক্রবর্তীর মুখনিঃসৃত। তিনিও অবশ্য, তোমার মতোই, বিয়ে-থা করেননি। তাও বুঝে ফেলেছিলেন তেমনটা।

পৃথিবীর প্রায় সব বিবাহিত পুরুষই জানে, বউ বাস্তবিক এক ভীতিকর প্রাণী। বাচ্চাদের যেমন বইকে ভয়, বড়দের তেমনি বউকে ভয়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই কোটি কোটি বিবাহিত পুরুষ নিজ নিজ বউকে যমের মতো ভয় করে এসেছে। তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে দশরথ আর তস্য পুত্র রামচন্দ্রের কথা। একজন তো নিজের প্রাণের অধিক প্রিয় ছেলেকেই বনবাসে পাঠিয়ে দিল। সত্যরক্ষা-টক্ষা ওসব বাজে কথা। স্রেফ বউয়ের ভয়েই ছেলেকে বনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল বুড়ো। সেই শোকে হার্টফেল করে মারাই গেল। আর একজন, ভালমতোই জানত যে সোনার হরিণ হয় না। ডাল-মে কুছ কালা হ্যায়। তাও স্রেফ বউয়ের মুখঝামটা খেয়ে ধনুকবাণ নিয়ে দৌড়ল।

বউকে ভয় পাওয়া নিয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে নাকি অন্তত একটি করে গল্প চালু রয়েছে। এ ব্যাপারে চিনা ও ভারতীয় গল্পগুলি বহুল প্রচারিত। ভারতীয় গল্পটি তো সবাই জানেন। সেই যে এক তরুণ রাজা বিয়ের পর বউয়ের দাপটে দিনদিন সিঁটিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে বাপের আমলের প্রবীণ মন্ত্রী তো ভাবনায় পড়েন, কি না, কোনো কঠিন ব্যায়রামে ধরল কি না রাজাকে। একটুখানি জেরা করেই তিনি অবশ্য নিশ্চিত হলেন যে রোগব্যাধি নয়, আসলে বউয়ের ভয়েই সিঁটিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছেন রাজামশাই। মন্ত্রী তাঁকে ভরসা দেন, কি না, বউকে দুনিয়ার সব্বাই ভয় করে। ওই নিয়ে অত সিঁটিয়ে থাকার দরকার নেই। সংসার-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ চলতেই থাকবে, তারই মধ্যে চানটানও সেরে নিতে হবে।

মন্ত্রীর কথা রাজার পছন্দ হল না। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব্বাই বউকে ভয় করে, এটা হতেই পারে না। মন্ত্রী বললেন, পরীক্ষা হয়ে যাক। রাজ্যময় ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল, অমুক দিনে রাজ্যের সমস্ত বিবাহিত প্রজাকে রাজপ্রাসাদের সামনের মাঠে উপস্থিত হতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে রাজপ্রাসাদের সামনের মাঠে গিজগিজ করছে মানুষ। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা বউকে ভয় পাও, তারা নদীর দিকে চলে যাও। আর, যারা ভয় পাও না, তারা পাহাড়ের দিকে চলে যাও।

মুহূর্তের মধ্যে মাঠে ফাঁকা। সব প্রজাই দৌড়ে গিয়ে নদীর পাড়ে দিয়ে দাঁড়াল। পাহাড়ের দিকে একজনও গেল না। কেবল একটিমাত্র মানুষ পাহাড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল, কেন কি, সারা রাজ্যে অন্তত একজন লোক তো পাওয়া গিয়েছে যে কিনা বউকে ভয় পায় না।



লোকটিকে দেখতে দেখতে মন্ত্রীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। লোকটিকে ডেকে বললেন, কী হে বাপু, তুমি যে বড় পাহাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে? বউকে ভয় পাও না তুমি?

তার জবাবে লোকটি বলল, আজ্ঞে, হুজুর, মুক্যুসুখ্যু মানুষ, অত কথার জবাব দিতে পারবোনি। তবে ঘর থেকে বেরোবার সময় বউ বলে দিইছে, যেদিকে ভিড়, খবরদার সেদিকে যেওনি। শুনে মন্ত্রী একগাল হেসে বলেন, দেখুন রাজামশাই, এই লোকটি রাজার আদেশের চেয়ে স্ত্রীর আদেশ বেশি মানে।

ওই নিয়ে চিনা গল্পটি হল—চিনের রাজধানী পিকিংয়ে (সাবেক নাম) দেশের তাবৎ পোড় খাওয়া বিবাহিত মানুষ একটা সভা ডাকল। আলোচনার বিষয়, স্বামীদের উপর বউদের নির্মম নির্যাতন। অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন এমন একজন

নব্বুই উত্তীর্ণ মানুষ সভার সভাপতিত্ব করছেন। অন্যরাও তিরিশ-চল্লিশ বছরেরও বেশি বিবাহিত জীবনযাপন করেছেন।

তো, সভাপতি মঞ্চের ওপর গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন। অত্যাচারিত স্বামীরা একের পর এক মঞ্চে এসে তাঁদের নির্যাতনের ঘটনাগুলি বলে চলেছেন। সারা সভা জুড়ে যারপরনাই শোকের আবহ।

ঠিক তেমনি সময়ে হলের কেয়ারটেকার ছুটতে ছুটতে এসে জানায়, বাবুরা জলদি পালান। আপনাদের সভার খবর গিন্নিমায়েরা কেমন করে যেন জেনে ফেলেছেন। তাঁরা সব লাঠিসোটা, বঁটি-ঝাঁটা বাগিয়ে এদিকেই আসছেন।

শোনামাত্তর হলের তাবৎ মানুষ, চেয়ার উলটিয়ে, দরজা-জানালা দিয়ে, এ-ওকে মাড়িয়ে ছুটতে লাগল যে-যার বাড়ির দিকে। মুহূর্তে সারা হল ফাঁকা। কেবল সভাপতি ভদ্রলোক অটল গাম্ভীর্য সহকারে বসে রইলেন মঞ্চের উপর।

কেয়ারটেকার তাঁর কাছে গিয়ে বলল, বাবু, আপনার স্ত্রীই কিন্তু সবার সামনে রয়েছেন। বাঁচতে চান তো এইবেলা পালান।

ভদ্রলোক তাও গ্যাঁট মেরে বসে রইলেন চেয়ারে।

কেয়াবটোর ওঁর কাছটিতে গিয়ে বলল, বাবু সাহসটা পরে দেখালেও চলবে। আগে তো পিতৃদত্ত প্রাণটা বাঁচান। তাও ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখে অবশেষে কেয়ারটেকার তাঁকে ঠেলা মেরে বলল, কথাটা কানে ঢুকছে না আপনার?

ঠেলা খাওয়া মাত্র ভদ্রলোক ঠক করে ঢলে পড়লেন একদিকে। এবং কেয়ারটেকার দেখল, ভদ্রলোকের দেহে প্রাণ নেই। খবরটা পেয়েই তিনি হার্টফেল করেছেন।

এই নিয়ে তৃতীয় গল্পটি এই রকম। অফিসের টিফিন টাইমে জনাকয় বিবাহিত মানুষ আলোচনা করছে, তাদের গৃহিণীরা কতখানি ভীতিকর। প্রত্যেকেই যে-যার বউয়ের খাণ্ডারপনার কথা বলতে বলতে ভয়ে শিউরে উঠছে।

শুনতে শুনতে সেই জমায়েতে উপস্থিত একজন আর সামলাতে পারল না নিজেকে। আচমকা বলে উঠল, বউকে এত ভয় পাবার কী আছে, বুঝি নে।

শুনে অন্যরা তো অবাক। বলে, সে কি! এমনভাবে বলছ, যেন বউকে একটুও ভয় পাও না। বউ রুদ্রমূর্তি ধরলে কোথায় গিয়ে লুকোও যাদু?

সাহসী লোকটি বুক চিতিয়ে বলে, কী আর বলব তোমাদের। শোনো তবে, ঝগড়ার সময় প্রত্যেকবারই আমি বউকে নিল-ডাউন করিয়ে ছাড়ি।

তাই শুনে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সবাই। বলে, বাজে বকো না। এসব গুল অন্য জায়গায় মেরো।

সাহসী লোকটি বুকে চাপ্পড় মেরে বলে, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হলেই বউয়ের নিল-ডাউনেই তা শেষ হয় প্রত্যেকবার।

শুনে অন্যদের হাসি আরও বেড়ে যায়। বলে, শোনো ব্রাদার, আড়ালে অমন বুকনি সবাই দিতে পারে। বউয়ের সামনে গেলে তখন...।

অন্যজন বলে ওঠে, বউ কাছাকাছি নেই তো, থাকলে আর দেখতে হত না।

আচমকা সাহসী লোকটি গলায় ঝুলতে থাকা মা-কালীর কবচটিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে

বলে ওঠে, তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না তো? এই দ্যাখ, মা-কালীর কবচ ছুঁয়ে বলছি, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হলেই প্রত্যেকবার বউ শেষ অবধি নিল-ডাউন করবেই। ও নিল-ডাউন না হলে ঝগড়া থামবেই না।

বিস্মিত সহকর্মীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সাহসী পুরুষটির দিকে। বলে, বলো কি! একেবারে নিল-ডাউন! তা, নিল-ডাউন হয়ে কী বলে তোমার বউ? কী বলে ক্ষমা চায়?

—কী আবার বলবে! মেঝের উপর নিল-ডাউন হয়ে, খাটের তলায় চোখ চারাতে চারাতে বউ বলে, খাটের তলায় বাক্স-প্যাঁটরার মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকোলি? জলদি বেরিয়ে আয় মিনসে, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

বউকে ভয় পাওয়া নিয়ে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম গল্পটি বলে এই কিস্তি শেষ করব।

একজন স্বাধীনচেতা সাহসী স্বামী তার বাড়ির সামনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, আ অ্যাম দি সুপ্রিম বস অফ মাই ফ্যামিলি। অ্যান্ড আই হ্যাভ টেকেন পারমিশন ফ্রম মাই ওয়াইফ টু সে সো। অর্থাৎ কিনা, আমিই এই বাড়ির সর্বময় কর্তা, এবং এ কথা বলার জন্য আমি বউয়ের থেকে আগাম অনুমতি নিয়েছি।

ভোট বিচিত্রা

পুরসভার ভোট গেল, বিধানসভার ভোট আসছে। ভোট আসে, ভোট যায়। আমাদের দেশে সেই স্বাধীনতার পর থেকে এটাই নিয়ম। লোকসভার ভোট, বিধানসভার ভোট, পুরসভার ভোট, পঞ্চায়েতের ভোট, উপনির্বাচন। গণতন্ত্রে বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই রয়েছে। আর ভোট মানেই তো সারা দেশ জুড়ে আজব সব কাণ্ড। ভোট এল মানেই নেতাদের গলা মিহি হল, ক্যাডারদের ল্যাজ মোটা হল, মিটিং-মিছিলে ছোটা হল, বেওসায়ীদের লোটা হল। ভোট এল তো পিছু পিছু রাম এল, রাবণ এল, বোফর্স এল, মানুদা এল, সোনিয়ার স্বদেশ-বিদেশ নিয়ে কেচ্ছা এল। নতুন নতুন আইন এল, পাঁশকুড়া লাইন এল। নেতাদের কিঞ্চিৎ দর্শন হল, প্রতিশ্রুতির বর্ষণ হল, চপলা সর্দারের ধর্ষণ হল। ভোটের জমিটি চষা হল, অঙ্ক-টঙ্ক কষা হল, টিকিট না পেয়ে গোঁসা হল, কাঁচা ক্যাডাররা ডাঁসা



হল। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ল, রাস্তার খানাখন্দে মাটি পড়ল, চাঁদার নামে পাবলিকের মাথায় চাঁটি পড়ল। বেয়াড়া নেতা বাধ্য হল, কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হল, কাগজগুলির খাদ্য হল। ভোট মানেই জোট, জোটের নামে ঘোঁট। ভোট মানেই ধাপ্পা, বুথে গিয়ে ছাপ্পা...। দেখতে দেখতে কোন এক ছড়াকার ছড়া বেঁধেছেন এইরকম : আসছে আবার ভোট/বাধবে জবর ঘোঁট/সাপ-বেজিতে জোট/শিবঠাকুরের চেলারা সব গা ঝাড়া দে' ওঠ্/সত্যি কথা বলবে যে, তার জ্বালিয়ে দিবি ঠোঁট।

এ রাজ্যের ভোটেও সব রয়েছে আগের মতোই। হয়তো বা এসব বেড়েছেও, কিন্তু ইদানীং যেটা আর তেমন দেখা যায় না, তা হল, ভোটের ছড়া। সেই সাতষট্টি থেকে দেখে আসছি, এ রাজ্যে ভোটের আগে দেওয়ালে দেওয়ালে কত কিসিমের মন মাতানো ছড়া, স্লোগান। সেই ভোট-সাহিত্যের ঐতিহ্যটা প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

প্রথমে স্লোগানের কথায় আসি। আমার বন্ধু চপলকুমারের মতে, স্লোগান হল, স্লো (ধীর গতিসম্পন্ন) গান (বন্দুক)। একটু দেরিতে গুলি ছোটে বটে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা প্রায় অব্যর্থ। একেবারে মগজে সেঁধিয়ে যায়।

তো, ওই সময়ের দুটি স্লোগান আজও মনে আছে। দুটি স্লোগানেরই স্রষ্টা সম্ভবত আর -এস-পি। গরিব মানুষদের নিয়ে ওই দলের লম্বা মিছিলে প্রায় সারাটা পথ একটা স্লোগানই ঘন ঘন উঠত।

নেতা—'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না'

জনতা—'তা হবে না, তা হবে না'।

মিছিলটি থানা কিংবা সরকারি ভবনের কাছাকাছি এলে পুলিশ কর্ডনের সম্মুখীন হতে হত। সেটা ষাট-সত্তরের দশক। পুলিশের কনস্টেবলরা মাইনে পেত সাকুল্যে একশো-বারো টাকা। কাজেই, পুলিশ কর্ডনের কাছাকাছি এলেই স্লোগানটা দ্রুত বদলে নিতেন নেতারা। তখন স্লোগান হল : পুলিশ তুমি যতই মারো/মাইনে তোমার একশো বারো। স্লোগানের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশকে একটু বিগড়ে দেওয়ার প্রয়াস।

মনে আছে, সাতষট্টির ভোটের কথা। তার আগে বাষট্টিতে চিন-ভারতের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পঁয়ষট্টিতে ভারত-পাকিস্তান লড়াই। ফলে, সাতষট্টির ভোটে সি পি এম-কে নিয়ে কংগ্রেস দেয়াল ভরে দিয়েছিল একটি ছড়ায় : চিনের প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি, পাকিস্তানের তারা/এখনও কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা? সহমত হই চাই না হই, ছড়াটি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছিল।

বাহাত্তরের ভোটে পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বামনেতা জ্যোতি বসুকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছিল কংগ্রেস : দুই বাংলার দুই পশু/ইয়াহিয়া-জ্যোতি বসু। বলাই বাহুল্য, রুচির বিচারে ছড়াটি উতরোয়নি।

তারপর এল বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের সেই অন্ধকার দিনগুলি। তখন নাকি নকশালদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিদ্বেষ তৈরি করার জন্য যুব কংগ্রেসের একটা অংশ নকশালী কর্মকাণ্ড ঘটাত। তারা আকাম করত, দোষ হত নকশালদের। তাদের সাধারণ মানুষ কংশাল বলে ডাকতেন। বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর নাকি এরা ক্রিয়াশীল ছিল। তারই ফলস্বরূপ সাতাত্তরের ভোটে উঠে এল বামেদের তৈরি একটি দেয়াল ছড়া : সত্য



সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ/রাতের বেলায় নকশাল, দিনেতে কংগ্রেস। ছড়াটা বেশ মুখে মুখে ঘুরেছিল তখন।

সে সময়টায় সিপিআই গাঁট বেঁধেছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে। চিরকালই সিপিআইকে তার শত্রুপক্ষ 'কৌশল পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বলত। ইন্দিরার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর তাদের 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্দিরা' বলে ডাকতে শুরু করল। তখন ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতীক ছিল গাই-বাছুর। ইন্দিরা-কংগ্রেসের প্রতীক আর সিপিআইয়ের ইন্দিরা-ভজনাকে পাঞ্চ করে পরের ভোটেই সিপিআইকে নিয়ে ছড়া বাঁধল বামেরা : দিল্লি থেকে এল গাই,/সঙ্গে বাছুর সিপিআই।

তিরাশিরপঞ্চায়েত ভোট। তখন দ্বিতীয়বার ফিরে এসে দিল্লির তখতে ইন্দিরা হাজার পাওয়ার হয়ে জ্বলছেন। ততদিনে এশিয়ার মুক্তিসূর্য হয়ে গিয়েছেন তিনি। তিরাশির পঞ্চায়েত ভোটে এ রাজ্যে কংগ্রেস বুঝি ইন্দিরা-নৌকায় চড়ে পঞ্চায়েত দখল করার স্বপ্ন দেখে থাকবে। সম্ভবত সেই কারণেই ওই ভোটে রাজ্যের বহু দেওয়ালেই দেখা গিয়েছিল একটি ছড়া : পঞ্চায়েতের পুঁটে/তাড়াতাড়ি নে লুটে/সময় তো আর পাবিনে কো, ইন্দিরা ওই আসছে ছুটে।

বোফর্স কেলেঙ্কারিতে রাজীব গান্ধীকে জড়ানো হল ১৯৮৯ নাগাদ। তারপর থেকে প্রতিটি ভোটেই বামেরা নিয়ম করে তুলেছে বোফর্স প্রসঙ্গ। বিশেষ করে ১৯৯০ এর ভোটে ওই নিয়ে একাধিক দেয়াল-ছড়াও দেখেছিলাম। যেমন, অলিগলিমে শোর হ্যায়/রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়। কিংবা, 'ভারতের মালিকানা ইতালির ট্রাংকে/কামান কেনার কমিশন ইতালির ব্যাঙ্কে'। কিংবা 'ভারত আর ইতালি/হয়ে গেল মিতালি/কামান বেচে পয়সা খেলি দলকেও জিতালি'। কিংবা 'রাজীব গান্ধী বিয়ে করে, আনল সোনিয়াজিকে/বোফর্স কামান গর্জায় না পাকিস্তানের দিকে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সেই সময়ে হরিদ্বার শহরে দেওয়ালে দেওয়ালে রাজীব গান্ধীর জবানীতে একটা ছড়া দেখেছিলাম : দেশকে জনতা সারে,

বাতায়েঁ হামে চোর/চল, চলা যাউ ইতালি ঔর। বলাই বাহুল্য, রুচির বিচারে ওই ছড়াগুলিও একেবারেই উতরোয়নি। অবশ্য তার আগে কংগ্রেসও জ্যোতি বসুকে নিয়ে অনুরূপ কুৎসামাখানো ছড়া লিখেছে, কি না, 'টাটা-বিড়লার কোলে/জ্যোতি বসু দোলে'।

ভোটের সময় এমন অসংখ্য ছড়া তখন শোভা পেত এ রাজ্যে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় তেমন দুটি দেওয়াল-ছড়ার কথা বলে আজকের কিস্তি শেষ করব।

বিরাশির বিধানসভা ভোটে ইন্দাস থেকে সিপিএমের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বদন বোড়া। কংগ্রেস তাঁকে নিয়ে দেওয়াল-ছড়া লিখেছিল : কালকেউটে চন্দ্রবোড়া থাকে গাছে গাছে/বোড়ার রাজা বদন বোড়া ইন্দাসেতে নাচে।

ওই বছরই বিষ্ণুপুর থেকে সিপিএমের অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের গৌর লোহার। তখন রামবিলাস চক্রবর্তী মশাই ছিলেন বিষ্ণুপুরের কংগ্রেস নেতা। তাঁর বাড়িতেই ভোটের সদর দফতর খোলা হয়েছিল। তো, গৌর লোহার মশাই তাঁর প্রার্থীপত্রে পদবিটা আগে লিখেছিলেন। সেইমতো ব্যালট পেপারে তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল, লোহার গৌর। ব্যস, সিপিএম একটিমাত্র ছড়ায় বিষ্ণুপুরের দেয়াল ভরিয়ে দিয়েছিল সে ভোটে : মাটির গৌর যেথা সেথা, সোনার গৌর নদীয়ায়,/লোহার গৌর দেখবি যদি, রামবিলাসের কুঞ্জে আয়।

হাসি, গলার ফাঁসি

সেদিন এক পরিচিত ভদ্রলোক ফোনে বললেন, আপনার রম্যরচনাগুলি মন্দ হচ্ছে না। দু-হপ্তান্তে একটু একটু হাসা-টাসা যাচ্ছে। তবে, এর আগের কিস্তির লেখাটা ঠিক জমেনি। পড়ে তেমন হাসতে পারলুম না। কেন, বলুন তো?

সত্যি কথা বলতে কী, ভদ্রলোকের শেষের প্রশ্নটা শুনে খুব বিপন্ন বোধ করি। কারণ, এটা আমার কাছে বাস্তবিক এক যুগপৎ কঠিন ও জটিল প্রশ্ন। আমার ওই লেখাটা পড়ে ভদ্রলোকের হাসি পায়নি, এই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু কেন হাসি পেল না, এর জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। বাস্তবিক, কী কারণে যে এই দুনিয়ায় একই ঘটনায় কারও বেদম হাসি পায়, কারও একটুও পায় না, খোদায় মালুম।

অনেকের ধারণা, হাসতে পারাটা বুঝি বড়ই সোজা ব্যাপার। স্রেফ দন্তরাজি কৌমুদিকে বিকশিত করে গলা দিয়ে হা-হা, হো-হো, খিলখিল কিংবা খিকখিক জাতীয় আওয়াজ বের করলেই হল। ব্যাপারটা মোটেই অত সোজা নয়। শরীরতত্ত্বের নিরীখে, হাসতে পারাটা



বেজায় কঠিন এক প্রক্রিয়া। শুনেছি, এক চিলতে মুচকি হাসি হাসতে গেলেও নাকি শরীরের ৩০৫টি পেশিকে খাটাখাটি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার ছাত্রজীবনের দু'জন শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। রসবাবু আর ব্যোমকেশবাবু। সবাই তাঁদের যথাক্রমে রসরাজবাবু আর ব্যোমবাবু বলে ডাকতেন। দু'জনে একই হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে থাকতেন। ব্যোমবাবু তাঁর পিলে-চমকানো নামটি নিয়ে কথায় কথায় বোমার মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। আর, রসরাজবাবু তাঁর মাখোমাখো নামটি বইতে বইতে সারাক্ষণ এতটাই গলদঘর্ম হয়ে থাকতেন যে, কোনও কিছুতেই তিলমাত্র হাসতে পারতেন না। বাস্তবিক, হাসি ছিল তাঁর দু' ঠোঁটের বিষ। বিষের মতোই পরিত্যাজ্য ছিল তা। তো, ওই হাসি নিয়ে দু'জনের মধ্যে রোজই রগড় লেগে থাকত। সক্কালবেলায় ব্যোমবাবু বসে বসে দোল খেতে খেতে সুকুমার রায়ের ছড়া আওড়াচ্ছেন, আর রসরাজবাবু তাঁর খসখসে কর্কশ শরীরকে তেল ডলে ডলে তেলতেলে করছেন। ব্যোমবাবু আওড়াতে লাগলেন, ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম্, শুনে লাগে খটকা/ফুল ফোটে! তাই বল! আমি ভাবি পটকা। বলেই হা...হা...হা...শব্দে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। তাই শুনে রসরাজবাবু পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের ভিতরে সরষের তেল সেঁধাতে সেঁধাতে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বলে উঠলেন, আ মলো, অত হাসির কী হল? ব্যোমবাবু আর একবার ছড়ার পংক্তি দুটো পড়ে শোনানোর পরেও রসরাজবাবুর মুখে সেই একই বিস্ময়, কিনা, অত হাসির কী হল? ততক্ষণে হা...হা...হাঃ...শব্দে গলা ফাটিয়ে হেসেই চলেছেন ব্যোমবাবু। তাই দেখে ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একসা করতেন রসরাজবাবু। একসময় হিংস্র হয়ে উঠতেন। তর্কবিতর্ক চরমে উঠত। ব্যোমবাবু প্রমাণ করতে চাইতেন যে, এটা একটা অতিশয় হাস্যরসাত্মক ছড়া, আর রসরাজবাবু কিছুতেই তা মানতেন না। প্রায় রোজদিন তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক, চেঁচামেচি, এবং তা থেকে অবশেষে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম।

ব্যোমবাবু তবু যাইহোক হাসির কথায় হাসতেন, কিন্তু আমার মাখন নামে আর একটি ছেলের কথা মনে পড়ছে, যার হাসার জন্য কোনো কারণেরই দরকার হত না। যেকোনো কথায়, 'শুধু অকারণ পুলকে', সে হেসে কুটিপাটি হতে পারত। ছেলেটির কথায় একটু পূর্ববঙ্গীয় টান ছিল। একদিন আমাকে সে শুনিয়েছিল তার এক হাস্যমুখর অভিজ্ঞতার কথা। বলে, জানো মিশ্রকাকু, আমার বাবা না, অ্যাত্তো হাসাইতে পারে, হাসতে হাসতে পেটের নাঁড়িভুড়ি ছিঁড়িয়া যায়-গা। এই তো গতকালের কথা। বাবার সঙ্গে বেরাইতে বারাইসি। হঠাৎ বাবা রাস্তার ধারে আঙুল দেখাইয়া কইলেন, হাই দ্যাখ্ খোকা, এরে কয় টিউবওয়েল। শুইন্যা তো আমি হাইস্যা কুটিপাটি। দু'পা না যাইতেই বাবা ফের কইল, হাই দ্যাখ্ খোকা, এরে কয় ল্যাম্পপোস্ট। শুইন্যা তো আমি হাইস্যা কুটিপাটি। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে সে যা শোনাল, তার মর্মার্থ হল, গতকাল সারাটা পথ বাবার মুখে ল্যাম্প-পোস্ট, টিউবওয়েল, মাইলস্টোন, গরুর গাড়ি, বাঁশের ঝাড় জাতীয় অতি সাধারণ কথাগুলি শুনে হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

অবশ্য এই জাতের ছেলেদের বিপদও কম নয়। খুব গম্ভীর পরিবেশে, শোকসভায় কিংবা শ্রাদ্ধবাসরে হাসি চাপতে না পেরে এরা পড়ে যায় জেনুইন বিপদে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রতনের কথা। আমাদের ক্লাসেই পড়ত সে। যাকে বলে দ্যাখনহাসি ছেলে,

সে ছিল তাই। তার মুখখানাই ছিল এমন, মনে হত যেন মিটিমিটি হাসছে। ফলে, প্রায় প্রতিটি ক্লাসেই টিচারদের মনে হত, ছেলেটি ওঁদের দিকে তাকিয়ে কী এক রহস্যময় কারণে কিংবা অকারণে নিঃশব্দে হাসছে। কপাল ভাল থাকলে, কেবল 'অ্যাই, হাসছিস কেন তখন থেকে? পড়াতে মন নেই?' গোছের ধমক খেয়ে রেহাই পেত। কিন্তু কপাল খারাপ থাকলে, কিংবা বদরাগী টিচারের পাল্লায় পড়লে প্রচুর পরিমাণে মার খেত। প্রায় প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি ক্লাসেই ঘটত তেমন ঘটনা।

মাখন, রতন, এরা সব কে কোথায় আছে, কে জানে। ইদানীং খুব অভাব বোধ করি ওদের। কেন কি, অকারণে কিংবা তুচ্ছ কারণে হাসার মতো লোক প্রায় লোপ পেতে বসেছে ইদানীং। ল্যাম্পপোস্ট বা টিউবওয়েল দেখে বুকের খাঁচা ফাটিয়ে হাসতে পারে, কিংবা সুখে-দুঃখে সারাক্ষণ মুখে হাসি মেখে রয়েছে, সেই প্রজাতিটা তো ইদানীং নিতান্তই বিরল। এখনকার মানুষজন তো হাসির পর্যাপ্ত কারণ ঘটলেও হাসতে চায় না। বিশেষ করে আমার বিত্তশালী বন্ধুদের তো কদাচিৎ হাসতে দেখি আমি। আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ধনদৌলত, সম্পদ, বৈভব মানুষের মুখের থেকে হাসি নামক দুর্লভ বস্তুটিকে নিঃশেষে শুষে নেয়। অধিক টাকা তাদের টাকে অধিকতর রেখার জন্ম দেয়। অবশ্য বিত্তশালীদের মধ্যে হাসাহাসির রেওয়াজটা কোনো কালেই তেমন ছিল না। তাঁরা তো সারাক্ষণ নিজেদের বিত্ত সামলাতেই জেরবার। দুনিয়ার যাবতীয় দুর্ভাবনা বুঝি গ্রাস করে ফেলে ওদের। সেই কারণেই সর্বদা পেঁচার মতো হয়ে থাকে মুখ। আগেকার দিনে তো রাজারাজড়াদের সভায় তাই একজন করে হাসানোর লোক থাকত। তাদের বলত বয়স্য। রাজা-রাজড়ারা নিজেরা তো কস্মিনকালেও হাসতে পারতেন না। দুনিয়ার যত ভারি ভারি বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে গলদঘর্ম হওয়ার পর ওঁদের হাসিয়ে-টাসিয়ে কমিক-রিলিফ দেওয়ার দায়িত্ব থাকত ওই বয়স্যদের উপর। এই মুহূর্তে তাঁদের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় আর আকবরের সভায় বীরবলের নাম মনে পড়ছে।

গরিবগুরবোদের অবশ্য সেই ঝকমারি ছিল না। তারা হাড়ভাঙা খাটনির মধ্যেই যখন-তখন হেসে উঠতে পারে অনায়াসে। যত খাটে, তত হাসে। এমনকী, নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এই কিছুদিন আগে অবধি প্রাণখোলা হাসির রেওয়াজ ছিল। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আড্ডা তো এক একটি হাসির খনি ছিল। এই কিছুদিন আগে অবধি ট্রেনে-বাসে, রাস্তায় ঘাটে, অফিস-কাছারিতে, চায়ের দোকানে, কথায় কথায় জমে যেত মজলিস। তাতে কত মজার কথা, চুটকি, জোক...। রঙ্গরসে মজে থাকত রকের আড্ডা-গুলতানির আসরগুলিও। বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছে, ছুটির দিনে পিকনিক পার্টি, হাসি-ঠাট্টায় সারাটা পথ একেবারে নরক গুলজার। আর এখন? বরানুগমন না শবানুগমন, বনভোজন না শ্রাদ্ধভোজন বোঝা মুশকিল। আর, আজকের দিনে বাচ্চাগুলোও তো তৈরি হচ্ছে একেবারে জন্ম-জেঠামশাই হয়ে। কাঁধে বইয়ের পাহাড়, সামনে সারি সারি প্রতিদ্বন্দ্বী, পিছনে জন্মদাত্রীর অবিরাম অঙ্কুশ, বেচারারা হাসতেই ভুলে গেছে। অবাক হয়ে যেতে হয়, আজকের ছেলেরা শিব্রাম, ঘনাদা, টেনিদা, এসব প্রায় পড়েই না।

তো, সব মিলিয়ে চারদিকে হাসির এমনই খরা, যারা একটু হাসতে-টাসতে ভালবাসে, তাদের চলছে ঘোর দুর্দিন। একটা দারুণ হাসির কথা বললুম, অপর পক্ষ ফ্যালফ্যাল চোখে

তাকিয়ে শুনল, তারপর, 'ঠিকই তো' বলে নিজের কাজে মন দিল। কিংবা চুটকিটি জমজমাট ক্লাইমেক্স-এ গিয়ে শেষ হওয়ার পর অপার কৌতূহল সহকারে শুধোল, তারপর কী হল? তখন মনে হয়, নিজের নাকে ঘুষি মারি, নয়তো ওর নাকে।

বাস্তবিক চারপাশে হাসির দুঃসহ আকাল পড়েছে ইদানীং। শোনার ও বলার দুয়েরই। এমন দিন হয়তো বা আসছে, যেদিন আপনাকে বাঁশবেড়িয়া কিংবা ডায়মন্ডহারবার যেতে হবে হাসির কথা বলতে কিংবা শুনতে। কেন কি, আপনি খবর পেয়েছেন, ওখানে একজন রয়েছেন, যিনি হাসির গল্প বলতে পারেন, কিংবা অন্য কেউ বললে তা বুঝতে পারেন। আপনি বাড়ি থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন, বাঁশবেড়িয়া কিংবা ডায়মন্ডহারবার গিয়ে হাসির গল্পটি বলে কিংবা শুনে বিকেল-বিকেল ফিরে এলেন।

তেমন দিন সম্ভবত আসছে।

জেনানা মহল

উপকরণ এমন কিছু নয়। প্রক্রিয়াটাও জলের মতো।

টক দই পোয়াটাক। একটা দেশি মুরগির ডিম। টেবিল চামচের দু'চামচ দুধের সর। ছোলার ডাল কিংবা বেসন সমপরিমাণ। একটা আস্ত পাতিলেবু। একটা মাঝারি সাইজের শশা। পাকা মর্তমান কলা দুটো। আদা এক ইঞ্চি। পাঁচটা লবঙ্গ। কুড়ি গ্রাম কাজুবাদাম। এক কাপ গোলাপ জল। এক টুকরো বরফ, এবং মাখন পঁচিশ গ্রাম।

প্রথমে মুরগির ডিমের সাদা অংশটা টক দইয়ের সঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। কুসুমটা আলাদা রাখ। দুধের সর, ডালের বাটা ও পাকা কলা ভাল করে চটকে রাখ। আদা আর কাজুবাদাম বেটে আলাদা করে রাখ। লবঙ্গ বেটে গোলাপ জলে গুলে রাখ। পাতিলেবু ও শশা কেটে আলাদা পাত্রে সাজিয়ে রাখ।

—এবার উনুনে কড়াই চাপাও। এই তো? পর্দার আড়াল থেকে কথাগুলি বলতে বলতে আমি ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ি। নিভা বউদি আর আমার বউ ওখানেই বসে রয়েছে।



দু'জনেই চমকে তাকায়। পরমুহূর্তে অপরিসীম দক্ষতায় নিজেকে সামলে নেন নিভা বউদি। বলেন, কড়াই নয়, ডেকচিই ভালো। তবে একটা নয়, দুটো লাগবে মশাই। একটা ছোট, একটা বড়।

—তা না হয় হল। আমি চোখে মুখে দুনিয়ার বিরক্তি ফুটিয়ে বলি, আজই এসব না হলে চলছিল না? কতদিন বাদে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম করলুম। প্রায় ছ'টা বাজতে চলল।

—আর একটুখানি।

নিভা বউদি মিষ্টি হাসলেন—উপকরণ সবই রেডি। এবার স্রেফ প্রক্রিয়াটুকু। পাঁচ মিনিট। প্লিজ।

নিভা বউদি ফের শুরু করলেন : ওভেনে বড় ডেকচিটা চাপিয়ে দাও। দু'লিটার মতো জল পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছেঁকে অল্প গরম করে নাবিয়ে রাখ। এবার শশার কুচিগুলি দিয়ে ভাল করে মুখখানা ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে নাও। তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেল। পরিষ্কার নরম তোয়ালে দিয়ে মুখখানা আলতো করে মুছে নাও। এবার কাজু ও আদা বাটার সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে মেখে নাও সারা মুখে। এবার ঠাণ্ডা জলে মুখটা ধুয়ে নাও। এরপর সর-ডালবাটা ও কলার কাথ পুরু করে মুখে মেখে দশ মিনিট শুয়ে থাক। দশমিনিট বাদে প্রথমে ঠাণ্ডা জলে, পরে কুসুম-কুসুম গরম জলে মুখটা ফের ধুয়ে ফেল। এবার ফেটানো দই এবং ডিমের সাদা অংশটা ভাল করে সারা মুখে মাখ। পাঁচ মিনিট বাদে বরফ-গলা জল দিয়ে মুখখানা ধুয়ে ফেল। পরিষ্কার নরম তোয়ালে দিয়ে মুখের জল শুষে নাও।

এবার ওভেনে ছোট ডেকচিটা চাপাও। মাখনটা গলিয়ে নিয়ে নাবিয়ে রাখ। ঠাণ্ডা করে নাও। আঙুলের ডগায় একটু একটু মাখন নিয়ে আলতো ঘষতে থাক সারা মুখে। তুলো দিয়ে মুখখানা মুছে নাও। এবার গায়ের কম্‌প্লেকশন অনুযায়ী মেকআপ করে নাও। দেখ, কেমন দেখায় তোমায়!

মুখ হাঁ করে প্রক্রিয়াটা শুনছিলুম আমি। সহসা বলে উঠলুম, লবঙ্গ আর গোলাপজল পড়ে রইল যে? ডিমের কুসুমটাও।

—পড়ে থাকবে না। নিভা বউদি মিষ্টি হাসলেন,—রাত্তিরে শোওয়ার আগে ওগুলি কাজে লাগবে। ওই একই পদ্ধতিতে মুখখানা পরিষ্কার করে নিয়ে লবঙ্গ বাটা ও গোলাপজল সহযোগে ডিমের কুসুমটা মেখে শুয়ে পড় বিছানায়। সকালবেলায় তোমার মুখখানাকে লাগবে একটি তাজা ফুলের মতো।

—কোন ফুলের মতো? আমি শুধিয়ে বসি।

—মানে?

—মানে, ফুল তো অনেক কিসিমের রয়েছে এই দুনিয়ায়। পদ্মফুল, ট্যাড়স ফুল। তার চেয়ে বড় কথা, ওই ফুলটিকে দেখবে কে?

আমার দিকে অপাঙ্গে তাকালেন নিভা বউদি। বললেন, যার জন্য সাজা, সে দেখবে।

—কী করে দেখবে সে? আপনার প্রক্রিয়া মতো ফি-বারে মুখ ধোয়ার খরচ পড়ছে চোদ্দো টাকা মতো। দিনে অন্তত তিনবার এমনিভাবে মুখ ধুতে বলছেন। অর্থাৎ শুধু মুখ

ধোয়ার খরচই দিনে বিয়াল্লিশ টাকা। শুনেই তো দু'চোখে সর্ষেফুল দেখছি আমি। কাজেই বউয়ের মুখের দিকে তাকালেই দেখব, এক গোছা সর্ষেফুল।

আমার কথায় চোখ পাকিয়ে তাকালেন নিভা বউদি। বললেন, বউয়ের চাঁদবদনটি দেখার ইচ্ছে ষোলোআনা, অথচ খরচের কথায় আঁতকে উঠলে চলবে? মনে রেখ, ভাজা খেতে হলে তেলের ব্যয় হবেই।

আমি তখন ঘনঘন ঘড়ি দেখছিলুম। তাই দেখে নাচার মুখে উঠে দাঁড়াল আমার বউ। বলল, নাহ, এদের জ্বালায় এখন আর এসব হয়ে উঠবে না নিভাদি। এখন শুধু পাতিলেবু আর শশা দিয়ে মুখটা ঘসে নিচ্ছি। সিনেমা দেখে ফিরে বাকিটা না হয়...। বলতে বলতে সমস্ত উপকরণ তুলে রাখতে লাগল শোওয়ার ঘরের তাকে।

তাই দেখে ক্ষীণ ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল নিভা বউদির। বললেন, তুমি কী এসব খোলা তাকে রেখে যাবে নাকি?

—ক্ষতি কী? একটু বাদেই তো ফিরে এসে...।

—তোমার বাড়িতে কাজের লোক নেই?

—কাজের লোক থাকবে না কেন?

—তা হলে খবরদার ওই কাজটি করো না। ওদের যা নোলা না! ফিরে এসে দেখবে তোমার অর্ধেক মাল সাফ।

—যাহ্, কী যে বল! এগুলো কি খাবার জিনিস নাকি?

—বিশ্বাস হল না তো? আমি অন্তত দু'দিন হাতেনাতে ধরেছি।

—তা-ই?

—একদিন খুব জব্দ হয়েছিল, জান। কালোমেঘের রস আর অলিভ অয়েল দিয়ে দুধের সর ফেটিয়ে রেখেছিলুম। ফ্রিজ থেকে তাই চুরি করে খেয়ে ওর যা অবস্থা! পেট চেপে ধরে খালি সারারাত বাথরুমে দৌড়চ্ছে।

বলতে বলতে অপরিসীম কৌতুকে সারা অঙ্গ দুলিয়ে হাসতে লাগলেন নিভা বউদি।

আড্ডাপুরাণ

এই পৃথিবীতে আড্ডার তুল্য সুখ আর কিছুতেই নাই। পাক্কা আড্ডাবাজেরা হাড়েহাড়ে বুঝেছেন, আড্ডার অধিক কড়া নেশা এযাবৎ অমৃতের পুত্রগণ আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। এমনকী, ড্রাগ, হেরোইন, হিরোইন জাতীয় সব কিছুই প্রতিযোগিতার আসরে আড্ডার কাছে হেরে ভূত হয়ে যাবে। হাজার দুঃখকষ্টে ভরা পৃথিবী নামক প্যান্ডোরার বাক্সটির মধ্যে বেঁচেবর্তে থাকতে হলে আড্ডাপেক্ষা মহৌষধ আর কিছুই হয় না। একটি নির্ভেজাল আড্ডা নাকি পুত্রশোকও ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

সময়হারিণী, দুঃখহারিণী আড্ডার সাধনা যাঁরা করেন, তাঁরা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ আলাভোলা, বাউন্ডুলে হয়ে থাকেন। তাঁরা সময়জ্ঞানহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এমনতরো



অপবাদ তাঁদের আজীবনকাল সহ্য করতে হয়। আড্ডায় মজে গেলে তাঁরা নাকি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন ঘরে আগুন লাগলেও ঠাহর পান না। নিজপুত্রকে সর্প দংশন করলেও 'কার সাপ' জাতীয় দার্শনিক প্রশ্ন তোলেন। স্নান-আহারের কথা বেমালুম বিস্মরণ হন। সমাজ-সংসার সব কিছু আড্ডার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

আড্ডা-বিশারদগণ দাবি করেন, নির্ভেজাল আড্ডায় নাকি ঈশ্বরপ্রাপ্তিও ঘটতে পারে। কারণ, শাস্ত্রে রয়েছে, কু-প্রবৃত্তিগুলি থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষ মোক্ষ লাভ করে। আর এটা তো অতি পুরাতন শাস্ত্রীয় সত্য যে, 'যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'। অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে চিত্তের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তিগুলি নিরোধ করা সম্ভব। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগাদি যত প্রকারের যোগের উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে-পুরাণে রয়েছে, তার সঙ্গে আড্ডাযোগটিও যে কী কারণে সংযোজিত হয়নি, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অথচ এতে কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই যে, আড্ডাযোগও মোক্ষলাভের একটি মোক্ষম পথ। কারণ, একটি নির্ভেজাল আড্ডায় মানুষ ক্ষণকালের জন্য হলেও ইহকাল-পরকাল, এই পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা ভুলে গিয়ে অপার আনন্দের সায়রে রসগোল্লা, পানতুয়ার ন্যায় ভাসতে থাকে। বাস্তবিক, 'স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে'। আর, শীতের আগমন ঘটলে বসন্ত যেমন অধিক তফাতে থাকতে পারে না, তেমনি, স্বর্গ এসে হাজির হলেই, কানের সঙ্গে মাথার মতো, ঈশ্বরকেও আসতে হয়। কাজেই, একটি নির্ভেজাল আড্ডার ফলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মোটেই অহেতুক নয়।

তথাপি আড্ডা সম্পর্কে যারা নিরন্তর কুৎসা রচনা করে আড্ডাপ্রেমীদের হৃদয়ে অশেষ বেদনার সঞ্চার করে, তারা আড্ডার শত্রু বৈ কিছুই নয়। এইখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, আড্ডার শত্রু মূলত দু'জন। ঘড়ি এবং ঘরণি। ঘড়ি যে আড্ডার পরম শত্রু, বলা যায়, 'কাবাব্‌মে হাড্ডি', এতে বোধ করি কোনও আড্ডাবাজই সংশয় প্রকাশ করবেন না। স্বয়ং আড্ডা-শিরোমণি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আড্ডা এবং ঘড়িকে একই ঘরে চলতে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। 'টিকটিক' জাতীয় পৌনঃপুনিক আপাত-নির্দোষ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 'সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়,/যেজন না বোঝে, তারে ধিক শত ধিক' জাতীয় দার্শনিক সতর্কীকরণ করতে গিয়ে ঘড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজে না বেজেও আড্ডার বারোটা বাজিয়ে দেয়। অতএব, নির্ভেজাল আড্ডাস্থলে ঘড়ি নামক ঘড়েল বস্তুটির প্রবেশ সর্বৈব নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ঘরনি হলেন আড্ডার দ্বিতীয়া ও ভয়ঙ্করী শত্রু। পতিদেবতা সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কেবল ছলে-বলে-কৌশলে লক্ষ্মী ঠাকরুনের উপাসনা করবে, মা-লক্ষ্মীকে পায়ে অথবা ঘাড়ে অথবা কেশে ধরে হিড়হিড় করে সংসারে টেনে নিয়ে আসবে, এর চেয়ে সুখকর দৃশ্য, মধুরতম স্বপ্ন স্ত্রীজাতির কাছে আর কিছুই হতে পারে না। সেই পতিগণ যদি সামান্যতম সুযোগ পেলেই বকর-বকর করে স্বর্ণবর্ষী সময়ের অপচয় ঘটায়, তবে কোন পতিব্রতা পত্নী তা খুশিমনে গ্রহণ করতে পারে! কাজেই, 'কবির স্ত্রী' নামক কবিতায় কবিগুরু বর্ণিত কবিজায়াটির মতো, 'অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,/নিশিদিন ধরি এ কী ছেলেখেলা,/ভারতীরে ছাড়ি ধর এইবেলা লক্ষ্মীর উপাসনা।' বলে কোনো আধুনিকা

ঘরনি যদি তাঁর পতিদেবতাটিকে আড্ডাচ্যুত করতে চান এবং নিজ সন্তানের বাল্যশিক্ষা, শিশুখাদ্য সংগ্রহ, কিংবা সরকারি কন্ট্রোলের দোকানে লাইন দিয়ে কেরোসিন সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত প্রেরণা জোগাতে থাকেন, তাতে নির্ভেজাল আড্ডার ধ্বজাধারীদের কিঞ্চিৎ গাত্রদাহ হতেই পারে। এ হল আসলে আমাদের সনাতন শাস্ত্রের দুই বিপরীত ঘরানার বিরোধ। আড্ডাযোগের সঙ্গে কর্মযোগের দ্বন্দ্ব। 'যাবৎ জীবেৎ সুখ জীবেৎ'-এর সঙ্গে 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথা'র হাড্ডাহাড্ডি অথবা বলা যায় আড্ডাআড্ডি লড়াই। গৃহিণী বা আড্ডাবাজ নিমিত্ত মাত্র।

বারবার আড্ডাকে 'নির্ভেজাল' বিশেষণে ভূষিত করে আমি স্বয়ং বোধ করি একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছি যে, আড্ডার আবার ভেজাল-নির্ভেজাল কী? আড্ডা কি দুধ, সর্ষের তেল, কিংবা জীবনদায়ী ওষুধ যে ওতেও ভেজাল থাকবে? সবিনয়ে জানাই যে, আড্ডাতেও বহুল পরিমাণে ভেজাল থাকা সম্ভব, এবং বাস্তবে থাকেও। এবং সেই ভেজাল দুধ-তেল-ওষুধের ভেজাল অপেক্ষাও গুরুতর প্রাণহারিণী উপাদানে বিষবৎ। আড্ডার স্থলে সেই ভেজালটির নাম পরচর্চা। বর্তমানে আড্ডাবাজ নামধারী অনেকেই আড্ডার দুনিয়ায় বিচরণ করে, যারা, সবাই এক অর্থে 'ভেজালদার' বিশেষণে ভূষিত হওয়ার যোগ্য। এবং ভেজালদারিতে তারা আসল ভেজালদারদের গুরু হওয়ার যোগ্য। কারণ, এদেশের সবচেয়ে অধম ভেজালদারও উৎপন্ন দ্রব্যে ভেজাল বস্তুর সঙ্গে অন্ততপক্ষে কিছুটা সার বস্তুর মিশ্রণ ঘটায়, কিন্তু এইসব ভেজালদার আড্ডাবাজদের আড্ডাতে পরচর্চা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মনে রাখতে হবে, আড্ডা আর পরচর্চা এক নয়। বরং বলা যায় দুটি পরস্পরবিরোধী বস্তু। প্রথমটি যদি অমৃত হয় তো দ্বিতীয়টি বিষ। অনেকখানি রামকৃষ্ণদেবের কাঁচা-আমি আর পাকা-আমির সঙ্গেই তুলনীয় তা।

আড্ডা অর্থে নিছক গল্পগাছাও নয়। তন্ত্র অনুসরণ করে বলা যায়, আড্ডা যদি সিদ্ধি হয়, তবে গল্পগাছা হল সিদ্ধাই। আর পরচর্চা হল নিছক সাধনসঙ্গিনীকে কোলে বসিয়ে ফস্টিনষ্টি করা। নির্ভেজাল আড্ডা বাস্তবিক এক অতি উচ্চমার্গের সাধনা।

আদর্শ আড্ডার প্রকৃত সংজ্ঞাটি কী?

আমার আড্ডাবিশারদ বন্ধু চপলকুমারের মতে, 'একটি নির্ভেজাল আড্ডায় কিছু সাধকতুল্য ব্যক্তি নির্মোহ দৃষ্টিসহকারে বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনাপ্রবাহ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এবং তৎসংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়কে বিভিন্ন দিক হইতে চাখিবে, চিবাইবে, আস্বাদন ও রোমন্থন করিতে করিতে তদ্‌গত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একেবারে ভোঁ হইয়া যাইবে।'

উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে অভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করলে বলতে হয়, আড্ডার সঙ্গে পরচর্চা জাতীয় উপাদান মিশে গেলেই তা গাড্ডায় পরিণত হয়। আড্ডাপ্রাপ্তির বদলে গাড্ডাপ্রাপ্তি ঘটলে পদস্খলন, অধঃপতন এবং পরিণামে ভগ্নপদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অতএব সাধু সাবধান।

আইডিয়া থেকেই আড্ডা

আমাদের সমাজে আড্ডাবাজরা আজও যে যারপরনাই অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের শিকার, এটা দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আড্ডা' কিংবা 'আড্ডাবাজ' শব্দগুলি খুবই লঘু শোনালেও, এবং নিতান্তই নিষ্কর্মাদের সময় অপচয়কারী নেশা বোঝালেও আড্ডা মারা কিন্তু মোটেই সহজ কর্ম নয়। বরং আড্ডা মারা হল দুনিয়ার তাবৎ কঠিন কর্মগুলির অন্যতম। সেই কারণেই প্রথম শ্রেণীর আড্ডাবাজ আজকাল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আসল আড্ডা এক কিসিমের সাধনতুল্য বস্তু। নির্ভেজাল আড্ডা মারতে হলে যে পরিমাণ তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, দুনিয়ার সব বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং বুকের মধ্যে সুগাঢ় রসবোধ থাকা প্রয়োজন, তা এযুগের নাভিশ্বাস ওঠা মানুষের মধ্যে নিতান্তই বিরল। তথাপি চারপাশের রক, চায়ের গুমটি ও এবংবিধ অন্যান্য জায়গাগুলিতে যে জমায়েত এবং কলহাস্য আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, তা আড্ডার নামে নিছক এবং নিরঙ্কুশ পরচর্চা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃত আড্ডা যদি এক কিসিমের সাধনা হয়, তবে এ হল



তন্ত্রসাধনার নামে সঙ্গিনীটিকে কোলে বসিয়ে নিছক মজা লুটতে থাকা।

এটা আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আড্ডাবাজ সবাই হতে পারে না। আমার আড্ডাবিশারদ বন্ধু চপলকুমারের মতে, কেবল টেলিফোন স্বভাবের মানুষই প্রথম শ্রেণীর আড্ডাবাজ হতে পারে।

বিষয়টি একটু খোলসা করে বলা দরকার। আড্ডায় সাধারণত তিন স্বভাবের মানুষ উপস্থিত থাকে। রেডিওটাইপ, টেপ-রেকর্ডারটাইপ এবং টেলিফোন-টাইপ। রেডিও-টাইপ মানুষ হল তারাই, যারা সারাক্ষণ রেডিওর মতো বকে চলে। কে শুনল, কী প্রতিক্রিয়া হল, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। তারা সাধারণত এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। নিঃশ্বাস না নিয়ে কিংবা না ছেড়ে তারা অনেকক্ষণ অবধি কথা বলে যেতে পারে। আড্ডায় কথা বলতে গিয়ে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনেও তিলমাত্র থামে না, পাছে অন্য কেউ কথা বলে ফেলে। কাজেই, রেডিও-টাইপ মানুষ একজনমাত্র উপস্থিত থাকলেই আড্ডা কালক্রমে বক্তৃতাসভায় পরিণত হয়। টেপরেকর্ডার টাইপ মানুষ হল তারাই, যারা আড্ডার একপাশে সারাক্ষণ নিঃশব্দে অন্যের কথা শুনে যায়। এক সময় আড্ডার অপর ব্যক্তিবর্গ তাদের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। আড্ডায় এদের উপস্থিতি অনেকটা কচ্ছপের মতো। কারণ, কচ্ছপই আমার দেখা একমাত্র প্রাণী, মুখখানা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে যাকে একখণ্ড পাথরের মতো নিষ্প্রাণ লাগে। তৃতীয় শ্রেণীটি হল টেলিফোন-টাইপ। কথা বলে এবং শোনে। এরাই আড্ডার সম্পদবিশেষ। বিশ্বের সমস্ত প্রথম শ্রেণির আড্ডায় এই ধরনের টেলিফোন-টাইপ মানুষেরই প্রাধান্য।

কিন্তু শুধু টেলিফোন-টাইপ মানুষ হলেই যে তিনি প্রথম শ্রেণীর আড্ডাবাজ হবেন এমন কোনও কথা নেই। একজন সার্থক আড্ডাবাজ হতে গেলে কিছু বিশেষ গুণাবলী থাকা একান্তই আবশ্যক। পরম আড্ডাভট্টারক সৈয়দ মুজতবা আলি মশাইয়ের মতে সার্থক আড্ডাবাজ হতে গেলে যে বিশেষ গুণটি আবশ্যক, তা হল, 'অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ'। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয় অথবা আইডিয়াসমূহের মধ্যে সুচারুভাবে সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা। বিষয়টি প্রাঞ্জল করে বললে নিমেষের মধ্যে পাঠকবর্গের প্রাণ আহ্লাদে একবারে জল হয়ে যাবে। ধরুন, একটা আড্ডা শুরু হল 'নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ' বিষয়ে। কালক্রমে তা চিন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভূত, হেমা মালিনী, সাঁইবাবা, কপিলদেব হয়ে কখন যে 'রেলের ফাঁকা কামরায় যুবতী ধর্ষণে' এসে ঠেকেছে, তা আড্ডার ধারক-বাহকরাও সহসা ঠাহর করে উঠতে অপারগ হন। বস্তুত একটি আড্ডার মধ্যে কেউই সচেতনভাবে বিষয়গুলির পরিবর্তন করেন না। উৎকৃষ্ট আড্ডার স্বাভাবিক নিয়মেই আড্ডাবাজরা নিজেদের অজান্তেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করতে থাকেন, এবং আড্ডাও আপন গতিতে চলতে থাকে। আড্ডা চলাকালীন এই যে বিভিন্ন বিষয়কে, আইডিয়াকে একই সূত্রে মালার মতো গেঁথে ফেলা, এটাই প্রথম শ্রেণীর আড্ডাবাজদের মুখ্য গুণ। এবং যিনি এই গ্রন্থনকার্য যত সুচারুভাবে সমাধা করতে পারেন, তিনি তত উচ্চমার্গের আড্ডাবাজ। যিনি বা যাঁরা এই জাতীয় গ্রন্থনকার্যে অক্ষম কিংবা অপটু, তাঁদের আড্ডা অল্প সময়ের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলি একটি বাচ্চা ছেলের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে তিনি

ভবিষ্যতের একজন প্রথম শ্রেণীর আড্ডাবাজের প্রতিভা লক্ষ করেছেন। ছেলেটির মিষ্টির প্রতি এমনই দুর্বলতা ছিল যে, মিষ্টির নাম শুনলেই তার জিহ্বাটি দূর্বালতার মতো লকলকিয়ে বেড়ে যেত। সেই কারণেই, যে কোনও প্রসঙ্গ থেকে সে অতি স্বচ্ছন্দে মিষ্টির প্রসঙ্গে পৌঁছে যেতে পারত।

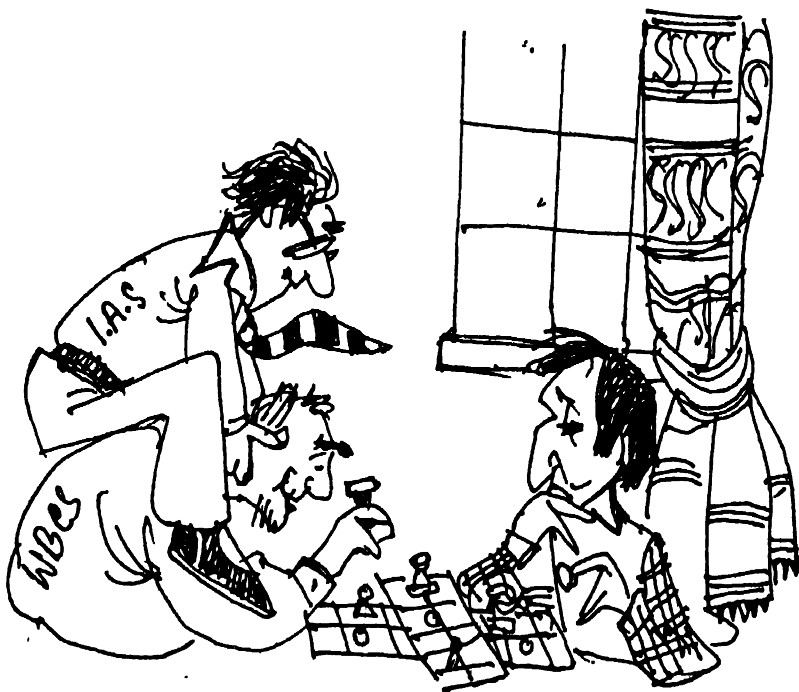
একদিন, পাঠশালার পণ্ডিতমশাই তাকে একক থেকে কোটি অবধি মুখস্থ করতে বললেন। এমন নিরস বিষয় অধ্যয়নকালেও ছেলেটি মিষ্টির কথা ভুলতে পারে না। তথাপি পণ্ডিতমশায়ের বেতের ভয়ে সে 'একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি' কথাগুলি বারবার চিৎকার করে মুখস্থ করতে থাকে। বারকয় উচ্চস্বরে পাঠ করার পর অকস্মাৎ, সম্ভবত মিষ্টির প্রতি লালসাজনিত জিহ্বার পিচ্ছিলতাবশত, সে অযুতের পরে লক্ষ না বলে লক্ষ্মী বলে ফেলে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ান্তরে চলে যায়। ছেলেটির বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পৌঁছনোর স্তরগুলি নিম্নরূপ : লক্ষ্মী—সরস্বতী—গণেশ—কার্তিক, কার্তিক—অগ্রহায়ণ—পৌষ—মাঘ, মাগ— ছেলে—পিলে, পিলে—জ্বর—শর্দি—কাশি, কাশী—প্রয়াগ—মথুরা—বৃন্দাবন—পুরী। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে গড়গড় করে আওড়াতে থাকে পুরী—লুচি—কচুরি—জিলিপি—রসগোল্লা—পানতুয়া জাতীয় যাবতীয় মিষ্টির নাম। স্রেফ একক-দশকের আইডিয়া থেকে লাফ মেরে মেরে যে ছেলে অবলীলায় মিষ্টির আইডিয়াতে পৌঁছে যেতে পারে, কালক্রমে বড় হয়ে, সে যে আড্ডায় বসে 'নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ' থেকে অবলীলায় 'রেলের কামরায় যুবতী ধর্ষণ'-এ পৌঁছে যাবে, এ আর বেশি কথা কি? এমন আইডিয়াবাজ ছেলে বেঁচেবর্তে থাকলে কালে কালে তুখোড় আড্ডাবাজ হয়ে দেশ তথা জাতির মুখোজ্জ্বল করবেই। কারণ, আমার সবজান্তা বন্ধু চপলকুমারের মতে, 'আইডিয়া' থেকেই নাকি 'আড্ডা' শব্দের উৎপত্তি। আইডিয়া—আইড্যা—আড্ডা। কাজেই, এমন ঘনঘন নতুন নতুন আইডিয়া আসে যে ছেলের মাথায়, সে তো ভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণীর আইডিয়াবাজ অর্থাৎ আড্ডাবাজ হবেই।

আমিও আমার এই ছোট্ট জীবনে একজন দারুণ (নাকি নিদারুণ) আড্ডাবাজের সংস্পর্শে এসেছিলাম। নতুন নতুন আইডিয়ার মালা গাঁথতে গাঁথতে তিনি যে কোথা থেকে কোথায় চলে যেতে পারতেন, তার বুঝি কূলকিনারা ঠাহর করা দুষ্কর। পরের কিস্তিতে ওই আড্ডাবাজটির প্রসঙ্গ তোলার ইচ্ছে রইল।

অ্যাসোসিয়েশন অব্ আইডিয়াজ

আগের রচনায় আড্ডাসংক্রান্ত 'অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি ছেলের মিষ্টিপ্রীতির কথা বলেছি। এখন একজন প্রৌঢ়ের কথা বলব, যাঁর মধ্যেও ওই 'অ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ' নামক গুণটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই ঘটনাটা বলছি।

তখন আমি সদ্য চাকরি পেয়ে উত্তরবঙ্গের একটি জেলা-শহরে কর্মরত আছি। সুনীতিদা ছিলেন ওখানেই কর্মরত একজন প্রবীণ ডব্লুবিসিএস (ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) অফিসার। খুব ভালো মানুষ ছিলেন সুনীতিদা। কাঠ-বাঙাল। পূর্ববঙ্গীয় টান ছিল কথায়। খুব ভালো লাগত শুনতে। সুনীতিদা ছিলেন খুবই আমুদে আড্ডাবাজ মানুষ। এবং তুখোড় দাবা খেলতেন। কিন্তু ওই মিষ্টিপ্রাণ ছেলেটির মতো সুনীতিদারও একটি 'মিষ্টি'র জায়গা ছিল। সেটা হল, আই-এ-এস অফিসাররা কাজকর্ম বড় একটা বোঝে না। করতেও চায় না। সারাক্ষণ ডব্লুবিসিএস অফিসারদের ওপর বন্দুকটি রেখে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে



বেড়ায়। ফলত, ডব্লুবিসিএস অফিসাররাই প্রশাসনের যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা পোহায়। তারাই সারাক্ষণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রশাসনকে সচল রাখে। অফিসের ফাইলে ডব্লুবিসিএস অফিসাররাই সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করলে পর আই-এ-এস অফিসাররা ওই নোটের তলায় সইয়ের নামে একটা পাখি উড়িয়ে দেয়। অথচ, চাকরিতে যা কিছু সুযোগ-সুবিধে, ঘি-মালাই, সব কিছু তারাই ভোগ করে। ডব্লুবিসিএস অফিসারদের ভাগ্যে খালি ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই জোটে না। অফিসে, বাড়িতে, সভাসমিতিতে, বিয়ে-সাদির আসরে, হাটেবাজারে, ফেয়ারওয়েলের বৈঠকে অথবা বিজয়া সম্মিলনীতে—সর্বত্র সুযোগ পাওয়ামাত্র, কখনও বা সুযোগ বানিয়ে নিয়ে, সুনীতিদা প্রসঙ্গটি তুলতেন এবং সারাক্ষণ ওই নিয়ে আক্ষেপ করে যেতেন। সর্বত্র, যে কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা চলুক না কেন, তিনি ওই প্রসঙ্গ থেকে ধাপে ধাপে তাঁর ওই 'মিষ্টি'র জায়গাটিতে পৌঁছে যেতে পারতেন। আমরা সুনীতিদার ওই মিষ্টির জায়গাটি নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করতাম।

একদিন অফিসের পর সুনীতিদা আমাকে দাবা খেলতে ডাকলেন তাঁর কোয়ার্টারে। তারপর যা ঘটল, তা এক কথায়, বিস্ময়কর।

দাবার বোর্ড পাতা হল। ঘুঁটি সাজানো হল। সুনীতিদা বললেন, কে আগে চাল দিবে? তুমি পোলাপান আছ, তুমিই আগে দাও।

সেইমতো প্রথম চাল আমিই দিলাম।

চালানো ঘুঁটিদুটোর দিকে কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে রইলেন সুনীতিদা। তারপর প্রশংসার ছলে বলে উঠলেন, বাব্বা! তুমি তো এক্কেরে রাশিয়ান চাল দিয়া দিলা।

রাশিয়ানরা দাবা খেলায় দক্ষ। সেই কারণেই প্রশংসা করতে গিয়ে সুনীতিদা আমার চালটাকে রাশিয়ান চালের সঙ্গে তুলনা করলেন।

খুব সলজ্জ ভঙ্গিতে বললাম, রাশিয়ান না স্প্যানিশ বুঝিনে দাদা, সবাই এমন চাল দেয় দেখি, তাই দিলাম।

—রাশিয়ান না স্প্যানিশ? সুনীতিদা আমার মুখের দিকে কটমট করে তাকালেন,—এই তোমার সেন্স অফ কমপ্যারিজন? রাশিয়ার সঙ্গে কমপ্যায়ার করবার আর দ্যাশ খুঁইজ্যা পাইলা না? রাশিয়ান না স্প্যানিশ? হেই দুইডা দ্যাশের মধ্যে কোনও রূপ কমপ্যারিজন চলে? একটা দ্যাশে সেই ১৯১৭ সালে সোস্যালিজম আইসা গ্যাসে গা, আর, অন্য দ্যাশটিতে আজ অবধি রাজতন্ত্র বহাল, দুইডা দ্যাশের মধ্যে কোনো তুলনা চলে? হ্যাঁ, তুমি যদি কইতা রাশিয়ান না চাইনিজ, তাও একটা কথা ছিল। কেন কী, দুইডাই সোস্যালিস্ট দ্যাশ। তুমি কইতে পার, দুই দ্যাশের সোসালিজমের মধ্যে ফারাক রইসে। রাশিয়ার সোসালিজম অনেক লিবারেল, চিনের সোস্যালিজম অনেক কট্টর। সেখানে রেড-গার্ড, কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্প আরও হাবিজাবি অনেক হ্যাপা রইসে। হ্যাঁ, সে সব আছে বটে চিনে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে তাও চিনের সমস্ত মানুষ দু-ব্যালা প্যাট ভইরা খাইতে পায়। তুমি কইতে পার, সে তো আমেরিকার মানুষও প্যাট ভইরা খায়। হ্যাঁ, চিনের মানুষও প্যাট ভইরা খায়, আমেরিকার মানুষও প্যাট ভরিয়া খায়। কিন্তু তার মধ্যেও ফারাক রইসে। চিনের মানুষ ডাইল-ভাত খায় তো হক্কলে ডাইল-ভাত খায়, মাছ-ভাত খায় তো হক্কলে মাছ-ভাত খায়। আর আমেরিকায়? একজন দু-ডলারের মিল খায়, একজন পাঁচশো

ডলারের মিল খায়। একজন প্যালেসে বাস করে, একজন ফুটপাতে থাকে। উঁ-হুঁ-হুঁ—অত চমকে উঠো না, আমেরিকাতেও বহু মানুষ ফুটপাতে থাকে। তোমরা তো ভাবো, আমেরিকার বেবাক মানুষ বুঝি ফোর্ড কুম্পানির মালিক। ভু—ল। আমেরিকায়ও গরিব আছে। আমেরিকাতেও বহু মানুষ স্টার্ভ করে। আমেরিকাতেও বেকার আছে। আর, থাকব নাই বা ক্যান? একটা দ্যাশ আর একটা দ্যাশের উপর পঁচিশ বৎসর কন্টিনুয়্যাস বোমা ফেইলা যাইত্যাসে। ন্যাশনাল ইকোনমির উপর তার কোনো ইমপ্যাক্ট পড়বো না? একটা বোমা তৈরি করতে কত খরচ হয়, জান? আর, সে তো একটা দুটা বোমা না। কোন্ এক ম্যাগাজিনে য্যান্ পড়ছিলাম, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কোইল্‌কাতার আশেপাশে জাপানিরা সাকুল্যে যত বোমা ফ্যাল্‌সে, আমেরিকা ভিয়েতনামের উপর রোজ তত বোমা ফ্যাল্‌সে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় জাপান কিন্তু কোইল্‌কাতার আশেপাশে কম বোমা ফ্যালে নাই। তখন তো আমি কোইল্‌কাতায় ছিলাম। তোমাগো বউদিরে লইয়া শ্যামবাজারে একখান ঘর ভাড়া লইয়া থাকতাম। তখন যুদ্ধের টাইম। দিনরাত যখন-তখন বোমা পড়্‌সে। শেল ফাটসে। মানুষ এক্কেরে বি-উইল্ডারড হয়্যা গ্যাসে গা। তখন, হাটবাজার করি, নাকি অফিসে যাই, নাকি তোমার বউদিরে সামলাই—উহ্, সে এক দিন গ্যাসে ভাই। তোমার বউদি তো ভয়েই আধখান। তার গায়ে তখন আটপৌরে সোনার গহনা না হইলেও পঞ্চাশ ভরি। সে আইজকালকার পলকা গহনা নয়, এক্কেরে খাঁটি গিনি সোনার গহনা। না, না, আমি কিনি নাই। আমার পকেটে অত তেজ ছিল না। বিয়াতে তোমার বউদিরে যৌতুক দিসিলো অর বাপ। তোমার বউদির বাপের বাড়ির অবস্থা তো বিশাল ছিল। পঞ্চাশ ভরি সোনার গহনা অদের হাতের ময়লা। কোইল্‌কাতার বুকেই আট-দশখান বাড়ি ছিল অদের। নিজেদের থাকবার লগে বালিগঞ্জে তিনবিঘা জমির উপর প্যালেসিয়াল বিল্ডিং। খান আষ্টেক উরে মালি চব্বিশ ঘণ্টা খাটতো অদের বাগানে। তখন উরিষ্যার অবস্থা তো এরকম ছিল না। উরে মালি সহজেই পাওয়া যাইত। এখন না হয় উরিষ্যার আঙুল ফুইল্যা কলাগাছ। এখন না হয় উরিষ্যা ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট আই-এ-এস প্রোডিয়ুসিং স্টেট। হইলে কী হয়, তেমনই আই-এ-এস। আমরা ডব্লুবিসিএস-রা সবকিছু সাজাইয়া-গুছাইয়া সামনে ধইরা দিলে নোটের তলায় টুক্কুস কইরা অ্যাকখান পাখি উরাইয়া দেয়। অথচ উয়াদ্যার তরে গম্‌মেন্টের যাবতীয় মালাই-রাবড়ির ব্যবস্থা, আর আমাদের কপালে পান্তাভাতও জোটে না। এই কথাডাই আমি আমার অ্যাসোসিয়েশন্‌রে বুঝাইতে পারি না।

এইভাবে, সুনীতিদা যখন তাঁর 'মিষ্টি'র জায়গাটিতে পৌঁছলেন, দাবা খেলা তখন বিশ বাঁও জলের তলায়।

বিশ্বাস করি, আড্ডা মারবার কোনো অলিম্পিক হলে সুনীতিদা নির্ঘাৎ ভারতের হয়ে অন্তত একটা সোনা আনতেন।

ভুলের ভুলভুলাইয়া

ডাক্তারি মতে, মানুষের যতগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ভুলে যাওয়া তার মধ্যে একটি। কিছু নতুন কথা মনে রাখতে হলে কিছু পুরনো কথা নাকি ভুলতেই হয় সব মানুষকেই। কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম তাঁর গানের মধ্যে বললেন উল্টো কথাটি। অর্থাৎ, এই ডাক্তারি রায়টি নাকি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তাই তো তিনি গাইলেন, 'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে'।

কবির এই ধারণাটি যদি সত্যি হয়, তবে ডাক্তারদের ধারণাটিকে বলতে হয় ভুল। অর্থাৎ কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কস্মিনকালেও কিছুই ভোলে না। দুনিয়ার সবকিছুই আজীবনকাল মনে রেখে দেয়।



ডাক্তারের কথা থাক। কবির উক্তিটাকেই উল্টেপাল্টে দেখা যাক। কবি বলছেন, কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। তাহলেই প্রশ্ন, কে ভোলে না, আর কে-ই বা ভোলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে ভোলে, সে কেনই বা ভোলে? বাস্তবিক, এ বড়ই গুরুতর প্রশ্ন, কিনা, এই দুনিয়ায় যারা কিছু কিছু স্মরণযোগ্য বিষয় ভুলে যায়, তারা কেনই বা ভুলে যায়?

স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও এ প্রশ্নের জবাব জানা ছিল না। নিজের সেই অজ্ঞতা নিয়ে গানও লিখেছিলেন তিনি। একটা শোনা গল্পের মোড়কে ভরে গানটা পরিবেশন করি।

পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে রোজ রোজ বারবার শব্দরূপ ধাতুরূপ ভুলে যাওয়াতে বিস্মিত পণ্ডিতমশায় নাকি গবেট ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত ভুলে যাস কী করে রে? তার জবাবে ছাত্রটি নাকি গান গেয়ে জানিয়েছিল, 'কেন যে ম—ন ভোলে, আমার মন জানে না'—।.

ঠিক সময়ে সে যে কবিগুরুর এই গানটাই কেন ভুলে গেল না, সেটাও এক লাখ টাকার প্রশ্ন।

কিছু ব্যাপারে আমাদের প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই কম-বেশি ভুল হয়ে যায়। দেশলাই, কলম, বই গোছের সামগ্রী ধার নিয়ে আমরা তো হর-হামেশাই ফেরত দিতে ভুলে যাই। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন নাকি বন্ধুদের থেকে বই ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার কথাটা বেমালুম ভুলে যেতেন। আর, তাঁর সেই ভুলে যাওয়ার ফসল হিসেবে তিনি নাকি পেয়েছিলেন পাহাড়প্রমাণ বই।

কোন্ এক মহাপুরুষ নাকি ছড়ি হাতে বেড়িয়ে ফিরে ছড়িটিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজে রাতভর দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের কোণে। তিনি যে ছড়ি নন, ছড়ির মালিক, সেটা ভুলেই গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

এই প্রসঙ্গে একজন ভুলো রোগীর গল্প মনে পড়ছে।

একজন ভদ্রলোক কিছুদিন যাবৎ সবকিছু ভুলে যাচ্ছিলেন। এই মনে পড়ে তো, এই ভুলে যান। তখনকার কথা তখনই ভুলে যান। খুব ভয়ে ভাবনায় পড়ে ভদ্রলোক গেলেন মনের ডাক্তারের কাছে। খুলে বললেন সব কথা।

বললেন, ডাক্তারবাবু, আমি মাঝেমাঝেই কিছু কিছু কথা ভুলে যাচ্ছি। ধরুন, ভাত খেতে খেতে তরকারি খাওয়ার কথাটা ভুলেই গেলাম। অফিসে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরোলাম, বাসস্ট্যান্ডের পথটাই ভুলে গেলাম। কিংবা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের নির্দিষ্ট নম্বরটাই ভুলে গেলাম। যদিও বা বাসে উঠলাম কোনওগতিকে, কোথায় নামব সেটাই ভুলে গেলাম। কখনও কখনও নিজের নামটাই ভুলে গেলাম।

সব শুনে ডাক্তারবাবুর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

শুধোলেন, এই ব্যাপারটা কদ্দিন ধরে হচ্ছে?

তার জবাবে রোগী ডাক্তারবাবুর দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে শুধোলেন, কোন ব্যাপারটা বলুন তো?

ডাক্তারবাবু বুঝলেন, এতক্ষণ তাঁকে যা-যা বলেছেন ভদ্রলোক, পুরোটাই ভুলে মেরে দিয়েছেন।

একজন ভুলো-মন মানুষ 'রোজ (Rose) নার্সিংহোমে' কিছুকাল কাটিয়ে ফিরে আসার

পর তাঁব বন্ধু তাঁকে শুধোলেন, কোন নার্সিংহোমে ছিলে? জানতে পারলে তো দেখে আসতাম।

ভদ্রলোকের স্ত্রীর নামও রোজ। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই নার্সিংহোমটির নাম মনে করতে পারলেন না।

বললেন, ওই যে একটা সুন্দর ফুল রয়েছে না...।

বন্ধুটি বললেন, রোজ (Rose)?

—ঠিকই বলেছ। রোজ, এই রোজ, কোথা গেলে?

স্বামীর ডাকাডাকিতে স্ত্রী রোজ এসে সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক শুধোলেন, রোজ, আমি যেন কোন নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলুম?

সেই ভদ্রলোক ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। যাকে বলে কমন ম্যান। তাঁর এমন ভুল হতেই পারে। কিন্তু দুনিয়ার বিখ্যাত মানুষদের যদি এমনতরো ভুলে যাওয়ার বাতিক থাকে, তাহলে তো সর্বনাশ। শোনা যায়, নিউটন সাহেবের নাকি একজোড়া পোষা বেড়াল ছিল। একটা বড়, অন্যটা বাচ্চা। বেড়ালদুটো তাঁর খুবই ন্যাওটা ছিল। কিন্তু তাতে করে নিউটনের হয়েছিল ঘোর বিপত্তি। তিনি যেই না পড়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে পড়াশোনায় মন দিলেন, অমনি বেড়ালদুটো ভেতরে ঢোকার জন্য দরজা আঁচড়াতে লাগল। দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র বেড়ালদুটো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিউটন যেই না আবার পড়াশোনায় মন দিয়েছেন, অমনি বেড়াল দুটো বাইরে বেরনোর জন্য দরজা আঁচড়াতে শুরু করল। বিবক্ত নিউটন দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র বেড়াল দুটো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিউটন দরজাটি বন্ধ করে যেই না বইয়েব পাতায় মনোনিবেশ করেছেন, অমনি ওদুটো আবার ভেতবে ঢোকার জন্য দবজা আঁচড়াতে লাগল।

রোজ রোজ এমন ব্যাপার ঘটতে থাকায় বিরক্ত নিউটন একটা ছুতোরকে ডেকে বললেন, দরজার গায়ে দুটো ফুটো বানিয়ে দাও তো হে বাপু। একটা বড় একটা ছোট। বেড়াল দুটো তাহলে যখন খুশি ঢুকতে বেরোতে পাববে।

নিউটনের প্রস্তাব শুনে ছুতোর তো হেসেই খুন, কিনা কর্তার কী বুদ্ধি! দু-দুটো ফুটো বানানোর দরকার কী? একটা বড়সাইজের ফুটো বানিয়ে দিলেই তো কাজ চলে যায়। ওটা দিয়েই তো দুটোই আনাগোনা করতে পারবে।

শুনে, নিউটন নাকি জিভ কেটে বলেছিলেন, সত্যি তো! এই ব্যাপারটা তো খেয়াল করিনি।

শোনা যায়, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নাকি একদিন সন্ধেবেলায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি আর ওঠার নামটি করেন না। রাত দশটা বেজে গেল। গৃহকর্তার ডিনারের সময় বয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি আইনস্টাইনকে বললেন, অনেক রাত হল, এখানেই তবে আপনার ডিনারের ব্যবস্থা করে দিই?

আইনস্টাইন অবাক হয়ে বললেন, এই দেখুন, আমি তখন থেকেই ভাবছি, আপনারা কখন বিদেয় হবেন, আমি ডিনারে বসতে পারছি না যে।

আসলে, আইনস্টাইন ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তিনি বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি নিজের ঘরেই আছেন, গৃহকর্তাই বহিরাগত।

আমার এক গল্পকার বন্ধু প্রেম চলাকালীন হবু বউকে সিনেমাহলের সামনে দাঁড়াতে বলে একাধিকবার টিকিট-সহ সেখানে যেতে ভুলে যেতেন। এমন আত্মঘাতী ভুল যেন পরম শত্রুরও না হয়।

বেমালুম ভুলে যাওয়ার ফলে অপর পক্ষের জীবনে কী পরিমাণ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' তো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বনের মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে ফুর্তিফার্তা করে, বিয়েটিয়ে করে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে রাজা দুষ্মন্ত তা বেমালুম ভুলে গেলেন।

আত্মঘাতী ও ক্ষতিকারক ভুলে যাওয়ার কথা বললাম। এবার খুব লাভজনক ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেই বিষয়টি শেষ করতে চাই।

করুণা প্রকাশনীর কর্ণধার বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, আমাদের সবার প্রিয় বামদা, মাথায় চোট পেয়ে কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর অসুস্থতার ধরনটি ছিল, মাঝেমাঝে তিনি কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কথা ভুলে যাচ্ছিলেন। এমনকী, অতি সাধারণ কথাও। কিছুদিন এই ভুলো রোগের খপ্পরে পড়ে খুব নাকানি-চোবানি খেয়েছিলেন বামদা। একটা ছোট্ট অপারেশনের পর এখন একেবারেই সুস্থ।

বইমেলায় দেখা হতে একদিন তাঁকে শুধোলাম, বামদা, এখন আপনি পুরোপুরি সুস্থ তো? এখন আর আগের মতো ভুলে-টুলে যান নাকি?

তার জবাবে বামদা খুব খুশি খুশি গলায় বললেন, তা বলতে পারেন, চোদ্দআনা সুস্থ।

বলি, তার মানে, এখনও সমস্যাটা রয়েছে, তাই না? এখনও মাঝেমাঝেই কিছু কথা ভুলে যাচ্ছেন?

বামদা বললেন, সব কথা নয়, দু'একটি বিশেষ ধরনের কথা।

বলি, যথা?

বামদা মুচকি হেসে বললেন, এই যেমন ধরুন, আমার কাছে কে কে টাকা পাবে, কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

ঘুষপুরাণ

'এটা হল চরম দুর্নীতির যুগ। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। ঘুষ খেয়ে খেয়ে সব লাল হয়ে গেল।'

কথাগুলো ইদানীং হরবখত, এমনকী চরম দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষটির মুখেও, শুনতে পাই। বাস্তবিক, সমাজের সর্বত্র ঘুষ খাওয়া নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ নাকি বড়ই বিচলিত। ভাবলাম, বিষয়টাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখা যেতে পারে। হাজার হোক, আমিও তো সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক।

চপলকুমারকে শুধোতেই সে পয়লা চটকায় দিল এক নাতিদীর্ঘ লেকচার।

বলল, এরে সাধুভাষায় কয়, উৎকোচ। চলতি ভাষায়, ঘুষ। ঠাট্টা করে 'বাম হাতের কারবার'ও বলা হয়। মাসমাইনের চাকুরেদের বেলায় একে 'উপরি'ও বলে কেউ কেউ। বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। কি না, 'জামাই বাবাজীবনের মাইনের পরেও উপরি রয়েছে'।

এ ছাড়া স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর আরও অনেক নাম রয়েছে।



ব্যাপারটা আমাদের প্রাঞ্জল করে (কিংবা প্রাণ জল করে) বোঝায় চপলকুমার। যেমন, ধর, বাঁশের খাটো লাঠি, কেষ্টঠাকুরের হাতে তার নাম বাঁশি, পুলিশের হাতে কোঁৎকা, ঠ্যাঙাড়ের হাতে পাবড়া। কিংবা ধর, খাওয়া। অর্থাৎ কি না খাদ্যকে গলাধঃকরণ করে পাকস্থলিজাত করা। ক্ষেত্রবিশেষে তারও ভিন্ন ভিন্ন নাম। নামগুলো বলতে গিয়ে একটা গল্প মনে পড়ছে। একটা ঘরোয়া কারখানার একজন শ্রমিক দুপুরবেলায় তার সহকর্মীদের বলল, বেলা ঢের হল, চল, আহারটা সেরে আসি। শুনে সুপারভাইজার তো হেসেই খুন। ব্যাটারা, আহার করবি কী রে? কারখানার মালিক ভোজন করবেন, ম্যানেজার আহার করবেন, আমি খাব, তোরা গিলবি। যা গিলে আয়। কাজেই বুঝতে পারছ, খাদ্যকে গলাধঃকরণ করে পাকস্থলিজাত করা, পাত্রভেদে তার নাম ভোজন, আহার, খাওয়া, গেলা...। আবার ধর, খাওয়া মানে সবক্ষেত্রেই খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণ করে পাকস্থলিজাত করা নয়। যেমন, ঘুষ খাওয়া, গ্যাস খাওয়া, ধোঁকা খাওয়া, হাওয়া খাওয়া, ব্যাম্বু খাওয়া...।

বলি, দাঁড়াও দাঁড়াও, ঘুষের সঙ্গে বাংলা গ্রামার মিশিয়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেললে যে। ঘুষের নামাবলিটা আগে শেষ কর।

চপলকুমার বলে, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বাঁশের লাঠি কিংবা খাওয়া ইত্যাদির যেমন পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, ঘুষের ক্ষেত্রেও তেমনই। পাত্রভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। নিচুতলায় পুলিশ আর সরকারি কর্মচারী খেলে, ঘুষ। মন্ত্রী খেলে, কমিশন (কমিশন খাও, আর কমিশন বসাও)। ইঞ্জিনিয়ার খেলে, কাটমানি। অসৎ আমলা খেলে, ব্রাইব। 'সৎ' আমলা খেলে, গিফট অথবা নন-রিফান্ডেবল লোন। পার্টির নেতা খেলে, পার্টিফান্ডে চাঁদা। মস্তান খেলে, তোলা (একে প্রোটেকশন-ফিও বলা যায়)। শিক্ষক খেলে, টিউশন ফি। সরকারি ডাক্তার খেলে, শুধুই ফি। জামাই খেলে, যৌতুক। ঠাকুর-দ্যাবতারা নিরামিষে খেলে, নৈবেদ্য। আমিষে খেলে, বলি। হোটেলের বয়-বেয়ারা খেলে, বখশিস বা টিপস। ইট-বালিজাতীয় মালমশলা কিংবা গ্যাসবহনকারী ঠেলা বা ভ্যানওয়ালা খেলে, জলপানি।

বলি, বুঝলাম। কিন্তু পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম হলেও ঘুষ তো ঘুষই। এক এবং অদ্বিতীয়।

চপলকুমার বলে, এক হলেও অদ্বিতীয় নয়। তার একাধিক রূপ। কতরূপে ঘুষের লেনদেন হয়, শুনবে?

বলি, শোনাও।

চপলকুমার বলে, যেটুকু বুঝেছি, ঘুষ হল মোটামুটি চার প্রকার। ঘুষ-ইন-ক্যাশ, ঘুষ-ইন-কাইন্ড, ঘুষ-ইন-এক্সচেঞ্জ, ঘুন-ইন-মিউচুয়্যাল ইন্টারেস্ট।

প্রথমেই আসি ঘুষ-ইন-ক্যাশের প্রসঙ্গে। একেই বলে সরাসরি ঘুষ। যাকে সোজা বাংলায় বলে 'ব্রাইব'। যার শরীরে কেমিক্যাল লাগিয়ে কচিৎ-কদাচিৎ সরকারের দুর্নীতিদমন বিভাগগুলি কিঞ্চিৎ নাটক-টাটক করে খবরের কাগজে নাম ও ছবি ছাপায়। যা সুটকেসে ভরে নিয়ে হর্ষদ মেহতা গিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের কাছে। যা নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে কল্পনাথজী বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, যা করেছি, দেশের স্বার্থেই করেছি। নিজের বাড়ির সিন্দুকে যার খোঁজ মেলার পর সুখরামজী সুখের সায়রে ভাসতে ভাসতে আর 'ভি' দেখাতে দেখাতে জেলে গিয়েছিলেন। এটা ঘুষ খাওয়ার



একেবারে সাবেকি, ক্রুড ফর্ম। একে আবার বিভিন্ন দেশের 'সভ্য' মানুষ বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন। যেমন, স্পিডমানি, অর্থাৎ কাজটা তাড়াতাড়ি করে দেওয়ার মূল্য। শুনেছি, দঃ এশিয়ার কোনো কোনো দেশে নাকি এটা আইনগতভাবে চালু হয়ে গিয়েছে। কাটমানি, অর্থাৎ একটা কাজ করে দেওয়ার সুবাদে কন্ট্রাক্টরের যা প্রাপ্য হল, বিল পাস করার সময়ে ওই অর্থের একটা অংশ কেটে রাখা। এটাকে কেউ কেউ প্রসেসিং ফিও বলে থাকেন। আর, একেবারে উঁচু তলায় কোটি কোটি টাকার ঘুষ খাওয়াকে বলে কমিশন। যুদ্ধে মৃত ফৌজিদের জন্য শবাধার কিনতে গিয়ে জর্জ ফার্নান্ডেজ সাহেব যা খেয়েছিলেন।

এরপর আসে নন-রিফান্ডেবল লোন, অর্থাৎ ঘুষকে মনেপ্রাণে ঘেন্না করেন এমন উচ্চপদাধিকারী মানুষটি অর্থীর কাছ থেকে ঋণস্বরূপ টাকা নেন, যে টাকা তিনি কোনো কালেই শোধ করবেন না। এছাড়া রয়েছে সার্পোর্ট-ফি নামে আর এক জাতের ঘুষ লেনদেনের ব্যবস্থা। এটা হল রাজনৈতিক দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তি বা দলকে সমর্থন করবার জন্য এদেশের আধুনিক ঘোড়াগুলিকে (সাংসদ) নগদ-বিদায়, যা একবার শিবু সরেন অ্যান্ড কোম্পানি খেয়ে হজম করতে না পেরে নাকাল হয়েছিল।

এরপর আসছে ঘুষ-ইন-কাইন্ড। দামি সিগারেটের প্যাকেট, প্যান্ট-শার্টের পিস, ম্যাডামের জন্য বিলিতি পারফিউম, সাহেবের জন্য দামি স্কচের বোতল, মোবাইল-সেট, টেপ-রেকর্ডার, ভিসিডি, হিরো-হন্ডা, মারুতি জেন...।

উত্তরবঙ্গের একটি এলাকায়, শুনেছি, বিডিও বা থানার বড়বাবুর জন্য একটি আস্ত পাঁঠা

নিয়ে চলেছে অর্থী-প্রার্থী মানুষটি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে, বিডো-সাহেব (কিংবা বড়বাবু) পান খাবেন, তাই নিয়ে যাচ্ছি। এসব হল ঘুষ-ইন কাইন্ড। এটাই আরও একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফর্মে, ফ্যামিলির বেড়িয়ে আসার জন্য ট্রেন কিংবা বিমানের টিকিট, থাকার জন্য হোটেলে বুকিং, মেয়ের বিলেতে পড়ার খরচ, ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী বইবার এ-সি বাস, কিংবা প্যান্ডেল বা বউভাতের পুরো খরচটাই স্পনসর করা।

ঘুষের লেনদেনের বয়স কিন্তু ঢের। সেই বেদ-বেদান্ত পুরাণের যুগ থেকেই এর রমরমা। সে যুগের মুনিঋষিদের কিন্তু নগদে ঘুষ দিতে দেখা যায়নি। সেই ঋকবেদের যুগ থেকেই দেখছি, শস্য, বৃষ্টি, গাভী, পুত্র, ভূমি ইত্যাদির কামনায় মুনিঋষিরা, দেবতাদের নগদের বদলে এন্তার ঘি, দুধ, মদ, মাংস, এটা-সেটা জুগিয়ে গিয়েছেন। এই ঘুষ যে পুরাণের আমলেও চালু ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কাব্যনাট্যে দেখতে পাই। রেগে গিয়ে কচকে দেবযানী বলছে, কৃতকার্য হয়ে/আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা/লব্ধ মনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা/দ্বারী হস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি/মনের সন্তোষে!' আগেই বলেছি, এই জাতের ঘুষকেই বখশিস বা টিপস বলে।

আর এক ধরনের ঘুষ হল, এক্সচেঞ্জ অফ মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট। এটা আসলে ঘুষের ইমপ্রোভাইজড রূপ। রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সুগ্রীব রামকে দিয়ে দাদা বালিকে খুন করাল। শর্ত হল, তার বদলে রামকে সীতা উদ্ধারে সব রকমের মদত দেবে। গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানকে খুন করার বিনিময়ে মামা কালনেমির সঙ্গে অর্ধেক রাজ্যদানের গোপন চুক্তি করেছিল লঙ্কেশ্বর রাবণ। কিংবা তুমি আমাকে রাজনৈতিকভাবে গোপনে সাহায্য করবে, তার বদলে আমরা তোমাকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করে দেব। কিংবা আমি তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারমিটটা বের করে দেব, তার বদলে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি আমার জামাইকে একটা এক্সিকিউটিভের চাকরি দেবে। এ-সবই তো ঘুষেরই রকমফের।

এই প্রসঙ্গে আমার দু'জন সরকারি চাকুরে বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। একজন চুটিয়ে ঘুষ খান, অন্যজন যাকে বলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। তাদের নিয়ে আমাদের রগড় বেধে যায় খুবই। সেই রগড়েরই খানিকটা যথা সময়ে নিবেদন করার ইচ্ছে রইল।

Source-এর মধ্যেই ভূত

আমার এক বন্ধু আছে, সরকারি কর্মচারী, এবং চুটিয়ে ঘুষ খায়। ঘুষ যে সমাজের শরী ঘুসঘুসে জ্বরের মতো একটি ব্যাধি, এটা তার মগজে ঢুকতেই চায় না।

ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারে তার নিজস্ব একটি তত্ত্ব রয়েছে। বলে, বা-রে, আমি পাবলিকে কাজ করব, আর পাবলিক তার জন্য পারিশ্রমিক দেবে না? তাই আবার হয় নাকি?

যদি বলি, তার জন্য তো তুমি মাইনে পাচ্ছ, তো সে বলে, মাইনে পাচ্ছি চাকরি কর্রা বলে। চাকরি করবার জন্য আমাকে কতই না কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। টু থেকে থ্রি



উঠতে হয়েছে। থ্রি থেকে ফোর। এমনিভাবে ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট..., আমাকে মাধ্যমিক পাস করতে হয়েছে, গ্রাজুয়েট হতে হয়েছে, চাকরির জন্য পড়তে হয়েছে, পরীক্ষা, ইনটারভিউ দিতে হয়েছে, সবশেষে মোটা প্রণামী...। তো, স্কুল-কলেজের ফি, টিউটরের মাইনে, বইপত্তর, খাতাকলম, চাকরির জন্য ঘুষ, কত খচ্চা করতে হয়েছে ভাব দেখি। এমনি এমনি পেয়েছি চাকরিটা? মাইনে না দিলে সে চাকরি আমি করব কেন? তাই বলছিলুম, মাইনে পাচ্ছি চাকরি করি বলে। কাজ করবার জন্য টাকা না পেলে, কেন কাজ করব, বল? শোন ব্রাদার, মানো, চাই না মানো, ঘুষ হল সমাজের এক অতি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়র মতোই স্টিমুল্যান্ট। মানুষের দক্ষতা, উদ্যোগ এবং কর্মক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পাহাড়ে চড়িয়ে দেয়, অতি অলস মানুষকেও নেপোলিয়নের মতো কর্মবীর করে তোলে। গোপন কথা ফাঁস করবার ভঙ্গিতে বন্ধুটি বলে, শোন হে, ঘুষ আছে, তাই এখনও দেশটা চলছে। এখনও কাজেকর্মে সামান্য হলেও মতি রয়েছে মানুষের। ঘুষ বন্ধ হয়ে গেলে কাজের চাকাটা পুরোপুরি থেমে যাবে। মনে রেখো, চাকরিতে মাইনেটা যদি ফুয়েল হয়, তবে ঘুষ হল লুব্রিক্যান্ট। লুব্রিক্যান্ট ছাড়া মেসিন চলে? অনেক দেশে শুনেছি, ঘুষ খাওয়াটা আইনসিদ্ধ। প্রতিটি অফিসে নাকি ঘুষের চার্ট টাঙানো থাকে। লন্ড্রির রেটের মতো সেখানে নাকি অর্ডিনারি, সেমি-আরজেন্ট, আর্জেন্ট গোছের পৃথক পৃথক রেট। এদেশে যে কবে চালু হবে সিস্টেমটা! বলতে বলতে ওর গলা থেকে উথলে ওঠে হাহাকার।

ব্যাধি হোক আর স্টিমুল্যান্টই হোক, জলের সঙ্গে চিনির মতো ঘুষ আজ মিশে গিয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ইচ্ছেয়, অনিচ্ছেয়, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ঘুষ আমাদের দিতেই হয় প্রতি মুহূর্তে। ঘুষ, উপরি, বাঁ-হাতের আয়, সেলামি, টিপস, কাটমানি, কমিশন, উপহার, অফেরতযোগ্য ঋণ, স্পনসরশিপ...সমাজের বুকে কত রূপেই না তার বিচরণ! ছুটন্ত বাসের পেছনে কেউ দৌড়চ্ছে, বোঝা যায়, বাসে উঠতে না পারা এক হতভাগ্য যাত্রী। ছুটন্ত লরির পেছন পেছন দৌড়চ্ছে, চোখ মুদে বলে দেওয়া যায়, সে একজন ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশ হাত বাড়িয়ে ঘুষ খায়। কেরানি-আমলারা (টেবিলের তলায়) হাত নামিয়ে ঘুষ খায়। মন্ত্রী-নেতা দু'আঙুলে 'ভি' বানিয়ে ঘুষ খায়। জনে জনে ঘুষ খাওয়ার কতই না ভিন্ন ভিন্ন তরিকা!

ওপরতলায় ঘুষ খাওয়াকে কেন্দ্র করে যে তামাশাটা চালু রয়েছে, তার নাম তদন্ত কমিশন। আর, আমরা তো সবাই জানি, তদন্ত কথাটার অর্থ হল, তদ্+অন্ত। মানে, তাহার শেষ। অর্থাৎ কি না, বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়ে একেবারে ইতি ঘটাতে চাইলে যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়, তারই গালভরা নাম, 'তদন্ত-কমিশন'। কমিশন খাও, কমিশন বসাও। তবে, বেশ কিছুদিন আগে, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত পি ভি নরসিমা রাও মশাই, কমিশন খেতে গিয়ে সমগ্র জাতিকে একটি জটিল অঙ্কের সুমুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, কি না, একটা অ্যাটাচির মধ্যে আটষট্টি লাখ টাকা ধরতে পারে কি না। একটা পাঁচশো টাকার বান্ডিলের আয়তন যদি 'ক' হয়, এবং অ্যাটাচির আয়তন যদি 'খ' হয়, তবে 'খ' ডিভাইডেড বাই 'ক'; কত বান্ডিল হবে?

'সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। ঘুষ খেয়ে খেয়ে সবাই লাল হয়ে গেল।' প্রায়ই এহেন

হাহাকার শুনি।

প্রথমেই বলি, যে ধারণার থেকে এই কথাগুলোর উৎপত্তি, সেই ধারণাতেই কিঞ্চিৎ বিসমিল্লায় গলদ। ধাবণাটি হল, প্রায় অধিকাংশ মানুষই দুর্নীতি বলতে মূলত ঘুষ খাওয়াকেই বোঝেন। সরকারি অফিসেও লক্ষ করেছি, কে দুর্নীতিগ্রস্ত আর কে নয়, সেটা সাধারণত ওই ঘুষ নেওয়া না নেওয়ার মাপকাঠিতেই বিচার করা হয়। লোকটা কি করাপ্ট? এর জবাবে বলতে শুনি, না, না, করাপ্ট হতে যাবে কেন? কাজের জায়গায় হয়তো চরম ফাঁকিবাজ, বারোটার আগে অফিসে আসে না, চারটের মধ্যেই কেটে যায়, বিভিন্ন ব্যাপারে খুব ধান্দাবাজও বটে, বসকে তেল মেরে মেরে নিজের ছেলেটাকেও মাস্টার রোলে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ওকে কোরাপ্ট বলতে পারবে না কেউ। কেন কি, ও বাইরের লোকের থেকে এক কাপ চাও খায় না। দুর্নীতিকে এই যে ঘুষের ছোট্ট খাঁচায় আটকে রাখা, এটাকেই বলছি বিশমিল্লায় গলদ।

আরও এক কদম এগিয়ে বলি, দেশ থেকে কোরাপশন হটানোর জন্য মন থেকে এই গলদ ধারণাটিকে আগে হটানো দরকার। কারণ, এই ভুল ধারণাটি সমাজের অনেক রন্ধ্রের অনেক দুর্নীতিগ্রস্তকে জ্ঞানে-অজ্ঞানে আড়াল করে রাখে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে। তবে হ্যাঁ, ঘুষ খাওয়াটা এক কিসিমের দুর্নীতি বটে। আর ঘুষ দেওয়াটা? সেটাই বা দুর্নীতি নয় কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। ভাবুন তো, রাবণের সীতা হরণ যদি দুর্নীতি হয়, তবে সুগ্রীবের সমর্থন জোগাড় করতে রামের বালি বধও চরম দুর্নীতি। আবার, দাদাকে খুন করিয়ে তার এস্টেট আত্মসাৎ করবার জন্য রামের সঙ্গে গাঁটবন্ধন করাটাও সুগ্রীবের আরও বড় আকারের দুর্নীতি। পঞ্চপাণ্ডবকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে তাদের খুন করবার জন্য সুপারিকলার নিয়োগ করেছিল দুর্যোধন। সেই সুপারি-কিলার জতুগৃহ বানিয়ে মোক্ষম অ্যাটেমপ্ট নিয়েওছিল। পাণ্ডবদের কপাল ভালো, প্ল্যানটা ক্লিক করেনি। সেটা যদি কৌরবদের দুর্নীতি হয়, তবে জুয়ো খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বউকে দানে চড়ানোও পাণ্ডবদের আরো বড়ো দুর্নীতি। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচনে জেতা সত্ত্বেও তাঁকে ফুটিয়ে দেওয়াটাও গান্ধীজির এক কিসিমের দুর্নীতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যে ছলনায় নিজে পাণ্ডবপক্ষে থেকে গেলেন, সেটাও কৃষ্ণের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্নীতি।

ছেলে স্কুলের সহপাঠীর থেকে কলম চুরি করেছে। বাবা-মা মরমে মরে রয়েছেন। ছেলেকে বোঝাচ্ছেন মা, ছিঃ বাবা, চুরি করা একেবারেই ঠিক নয়। এবার থেকে কলমের দরকার হলে বলবে, তোমার বাপী অফিস থেকে এনে দেবেন। সরকারি অফিসে ঘুষ চেয়েছে বলে যিনি মর্মাহত, তিনিই তো জামাইয়ের উপরি আছে জেনে উল্লসিত হন। ছেলের বিয়েতে যিনি মোটা যৌতুক চান, তিনিই আবার মেয়ের বিয়ের বেলায় 'উদার মনের দাবিহীন পাত্র' কামনা করেন। কিছু খরচ করলে নিজের অকম্মা ছেলেটির চাকরি হবে জানলে যে বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তিনিই আবার অন্যের ছেলে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেল শুনলে 'দেশব্যাপী দুর্নীতি'র দুঃখে কাতর হন। লাইনে দাঁড়িয়ে মালটি পাওয়া যাবে বুঝলে যিনি লাইনের মহিমায় মুখর হন, তিনিই আবার লাইনে দাঁড়িয়ে পাওয়া যাবে না বুঝলে, লাইন ভেঙে অন্য পথের সন্ধান করেন। বেলা তিনটেয় অফিস কেটে এসে

কর্মচারীটি যদি দেখেন, রেলের টিকিট কাউন্টারের বাবুটি কোনও ধান্ধায় বাইরে গিয়েছে তো 'এইসব করাপ্ট কামচোরদের শাস্তি হয় না কেন' বলে হাহাকার জুড়ে দেন।

বলতে বলতে চপলকুমার ঠোঁট বেঁকায়, এই সমাজে দুর্নীতির হাজার গণ্ডা রূপ, বুঝলে?

বলি, বুঝলাম, কিন্তু সরকারি অফিস থেকে এই ঘুষ নেওয়াটা কবে লোপ পাবে, বলতে পার?

চপককুমার প্রাজ্ঞ হাসি হাসে। বলে, বন্ধ হবে বৈকি। আলবাৎ হবে। যদি কখনও কাঁঠাল দিয়ে আমসত্ত্ব বানানো যায়, কিংবা সোনা দিয়ে পাথরবাটি, সেদিন সরকারি অফিসেও ঘুষ বিলকুল বন্ধ হয়ে যাবে।

—মানে?

—মানে, মেটেরিয়াল যদি কাঁঠাল কিংবা সোনা হয়, তবে তা দিয়ে আমসত্ত্ব কিংবা পাথরবাটি তৈরি সম্ভব? সরকারি অফিসে ঘুষ খাওয়ার কথা বলছিলে, আসলে, যারা ঘুষ খায় কিংবা হাজার রকমের দুর্নীতি করে, তারা তো এই সমাজের ভিতর থেকেই আসছে। সমাজে সৎ অসৎ-এর অনুপাত যত, সরকারি অফিসেও সৎ অসৎ-এর অনুপাত তত হতে বাধ্য। আসলে, কারা ঘুষ খায়? কারাই বা হাজার কিসিমের দুর্নীতি করে? তাদের সোর্স অর্থাৎ উৎস কী? তারা আসছে কোত্থেকে? তার জবাবে বলতে হয়, দেশের তাবৎ মানুষই সেই সোর্স বা উৎস। আর সর্ষের ভিতরেই অর্থাৎ কি না Source-এর ভিতরই যদি ভূত থাকে...।

মাছের পচনতত্ত্ব

দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর তাই নিয়ে আলোচনাও পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে, রকে রকে, এককথায় লোকালয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কেন কি, প্রত্যেক মানুষই, এমনকী চরম দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষটিও, সমাজের দুর্নীতি নিয়ে যারপরনাই চিন্তিত। বলাই বাহুল্য, তার নিজের কর্মক্ষেত্রটি ছাড়া সমাজের অন্য প্রায় সবগুলি ক্ষেত্রেই চরম দুর্নীতি ও মাৎস্যন্যায় দেখে সে মর্মাহত, আতঙ্কিত, কণ্টকিত, শিহরিত।

যেমন, স্কুল কলেজের মাস্টার কিংবা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা ভাবেন, থানা কিংবা সরকারি অফিসগুলি, দুর্নীতির প্রশ্নে, এক একটি নরক। আবার সরকারি কর্মচারী ও পুলিশের মতে, মাস্টারদের নিজ নিজ বাড়ির সামনে জুতোর শো-রুম বানানো, ডাক্তারদের মুহুর্মুহু নার্সিংহোমে অভিসার সমাজে মূল্যবোধের কফিনে শেষ দুটি পেরেক। ব্যবসাদারদের



তো অন্য সব পেশার মানুষই ভেজালদার, মজুতদার, মুনাফাখোর, কসাই ভাবতেই অভ্যস্ত। আর, সাধারণ মানুষ, যাদের সোজা বাংলায় 'পাবলিক' বলে, তারা তো সদাসর্বদা চারপাশের সবাইকে ভিলেন ও নিজেদের সব বিষয়ে ইনোসেন্ট, অনেস্ট ও অন্যদের দ্বারা শোষিত বলে ভাবে। তার উপর সম্প্রতি সুভাষ ভৌমিক আব নটবর সিং ঘুষ নিয়ে ধরা পড়ার পর আগুনে ঘি পড়েছে। এখন তো বাস্তবিকই পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে, রকে রকে দুর্নীতি ছাড়া কোনও কথাই নেই। দুর্নীতিকে সব দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উল্টে পাল্টে, টিপেটুপে দেখে নিচ্ছে সবাই।

আমাদের হপ্তাহান্তিক আড্ডায়ও চলছিল একই আলোচনা। গোপেশ বলছিল একজন সংশোধনের অযোগ্য ঘুষখোর কনস্টেবলের গল্প। সে নাকি যেখানেই পোস্টিং পেত, সেখানেই ঘুষ খেত। এমনকী, যথেষ্ট সংখ্যক লরি না পেলে সে বাসে উঠে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারদের থেকে ঘুষ আদায় করত এই যুক্তিতে যে, বাসে স্ট্যান্ডিং বেআইনি। কিছুতেই তাকে শোধরাতে না পেরে কর্তৃপক্ষ তাকে সমুদ্রের ঢেউ গোনার দায়িত্ব দিয়ে দিঘায় বদলি করে দেন। কিন্তু সেখানে সে পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে দেয় না এই বাহানায় যে, পর্যটকরা সমুদ্রে স্নান করতে নামলে ঢেউগুলি ভেঙে যাবে। এবং সে তার ঢেউ গোনা নামক 'ডিউটি'টি করতে পারবে না। ফলত, দু'দিনের মধ্যেই পর্যটকদের সঙ্গে তার এক ধরনের রফা হয়ে যায়, এবং সে চুটিয়ে ঘুষ খেতে থাকে। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে ফিরিয়ে এনে ব্যারাকে বসিয়ে রাখে।

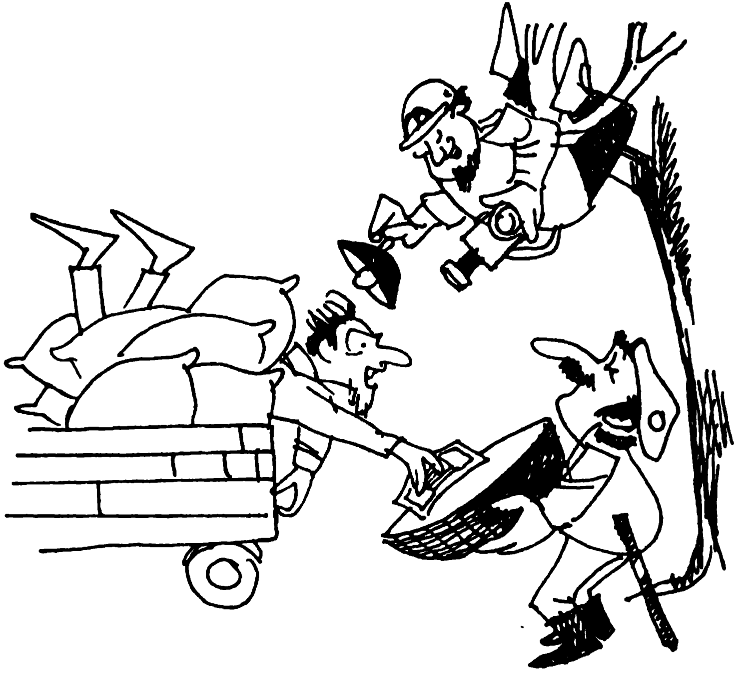
ব্যারাকে বসে বসে মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল সেপাইটি। একদিন তাকে একটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন ডাকাতের সাত বছরের জেল হয়েছিল। তিন বছরের মাথায় ডাকাতটি মাবা যায়। সেপাইটির ওপর ডাকাতের মৃত্যুসংবাদটি তার ছেলেদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সেপাইটি গ্রামে গিয়ে ডাকাতটির দুই ছেলেকে পাকড়াও করে, এবং বলে যে, তোদের বাবার সাত বছরের জেল হয়েছিল, তিন বছরের মাথায় সে মারা গিয়েছে, অতএব বাকি চার বছরের জেলটা তোদেরই খেটে দিয়ে আসতে হবে। কারণ, বাপের ঋণ তো ছেলেদেরই শোধ করতে হয়।

শেষ অবধি ডাকাতের ছেলেদের সঙ্গে একটা রফায় পৌঁছে যেতে পারে সে। এবং মোটা টাকা আদায় করে মৃত্যুর খবরযুক্ত চিঠিখানা তাদের দিয়ে সদরে ফিরে আসে।

চপলকুমার গুম মেরে শুনছিল গোপেশের কথা। ঘুষ খাওয়া সম্পর্কে তার মতামত চাইতেই তার চোখেমুখে প্রাজ্ঞভাবটি প্রকট হয়।

গম্ভীর মুখে বলে, পুরো গল্পটার মধ্যে আগাগোড়া পারসিয়ালিটি অ্যান্ড প্যারাডক্স। প্রথম কথা, কর্তৃপক্ষ সেপাইটির ঘুষ খাওয়া বন্ধ করার জন্য এমন আদা-জল খেয়ে লেগেছিল কেন? তারা নিজেরা কি এমন গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা? বরং সেপাইটি যদি চুনোপুঁটি হয়, ওরা তো এক একজন রাঘববোয়াল। সেপাইটির খাঁই যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তো ওদের খাঁই পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু দুর্নীতি নিয়ে এতাবৎ কাল যত গল্পগাথা তৈরি হয়েছে, সব পেটি কেরানি, সেপাই, কিংবা ট্রাফিক কনস্টেবলদের নিয়ে। রাঘববোয়ালরা যে দেশের তিজুরি ফাঁকা করে লুটে নিচ্ছে, সেদিকে নজর নেই, কোন এক পেটি ট্রাফিক



কনস্টেবল এক লরি ড্রাইভারের থেকে একটা পচা দু'টাকার নোট নিল, সাংবাদিক-পুঙ্গবরা ক্যামেরা বাগিয়ে সেই ছবি কাগজে ছাপিয়ে...আনফরচুনেট!

—এটাও এক মিস্ট্রি মাইরি। বিপদ বলে, থানায় থানায়, অফিসে অফিসে যেসব নিচুতলার কর্মচারীরা ঘুষ টুষ খায়, তাদের না হয় অভাব অনটন রয়েছে। কাজেই, অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু সমাজের একেবারে ওপরতলায় থাকে যারা, হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়, লাখ লাখ টাকার মালিক, তারা কেন ঘুষ খায় বল দেখি? এমনিতেই তো তারা টাকার পাহাড়ে বসে রয়েছে।

—রাইট। বাড়তি টাকা নিয়ে বাস্তবিক ওরা করবেটা কী? গোপেশ পাশ থেকে পোঁ ধরে।

চপলকুমার মুচকি হাসে। বলে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, রোগা মানুষের খিদে কম আর মোটা মানুষের খিদে বেশি। আর, রোগাদের যেহেতু খিদে কম, তারা তাই খায়ও কম। আর, কম খায় বলে তারা রোগাই থেকে যায়। অন্যদিকে, মোটা লোকেদের খিদে বেশি। ফলে, তারা খায়ও বেশি। বেশি খেয়ে খেয়ে আরও মোটা হয়। তার ফলে তাদের খিদে আরও বাড়ে। এক চোখ ছোট করে চপলকুমার বলে, ঘুষের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। নিচের তলার ফিনান্সিয়্যালি রোগা লোকেদের চেয়ে ফিনান্সিয়ালি মোটা লোকেদের খিদেটা ঢের বেশি। লাখ টাকা ছাড়া বউনিই করে না। অন্যদিকে একজন কেরানি কিংবা সেপাইকে এক সঙ্গে দুটো পাঁচশো টাকার পাত্তি ধরিয়ে দাও, সে যে ওই টাকা নিয়ে কী করবে, কোথায়

রাখবে, তাই ভেবে ভেবেই সারা হয়।

—তুমি বলতে চাইছ, বড়লোকেরাই বেশি ঘুষ খায়, গরিব বা মধ্যবিত্তরা কম ঘুষ খায়? এটা একটু ওভার সিমপ্লিফায়েড হয়ে যাচ্ছে নাকি? আমরা চপলকুমারকে মৃদু অনুযোগ করি।

আমাদের মুখের দিকে অল্পক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকে চপলকুমার। বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তা হলে একটা ঘটনা বলি। গত পরশুর ঘটনা। পদ্মপুকুরের মোড়ে একটা রোগা মতো ট্রাফিক কনস্টেবলের সঙ্গে কিছুদিন ভাব হয়েছে আমার। সম্পর্কোটা খইনি চালাচালি অবধি পৌঁছেছে। খইনি ডলতে ডলতে ইদানীং গল্পগুজব চলে আমাদের।

—ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে গল্পগুজব? আমরা হেসে কূল পাইনে।

—কী বিষয়ে গল্পগুজব হয়?

চপলকুমার স্মার্টলি বলে, সব বিষয়ে, যাকে বলে সমাজের সর্ব বিষয়ে, আলপিন টু এলিফ্যান্ট। তবে গত পরশু হচ্ছিল কোরাপসন নিয়ে।

—আই ব্বাস। আমরা সবাই শুনতে শুনতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কোরাপশন নিয়ে আলোচনা? না, মানতেই হচ্ছে, তোমার এলেম রয়েছে।

চপলকুমার ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ বুঝি। বলে, কোরাপশনের প্রসঙ্গটা আমি তুলিনি। দেখা হতে ওই তুলল। বলল, পেপার পড়েছেন তো? ইস্, এদিকে সুভাষদা, ওদিকে নটবর, কী কাণ্ডটাই না করল!

আমি ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করি, ওই টাকা আপনাকে দিতে চাইলে কী করতেন?

—আমাকে? বলতে বলতে সেপাইটি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একসময় দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলে, আমাকে আর কেই বা অত অত টাকা অফার করবে! ওসব বড় মানুষদের জন্য। আমি শালা দু'দশ টাকার খদ্দের।

বলি, আচ্ছা অত টাকা নয়, ধরুন, যদি কোনও ট্রাকওয়ালা আপনাকে দুশো টাকা অফার করে?

—রিফিউজ করব মশাই।

—কেন?

—করব না? শালাদের পাঁচটাকা দিতেই গায়ে জ্বর আসে। ওরা কিনা দেবে দুশো টাকা!

—তবুও যদি দিতে চায়?

—নেব না মশাই। টাচই করব না। ধরিয়ে দেবার ফাঁদ-টাদ হতে পারে ওটা। কেমিকেল-টেল লাগিয়ে টাগিয়ে...।

—আর ধরুন, একটা নোটভর্তি ব্যাগই এনে নামিয়ে দিল আপনার সামনে, তখন?

—স্রেফ দৌড়ে পালাব।

—কেন?

—কেন আবার, ব্যাগের মধ্যে বোমাটোমা থাকতে পারে। ফেটে গেলেই ফক্কা।

বলতে বলতে চপলকুমারের সারামুখে দার্শনিকের প্রাজ্ঞতা ফুটে ওঠে। বলে, জানোই তো, মাছের পচন মাথা থেকেই শুরু হয়। এই মানবসমাজটা হল মাছের মতোই। শুধু শুধু তোমরা কেরানি-সেপাইদের গালমন্দ করছ ব্রাদার।

পাঠক=পা-ঠকঠক

ফি-বছর বইমেলায় ভিড় দেখলে পুস্তকপ্রেমীদের প্রাণ পুলকে নেচে উঠতে বাধ্য, কি না, তলে তলে কত পাঠক রয়েছে এই সংস্কৃতির পীঠভূমি বঙ্গে!

শুনে তো আমাদের চপলকুমার হেসেই খুন। বলে, 'পাঠক' শব্দের মানে জান? পড়ার কথা বললে যাদের পা ঠকঠক করে কাঁপে, তাদেরই বলে পা-ঠকঠক, সংক্ষেপে পাঠক।

চপলকুমারের কোনও ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই। তার সোজাসাপটা কথা, 'ইদানীং আর কেউ কিস্যুটি পড়ে না'। তার মতে, চাকরি পাওয়ার আগে অবধি বারোআনা 'শিক্ষিত' বাঙালি যা-যেটুকু পড়েছিল, চাকরিটি পেয়ে যাওয়ার পর স্রেফ খবরের কাগজ ছাড়া আর কিস্যুটি পড়ে না। তাও আবার খবরের কাগজের ভারি-সারি প্রবন্ধ-টবন্ধ নয়, পড়ে কেবল



'কুপিয়ে খুন', 'নাবালিকাকে ধর্ষণ', কিংবা নেতা-নেত্রীদের ছ্যাবলামো কথাবার্তা। আর কেউ কেউ খেলার পাতাটা।

আমার এক এম-এ পাস বন্ধু, মেসে থাকে, ফি-সকালে খবরের কাগজটি এলেই সবার আগে ছোঁ মেরে নেয়। কেউ তাই নিয়ে গোঁসা করলেই বলে, মাত্র দু'মিনিট ব্রাদার, আমি ব্যভিচারগুলো দেখে নিয়েই ছেড়ে দেব।

আসলে, এক্কেবারে 'গপ-সপ' মার্কা খবরগুলিরই বারোআনা পাঠক, একটু ভারির দিকে যেতে বললেই পা-ঠকঠক।

কিন্তু তা বলে সেটা কী সর্বসমক্ষে স্বীকার করা চলে? লোকে কী বলবে? কাজেই, পড়াশোনার প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁরা প্রথমেই বলে দেন যে, তেমন লেখালিখি আর হচ্ছে কই? বিরক্তিতে ভাই পড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

তবুও যাঁরা পড়েন-টড়েন বলে দাবি করেন, তাঁরাও যে ঠিক পড়েন, তা নয়। এ যুগের সেই আগমার্কা পাঠকরা পড়েন না, 'দেখেন'।

—তোমার লেখাটা দেখলাম।

আরও খানদানি পাঠক হলে তাঁরা আবার বড়ই ভুলো মন হন। তোমার লেখাটি কোথায় যেন দেখলাম?

জোসেফ হিলারি বেলোর মতে, 'কিছু লেখা চাখতে হয়, কিছু লেখা গিলতে হয়, কিছু লেখা চিবিয়ে খেয়ে হজম করতে হয়।' কিন্তু কিছু লেখা স্রেফ 'দেখতে' হয়, এমন কথা তো কেউই বলেননি। শুধু এদেশেই কি? শুধু এ যুগেই কি? টি-এস-ইলিয়ট বলেছিলেন, 'এই দুনিয়ায় বহু মানুষ স্রেফ রেসের বই ছাড়া আর কিছুই পড়ে না।' এর দ্বারা বোঝা যায়, পশ্চিমী বিদ্বান দেশগুলিতেও না-পাঠকের সংখ্যা কিছু কম নয়। এবং এই কিস্যু না পড়া রোগটা সাম্প্রতিককালের নয়, ইলিয়টের সময়ও ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যাদের পাঠক বলে জানি, চিনি, তাদের মধ্যেও রকমফের রয়েছে। বাস্তবিক, এই পাঠকদের দুনিয়ায় কে যে দৈত্য, আর কে যে দৈত্যকুলে-প্রহ্লাদ নিরূপণ করা খুবই কঠিন।

এই প্রসঙ্গে আমার এক অতি শ্রদ্ধেয় মানুষের কথা মনে পড়ছে। সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটি মাপতে না পেরে বহুকাল যাবৎ বারংবার হতবুদ্ধি হয়েছি আমি। তাঁর বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল ঈর্ষণীয় সংগ্রহ। আমি গেলেই তিনি সেসব দেখাতেন আমাকে। আর সভা-সমিতিতে কিংবা ব্যক্তিগত আলাপচারিতে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধৃতি বলতেন মুড়ি মুড়কির মতো। এইসব কারণে, সেই ছেলেবেলা থেকে উত্তর-যৌবন অবধি তাঁকে একজন ভোরেসাস রিডার বলে জানতাম। খুব সম্প্রতি ঝুলির ভেতরের বেড়ালটাকে আচমকা দেখে ফেলেছি। কথা প্রসঙ্গে আমার সম্প্রতি পড়া একটি বইয়ের থেকে পর পর তিন চারটি উদ্ধৃতি দিতে দেখে ভদ্রলোকের সঙ্গে বইটি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবার ইচ্ছে হল। আর, তা করতে গিয়েই বুঝতে পারি, বইটি তিনি মোটেই পড়েননি। এমন কি, বইটির বিষয়বস্তুও তাঁর জানা নেই। তিনি কেবল ওই বই থেকে কিছু কোটেশন মুখস্থ করে রেখে দিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝেই আমার রোখ চেপে গেল। একেবারে রবীন্দ্রনাথের গোরা, চোখের বালি, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ গোছের বহুপাঠ্য উপন্যাস নিয়ে আলোচনা

করতে গিয়েও অনুভব করি, উপন্যাসগুলো তিনি আদপেই পড়েননি। এমন কি, ওগুলোর কাহিনি সম্পর্কেও প্রায় অজ্ঞ। কেবল প্রত্যেক বইয়ের থেকে গোছা গোছা কোটেশন নিয়ে ভরে রেখে দিয়েছেন স্মৃতির ব্যাঙ্কে। দেখতে দেখতে আমি হতবাক। তারপর থেকে বক্তৃতার মধ্যে বেশি কোটেশন আওড়ালেই আমার সন্দেহ হয়, 'কোটেশন পণ্ডিত' নয়তো?

যাটোর্ধ্ব শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এখনও খুব পড়াশোনার গুমোর। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তোলেন। রবীন্দ্রসমুদ্রে যে-জন ডুব দেয়নি, তার জীবনটাই বৃথা রে ভাই। সেই যে, আজি এ প্রভাতে রবির কর..., কিংবা ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত..., কিংবা ধর...শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভূঁই...। রবীন্দ্রসাহিত্য সব পড়া কি সহজ কথা রে ভাই? তবে হ্যাঁ, তা বলে কম পড়িনি। এই ধর, একথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর সাজাহান..., কিংবা আজি হতে শতবর্ষ পরে...কে তুমি পড়িছ বসি..., কিংবা, আমি...পরানে...র সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা..., নিশীথবেলা...আ-হা...।

বলতে বলতে রবীন্দ্রসাহিত্য 'গুলে খাওয়ার' গুমোরে ফুলে ফুলে ওঠে ভদ্রলোকের নাকের পাটা।

অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মটির আবার দেশি লেখায় মন ভরে না। সারাক্ষণ বিদেশি লেখা কপচাচ্ছে, অথচ একটু চেপে ধরলেই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখাগুলো চেখে দেখা তো দূরের কথা, চোখেও দেখেনি।

বই পড়ার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মুনির নানা মত।

এ হাক্সালের মতে, 'বই পড়া হল মানবজাতিকেই পাঠ করা'।

'বই পড়ার প্রতি আমার চিরকালের অনুরাগ, আমি তা ভারতের তাবৎ ধনসম্পদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারব না'। বলেছেন এডোয়ার্ড গিবন।

জি সি লিচেনবার্গের মতে, 'বইয়ের চেয়ে বিস্ময়কর সামগ্রী আর কিছুই নেই'।

সিডনি স্মিথ বলেছেন, 'বইয়ের চেয়ে সুন্দর আসবাব আর হয় না'।

'বই পড়া হল মনের ব্যায়াম', বলেছেন স্যার রিচার্ড স্টিল।

অন্যদিকে বই পড়ার বিরুদ্ধেও মতামতের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন, বেশি পড়াশুনোর নেশা থাকলে মানুষ নাকি অসামাজিক হয়ে যায়। সে নাকি সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে তার আত্মীয়-বন্ধুদের পেয়ে যায়।

জি জি বায়রন তো বলেই ফেললেন, আমি যদি সব সময় বই পড়ে কাটাতে পারতাম, তবে আর আমার কাছে সমাজের কোনও প্রয়োজনই থাকত না।

মার্টিন লুথারও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, বইয়ের আধিক্য খুবই ক্ষতিকর।

এহ বাহ্য। খোদ বাইবেলে বলেছে, দুনিয়ায় বইয়ের তো অন্ত নেই, তবে অত্যধিক পড়াশোনা মানেই শরীরটাকে (অকারণে) ধসিয়ে ফেলা।

বই পড়ার আবার রকমফের রয়েছে। জি চেস্টারটনকে অনুসরণ করে বলি, কেউ বা একটা বই পড়তে চায়, কেউ বা পড়ার জন্য একটা বই চায় (Eager man wants to read a book, tired man wants a book to read)।'

'বই অন্তত এক বছরের পুরনো না হলে পড়ো না', বলেছেন আর ডব্লু এমারসন। কেন এমন উপদেশ? পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, পুরনো মদের স্বাদ বেশি, পুরনো শালের

আভিজাত্য বেশি। কিন্তু পুরনো বই পড়লে কোন হিস্লেটা হয়?

এদেশে, দেখতে পাই, অনেকেরই একেবারে বইঅন্ত প্রাণ। বই কিনে সাজিয়ে রাখাটা তাদের নেশা। সেই বইগুলি সে ঝাড়ে, মোছে, ঝকঝকে রাখে, প্রাণ দিয়ে আগলে রাখে, কিন্তু পড়ে কদাচিৎ। উইলিয়াম কপারকে স্মরণ করি, 'যে কখনই পড়ে না, সে বইকে দিনে হাজারটা চুমো খায়।'

সেই মহিলার কথা মনে পড়ছে। তকতকে করে সাজিয়ে রাখা বইয়ের আলমারির সামনে এসে একদিন হঠাৎ এক আত্মীয় একটি বই পড়বার ইচ্ছে প্রকাশ করে বসে। বাধ্য হয়ে মহিলা বইটি তাকে দেন, কিন্তু গভীর রাত অবধি জেগে জেগে আত্মীয়র ঘরের সামনে পায়চারি করতে থাকেন। বইটি পড়া শেষ হলে আলমারিতে ঢুকিয়ে তবে শুতে যাবেন, কেন কী, বই তাঁর প্রাণ।

আমাদের দেশে তো 'শ্রীমদভাগবতগীতা' নামক ধর্মপুস্তকটি পঠিত হওয়ার চেয়ে পূজিতই হয় বেশি। কত মানুষের ঠাকুরঘরে যে গীতা স্রেফ চন্দন-সিন্দুরে মাখামাখি হয়ে শোভা পায়, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। আর ধ্রুপদী সাহিত্যের পাঠ? এ বিষয়ে মার্ক টোয়েন ভালই বলেছেন, 'ধ্রপদী রচনা হল তাই, যা সবাই পড়া উচিৎ বলে মনে করে, কিন্তু কেউই পড়ে না'।

সবশেষে, একজন পাঠকের কথা না বললেই নয়। ভদ্রলোক একটি লাইব্রেরির মেম্বার। এতক্ষণ বাঙালির না-পড়াকে ব্যঙ্গ করে যা-সব হা-হুতাশ করলাম, তা সুদে-আসলে উশুল করে দিয়েছেন এই একজন মাত্র পাঠক। যাকে বলে, একাই একশো। ইংরেজি 'ভোরেসাস রিডার' শব্দযুগলের জীবন্ত রূপ ধরে তিনি রোজ দিনই হাজির হন লাইব্রেরিয়ানের কাছে। সঙ্গে থাকে আগের দিন নেওয়া ঢাউস উপন্যাসটি। এসেই অমনি বায়না ধরেন, একটা মোটা গোছের বই দিন না মশাই, ক'দিন একটু জুত করে পড়ি। লাইব্রেরিয়ান তো তাজ্জব, কেন কি, যে ঢাউস উপন্যাসটা তিনি আগের দিন ইস্যু করেছিলেন, তা পড়ে শেষ করতে অন্তত এক হপ্তা তো লাগা উচিৎ। যা হোক, সহৃদয় লাইব্রেরিয়ান তাঁর ভাঁড়ার থেকে যত রাজ্যের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম। দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ঠেলা দিয়ে বইলাম' মার্কা উপন্যাসগুলো একে একে ইস্যু করতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, পরের দিনই বইটি ফেরৎ দিয়ে পাঠক-ভদ্রলোক সেই একই বায়না ধরেন, কিনা, দিন না একটা মোটা গোছের বই, ক'দিন একটু জুত করে পড়ি। লাইব্রেরিয়ান দু'চোখ আকাশে তুলে বলেন, দুনিয়ার দ্রুততম পাঠক হিসেবে আপনার নাম তো গিনেস বুকে ওঠা উচিৎ মশাই।

অবশেষে, লাইব্রেরির সমস্ত মোটা বই ফুরিয়ে গেলে পর, লাইব্রেরিয়ান অনন্যোপায় হয়ে কোলকাতা টেলিফোনের ডাইরেক্টরিটাই ইস্যু করলেন ভদ্রলোককে।

বইটির কলেবর দেখে বেশ আশ্বস্ত দেখাল ভদ্রলোককে। পাক্কা সাতদিন আর দেখা নেই তাঁর।

সাতদিন বাদে যখন ওটা ফেরৎ দিতে এলেন, লাইব্রেরিয়ান শুধোলেন, কেমন লাগল বইটা?

পাঠক ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ভালোই। তবে অনেক ক্যারেক্টার তো, সবাইয়ের নাম মনে রাখা মুশকিল।

বই কেনা

ফি-বছর বইমেলার মরসুমটি এলেই কথাটা খুব মুখে মুখে প্রচার পেয়ে যায়। কি না, দিনদিন বইয়ের যা দাম বাড়ছে, মধ্যবিত্তের নাগালে একেবারে বাইরে চলে যাচ্ছে বই।

সত্যিই তো, মধ্যবিত্তই তো এদেশে বইয়ের প্রধান ক্রেতা। বইয়ের দাম যদি তাদেরই নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে বইয়ের বিকিকিনি বাড়বে কী করে?

সৈয়দ মুজতবা আলি বলেছেন, বইয়ের দাম বেশি বলে বিক্রি কমে যাচ্ছে, আবার বিক্রি বাড়ছে না বলেই প্রকাশকদের পক্ষে দাম কমানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই, লাখ টাকার প্রশ্নটা হল, বইয়ের দাম কমলে বিক্রি বাড়বে, না কি বিক্রি বাড়লে দাম কমবে? ওই, 'মুরগি আগে, না ডিম আগে'-র রগড়। ওই রগড়ের মধ্যে না ঢুকে বরং দেখা যাক, বইয়ের দাম সত্যি সত্যিই বাড়তে বাড়তে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে কি না।

চপলকুমারকে শুধোতেই সে আমাদের এক চিলতে অর্থপূর্ণ হাসি উপহার দেয়। বলে, শুধু বইয়ের কথা উঠছে কেন? বাজারে কোন জিনিসটার দাম বাড়েনি শুনি? তা বলে সেসব



জিনিস কি মধ্যবিত্তরা কিনতে কিছু বাকি রাখছে? ধর, এক কেজি উচ্ছের দামই তো তিরিশ টাকা। এক কেজি প্যাকেট-নুন আট টাকা। কিনছি তো। এক কেজি উচ্ছের দামে একটা কবিতার বই আজও কিনতে পাওয়া যায়। এক কেজি নুনের দামে একটা চটি লিটল ম্যাগ। এক কেজি পাঁঠার মাংসেরর দাম একশো ষাট টাকা। মাসের মধ্যে একটা মাত্র রোববারে মাংসের পাট তুলে দিলে ওই টাকায় এখনও দু'দুটো উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধের বই কেনা যায়। ভাবতে পার, এখনও সত্তর-পঁচাত্তর টাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমগ্র, সুকান্ত সমগ্রসহ একাধিক ধ্রুপদী উপন্যাস কেনা যায়!

বলি, খাবার-দাবার না কিনে ওই টাকায় বই কেনা, মধ্যবিত্তর কাছে দাবিটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি? শাকসবজি, চালডাল, মাছ মাংস, নুন-তেল, এসব হল যাকে বলে 'নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী'।

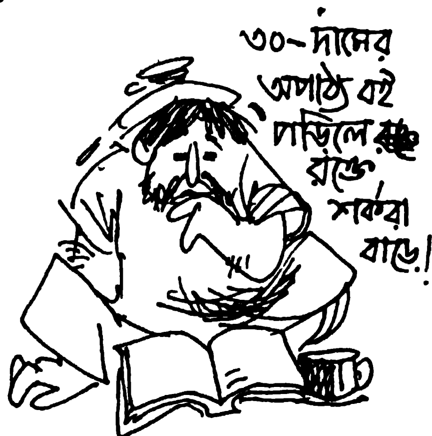
চপলকুমার গম্ভীর মুখে বলে, বেশ তবে শোন, একটা ছোট্ট সাইজের কোল্ড ক্রিম কিংবা শ্যাম্পুর শিশি কিংবা একটা বিলিতি বিউটি সোপের দাম তিরিশ টাকার কম নয়। এ ছাড়া পাউডার-স্নো, লিপস্টিক, নেলপালিশ জাতীয় প্রসাধন সামগ্রীর এক-একটি ছোট্ট ফয়েলের দামও তো কম নয়। এ ছাড়া হরেক কিসিমের হোয়াইটনার, ফরসা হওয়ার, মসৃণ হওয়ার, সুন্দর হওয়ার ক্রিম-মলমগুলো তো আকাশছোঁয়া দামে মুড়ি-মুড়কির মতো বিকোচ্ছে। ওদের যে কোনও একটার দামে দুটো পাঁচ ফর্মার বই নির্ঘাৎ কেনা যায়। তারপর ধর, পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লারগুলো কেমন রমরমিয়ে চলে, দ্যাখো তো। জান কি, একটিবার মুখখানাকে সাফসুতরো করতে (ফেসিয়াল) কিংবা হাত-পায়ের নখ-টখ কেটে-কুটে সাফসুতরো (যথাক্রমে ম্যানিকিয়োর ও পেডিকিয়োর) করতে যা খরচ পড়ে, তাতে করে ঝকঝকে মলাটসহ একখানা দেড়শো পৃষ্ঠার বই অনায়াসে কিনে ফেলা সম্ভব। মধ্যবিত্ত আজ হরবখত বিউটি পার্লারে ছুটছে। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সব্বাই। শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু স্রেফ রূপচর্চার অলীক মায়ায় ফেঁসে গিয়ে আজকাল রোজ যতটা শসা, টম্যাটো, কলা, মাখন, দুধের সর, মসুরির ডাল, বেসন ইত্যাদি খরচ হয় মধ্যবিত্তের সংসারে, স্রেফ হাতে-পায়ে-মুখে মাখার জন্য, ওই টাকায় বেশ ভাল সংখ্যক বই কেনা চলে। কেবল বইয়ের বেলাতেই দাম বেশি, পয়সার অভাব? ফি-পুজোয় আর 'চৈত্রের সেল'-এর মরসুমে কেমন ধস্তাধস্তি ভিড় হয়, দ্যাখ তো। বড়লোকদের কথা বলছিনে, মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়ে, বউ-ঝিরা প্রত্যেকে ক'সেট করে পোশাক কেনে, দ্যাখনি? তার থেকে মাত্র এক সেট কমিয়ে ফেললেই একটা অমনিবাস বা ধ্রুপদী সাহিত্যের সমগ্র হয়ে যায়।

চপলকুমারের কথার ফাঁকেই একটা সিগারেট ধরায় গোপেশ। সঙ্গে সঙ্গে চপলকুমার বলে ওঠে, আর একটা উদাহরণ বাড়ল। গোপেশের মতো হাজারে হাজারে মানুষ সিগারেট খায়। রোজ কমপক্ষে দশটা। আজকাল একটা মাঝারি মানের সিগারেট টাকা দেড়েকের কমে হয় না। তার মানে দিনে পনেরো টাকা।

—তুমি কি আমাকে বই কেনার জন্য সিগারেট ছাড়তে বলছ নাকি?

—আরে, না না। জিভ কেটে চপলকুমার বলে, তা কি বলতে পারি? দেশের ক্যানসার ইনস্টিটিউটগুলো তা হলে বসে বসে মাছি তাড়াবে যে! আমি কেবল বলছিলাম, রোজ





মাত্র একটা সিগারেট কম খেলে ওই টাকায় ফি-মাসে একটা করে মাঝারি সাইজের উপন্যাস কিংবা কবিতার বই কিংবা প্রবন্ধের সঙ্কলন কিংবা একটা ঢাউস সাইজের লিটল ম্যাগ তাদের যাবতীয় আবেগ-উষ্ণতা নিয়ে চলে আসতে পারে তোমার হাতে।

আমরা চপলকুমারের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতে না পেরে চুপ মেরে যাই। তাই দেখে চপলকুমারের জোশ বেড়ে যায় বুঝি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে দমদম স্টেশনের কাছে পুলিশ এক মাতালকে ধরেছিল। পুলিশটির সম্ভবত একটুখানি সমাজসংস্কারের বাতিক ছিল। কাজেই লাঠিপেটা করতে করতে থানায় না নিয়ে গিয়ে সে মাতালটাকে সর্বসমক্ষে বোঝাতে শুরু করে, কি না, মদ খেতে যা খরচ হয়, তাতে করে সপরিবার ডিম ও দুধ খাওয়া চলে। দুধ খেলে শরীর কত ভালো হয়। মাতালটি সুবোধ বালকের মতো অনেকক্ষণ ধরে পুলিশের উপদেশামৃত পান করে। একসময় জড়ানো গলায় বলে, ডিম-দুধ খাওয়া তো যায়ই, কিন্তু ডিম-দুধে নেশা হয় না যে।

আসলে, বইয়ের অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে বলে যে শোরগোল উঠেছে চতুর্দিকে, তার

চোদ্দোআনাই মানসিক। যে কোনও কারণেই হোক, মধ্যবিত্ত মানুষের একটা বড় অংশের কাছে বই তার প্রায়োরিটি হারাচ্ছে দিন দিন। বইতে আর তেমন নেশা হচ্ছে না তাদের। সম্ভবত, বোকাবাক্স বা সমতুল অন্যত্র তাঁরা আরও জব্বর নেশার খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন। সেই কারণেই, 'give the dog a bad name and kill him' থিয়োরি প্রয়োগ করে তাঁরা বইয়ের গায়ে 'অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি'র তকমাটি লাগিয়ে দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করছেন।

মধ্যবিত্তের জীবনে আগে ছিল বউ আর বই, এখন হয়েছে টিভি আর বিবি। নইলে, বাজারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন, কেবল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীই নয়, নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় এমন কি কাঁড়ি কাঁড়ি পরিত্যাজ্য ভোগ্যসামগ্রীর দাম যে হারে বেড়েছে বা বাড়ছে, বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির হার, সাধারণভাবে, তাদের চেয়ে কমই।

চপলকুমার বলে, মধ্যবিত্তের জীবনে বইয়ের প্রায়োরিটি কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তাই নিয়ে একটা গল্প শোনাই। এক মধ্যবিত্ত গৃহিণী তাঁর স্বামীর জন্মদিনে তাঁর জন্য একটা উপহার কিনতে একটা শপিং মল-এ ঢুকেছেন। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা দেখায়। ঘড়ি, ঘড়ির ব্যান্ড, টাই, সিগারেট কেস, বিদেশি লাইটার, বাহারি পার্স...। গৃহিণী কেবলই নাক সিঁটকান, এসব তো ওঁর গাদা গাদা রয়েছে। শেষ অবধি দোকানদার বলে, তা হলে একটা ভাল বই নিয়ে যান। তার জবাবে গৃহিণী নাক সিঁটকে বলেন, সেটাও তো ওঁর তিন-চারখানা রয়েছে।

—বইয়ের ব্যাপারে আমার ভাই অন্য থিয়োরি। পাশ থেকে বলে ওঠে বিপদ।

—কোন থিয়োরি, শুনি। আমরা হইহই করে উঠি।

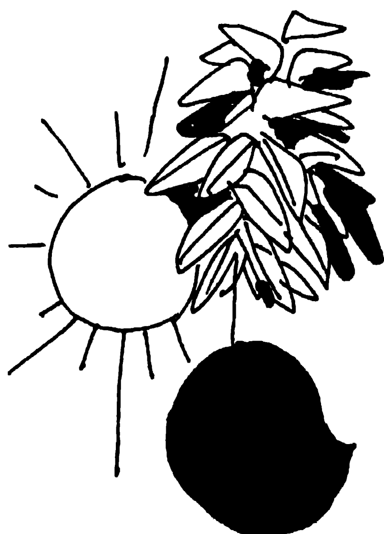
—এ ব্যাপারে আমি ভাই চিরকালই মার্ক টোয়েনের থিয়োরিতে বিশ্বাসী। থিয়োরিটা শুনবে? বিপদ নড়েচড়ে বসে,—তবে মার্ক টোয়েনের নামে চালু একটা গল্পই শোনাই তোমাদের। মার্ক টোয়েনের সারা বাড়ি জুড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি বই স্তূপাকারে ডাঁই হয়ে থাকত। বলা যায়, সারা বাড়ি জুড়ে রাশি রাশি বইয়ের পাহাড়। দেখতে দেখতে একদিন ওঁর এক বন্ধু ওঁকে বললেন, এত দামি দামি বই মেঝের উপর পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, কিছু আলমারি এনে তার ভিতর যত্ন করে সাজিয়ে রাখ না কেন? তার জবাবে মার্ক টোয়েন মুচকি হেসে বললেন, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে বইগুলো যে উপায়ে এসেছে, আলমারিগুলো ওই উপায়ে আনা যায় না যে।

গল্পটা শেষ করে বিপদও মুচকি হাসে। এক চোখ ছোট্ট করে বলে, আমিও মার্ক টোয়েনের ফলোয়ার ভাই। যেখান থেকে পারি, বই ঝেড়ে আনি। ওই নিয়ে আমার বিশাল কালেকশন। পকেটের পয়সা খসিয়ে বই কিনতে যাব কোন দুঃখে?

চপলকুমারের সম্‌স্‌স্কৃতিচর্চা

আমাদের সবজান্তা বন্ধু চপলকুমার সম্প্রতি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাতে মন দিয়েছে।

আপাতত কবিতা চর্চাতে মতি হয়েছে তার। তার উপর সিনেমা ও চিত্রকলা নিয়েও নাকি চর্চা চালাচ্ছে। সে সবের স্যাম্পল এখনও পেশ করেনি আমাদের সামনে। কেবল ওর স্বরচিত কবিতাতেই আমরা কাত। দিনরাত গাদা গাদা কবিতা লিখছে, আর আড্ডাতে এসে সেইসব কবিতা আমাদের জবরদস্তি শোনাচ্ছে। আমরা এখন তো দস্তুরমতো ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। আরও ভয়ের কথা, ইদানীং রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে নিজের কবিতাকে তুলনা করতে গিয়ে পদে পদে কবিগুরুর কবিতার ভুলও ধরতে শুরু করেছে সে।



আমের ছায়ায়
বিছায় শয়ান...।



সেদিন আড্ডায় এসেই চপলকুমার বলল, বুঝলে, রবীন্দ্রনাথকে যতই পড়ছি, ততই অবাক লাগছে। এত বড় বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাধু-চলতির প্রাথমিক জ্ঞানটাও ছিল না! লিখেছেন কি না, 'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম!' আরে, হয় তুমি লেখ, 'রূপনারায়ণের কূলে জাগিয়া উঠিলাম' নয়তো লেখ, 'রূপনারানের কূলে জেগে উঠলাম'। কী কেলো বল দেখি! এখানেই এদেশের কবিদের সঙ্গে শেলি, কিটস, বায়রন, লোরকা, নেরুদা, বোদলেয়ারদের তফাত।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। এমন কথার যে কী জবাব দেব, ভেবে পাইনে।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে চপলকুমার বুঝি উৎসাহ পায়। পশ্চিমের কাব্যতত্ত্ব নিয়ে লেকচার শুরু করে। পোস্ট কলোনিয়ালিজম, পোস্ট রোমান্টিসিজম, ম্যাজিক রিয়েলিজম, পোস্ট মডার্নিজম, একজিস্টেন্সিয়ালিজম ইত্যাদি বিষয়গুলি একেবারে ছাত্রজ্ঞানে বোঝাতে শুরু করে। আমাদের বুক টিপটিপ করতে থাকে, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

অবশেষে আমাদের আড্ডার প্রবীণ সদস্য বিপদভঞ্জনই আমাদের বাঁচায়।

বলে, তোমার কথা শুনছি, তার আগে একটা ঘটনার কথা বলি।

বহুকাল আগের কথা। তখন প্রমথেশ বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার। বড়ুয়া সাহেব ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারী মানুষ। তিনি যতক্ষণ নিউ থিয়েটার্সে থাকতেন, অভিনেতা থেকে টেকনিশিয়ান অবধি সকলেই একেবারে তটস্থ হয়ে থাকত। আর্ট সম্পর্কে খুব গভীর জ্ঞান ছিল বড়ুয়া সাহেবের। ছবিতে আর্টের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর ওপর কথা বলতে সাহস পেত না কেউই।

তো, কিছুদিন হল নিউ থিয়েটার্সে একজন তরুণ টেকনিশিয়ান এসেছে। কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে এক নম্বরের আঁতেল সে। কথায় কথায় ইউরোপের শিল্পভাবনা, পশ্চিমের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে লেকচার দেয়। সুরোরিয়েলিজম, স্ট্রাকচারেলিজম, আরও কত কত দাঁতভাঙা শব্দ যে সারাক্ষণ সহকর্মীদের কাছে কপচায়! সহকর্মীদের প্রতি খুবই নাক উঁচু ছিল ছোকরা। মাঝে মাঝেই বয়স্ক টেকনিশিয়ানদের শিল্পবিষয়ক এমন সব কঠিন প্রশ্ন শুধিয়ে বসত, সহকর্মীদের একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা। মুচকি হেসে ছোকরা বলত, আপনারা সব আর্টের প্রশ্নে ইউরোপের থেকে অন্তত একশো বছর পিছিয়ে রয়েছেন। সেই মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণা নিয়ে কি আর মডার্ন সিনেমা হয়? কাজেই, সহকর্মীরা ওকে মনে মনে সমীহ করত খুবই। ভয়ও পেত। কি.না, আচমকা সবাইয়ের সামনে কী-না-কী শুধিয়ে লজ্জায় ফেলে দেয়! সবচেয়ে মারাত্মক কথা, সে আড়ালে আবডালে বড়ুয়া সাহেবের শিল্পজ্ঞান নিয়েও কটাক্ষ করত। ছোকরা যে সারা স্টুডিও জুড়ে একেবারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা অল্পস্বল্প বড়ুয়া সাহেবের কানেও গিয়েছে।

একদিন নিউ থিয়েটার্সে শুটিংয়ের পর লাঞ্চের ব্রেক চলছে। বড়ুয়া সাহেব নেই বলে সারা স্টুডিও জুড়ে এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব। এমনি সময়ে বড়ুয়া সাহেবের গাড়ি ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা নিউ থিয়েটার্স জুড়ে পিন-ড্রপ সাইলেন্স।

বড়ুয়া সাহেব গটমট করে চলে গেলেন তাঁর ঘরে। তখন যে ছবিটার শুটিং চলছিল,

তার নাম 'শাপমুক্তি'। বড়ুয়া সাহেবই পরিচালক। কাজেই, স্টুডিওতে ঢুকেই বড়ুয়া সাহেব ছবিটার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের একে একে ডেকে পাঠালেন।

একে একে ছবির ক্যামেরাম্যান, গীতিকার, শিল্প নির্দেশক, সহকারী পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। ওই আঁতেল ছোকরা তখন শিল্প-নির্দেশকের সহকারী হিসেবে কাজ করছে। শিল্প নির্দেশকের পিছু পিছু সেও ঢুকেছে।

বড়ুয়া সাহেব সবাইয়ের উপর একবার দৃষ্টির তুলি বুলিয়ে নিলেন। একসময় তাঁর চোখ আটকে গেল গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের উপর। বললেন, নতুন গানটা লেখা হয়েছে?

অজয়বাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—দেখি। বড়ুয়া সাহেব গান লেখা কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন একমনে।

সারা ঘর নিস্তব্ধ। সবাই কেবল পাঠরত বড়ুয়া সাহেবের মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে চলেছে। বড়ুয়া সাহেবের ভুরুতে ভাঁজ পড়লে সবাইয়ের ভুরুতে ভাঁজ পড়ছে, বড়ুয়া সাহেবের ভুরুর ভাঁজ মোলায়েম হয়ে গেলে সবাইয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। আর, গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের তো বলির পাঁঠার মতো হাল। পাথরের মতো শক্ত মেরে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পড়া শেষ হল বড়ুয়া সাহেবের। মুখ তুলে তাকালেন তিনি। একেবারে ভাবলেশহীন মুখ। মুখ দেখে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া বোঝার তিলমাত্র জো নেই। একটুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর একে একে উপস্থিত সবাইয়ের মুখের উপর দিয়ে ধীরগতিতে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন দৃষ্টি। একসময় ওই তরুণ শিল্পবোদ্ধাটির মুখের ওপর আটকে গেল বড়ুয়া সাহেবের দৃষ্টি। বললেন, এই যে, তোমার তো মডার্ন আর্ট-ফর্ম নিয়ে অগাধ পড়াশোনা, দ্যাখ তো, গানটা দাঁড়াল কি না?

ছোকরা সারামুখে গুমোর ফুটিয়ে কাগজটা নিল। বড়ুয়া সাহেবের কাছে ওর কদর দেখে সহকর্মীরা মনে মনে ঈর্ষায় ফেটে পড়তে লাগল। ওই বিখ্যাত গান ছিল সেটা!

বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা...। বৈশাখে তার আকুল নয়ান/আমের ছায়ায় বিছায় শয়ান/কালো নদী-জলে আপন ছায়া সে আনমনে খোঁজে কারে...।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরো গানটা এক প্রস্থ পড়ে নিয়ে ছোকরা বড়ুয়া সাহেবের দিকে তাকাল। বলল, মন্দ হয়নি গানটা, তবে, দু'একটি জায়গায় কিছু মারাত্মক টেকনিক্যাল ভুল থেকে গিয়েছে।

—আচ্ছা! বড়ুয়া সাহেবের দু'চোখে তীব্র কৌতূহল,—কোন্ জায়গাগুলো বল তো?

ছোকরা বলে, যেমন ধরুন, ওই জায়গাটা, ওই যে, বৈশাখে তার আকুল নয়ান,/আমের ছায়ায় বিছায় শয়ান...। আম, ওইটুকুন একটা ফল, কতটুকুই বা ছায়া তার, ওই এক চিলতে ছায়াতে কি বিছানা পাতা সম্ভব?

—হুঁ...। বড়ুয়া সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছোকরার দিকে। একসময় বললেন, ঠিক আছে, কাগজটা দাও আমাকে। ছোকরার থেকে কাগজটা ফেরত নিয়ে গীতিকার ছাড়া আর সবাইকে তখনকার মতো চলে যেতে বললেন। তারপর গীতিকারকে বললেন, দারুণ হয়েছে গানটা। সুর দিতে বলুন।

শোনা যায়, দিনের শেষে নাকি ওই শিল্প বিশেষজ্ঞকে নিজের ঘরে একান্তে ডেকে বড়ুয়া সাহেব বলেছিলেন, বাপু হে, আমি তোমার বাপের বয়েসি। আমি বলছি, এই লাইন তোমার জন্য নয়। তুমি বরং এই কাজটা ছেড়ে দিয়ে বড়বাজারে লোহালক্করের ব্যবসা কর। সফল হবেই। আমি তোমার তিন মাসের মাইনে আগাম দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আর কাল থেকে এস না।

শোনা যায়, ছোকরা নাকি সত্যি সত্যিই বড়বাজারে লোহার ব্যবসা করে লাখপতি হয়েছিল।

গোপেশের গল্পটা শেষ হতেই দেখি, চপলকুমারের সারা মুখমণ্ডল জুড়ে শ্রাবণের মেঘ।

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সম্‌স্কৃতি নিয়ে আলোচনা করাই ঝকমারি। বলেই উঠে দাঁড়িয়ে গটমটিয়ে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। আমাদের শত ডাকেও ফিরে চাইল না।

ছবি বোঝা সহজ নয়

চপলকুমার কিছুদিন খুবই ক্ষেপে ছিল আমাদের উপর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গুরুচণ্ডালি দোষ রয়েছে এটা যেদিন বুক বাজিয়ে বলতে এল আমাদের কাছে, প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রসঙ্গ টেনে বিপদই একটুখানি কান মলে দিয়েছিল ওর। সেই থেকে খুব গোঁসা হয়েছিল বাবুর। ক'হপ্তা আর আড্ডার পথ মাড়ায়নি। অবশেষে গোঁসা-টোসা ভাঙিয়ে, বিপদকে যৎপরোনাস্তি বকাঝকা করে, আমরা আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে এনেছি চপলকুমারকে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে আবার 'শিল্প-সম্‌স্‌কৃতি' নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতে শুরু করেছে।

সেদিন চলছিল সত্যজিৎ রায়ের মূল্যায়ন। চপলকুমারের মতে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' স্রেফ দারিদ্রচর্চা আর কাশফুল ছাড়া আর কিছুই নয়। খালি কাশফুল ফলোড বাই বাঁশবন, এগেইন ফলোড বাই কাশফুল...।

তার জবাবে আমরা বলি, কিন্তু বল দেখি, চলচ্চিত্রে সিম্বোলিজমের ব্যবহার এদেশে তাঁর মতো আর ক'জন পেরেছে? হাজার কথা দিয়ে যা বোঝানো যেত না, সত্যজিৎ একটিমাত্র সিম্বোলিজম ব্যবহার করেই সেই কথাটি বলে দিতেন। 'চারুলতা'র ওই দৃশ্যটার কথা ভাব দেখি। ওই যে, রাস্তা দিয়ে বাঁদরওয়ালা বাঁদর নিয়ে হেঁটে চলেছে, ঘরের জানালা



দিয়ে চোখে দূরবিন লাগিয়ে নিঃসঙ্গ চারু বারবার দেখছে ওই হেঁটে যাওয়া। চারুর নিঃসঙ্গতাকে এর চেয়ে ভালো বোঝানো যেত?

আমাদের কথা শুনে চপলকুমারের ঠোঁটজোড়া বিদ্রূপে ভেঙে যেতে থাকে। বলে, এটা কোনও সিম্বোলিজম হল? সিম্বোলিজম কাকে বলে শুনবে? তবে শোন। কিছুদিন হল বড়বাজারের এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী আমার পিছু পিছু ঘুরছে। হোলসেলে মশলা আর কাপড় বেচে বেচে বেচারি একেবারে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ছবিতে টাঁকা ঢালবার শখ হয়েছে ওর। কেমন করে যেন কার কাছ থেকে আমার নাম শুনেই আজ ছ'মাস একেবারে পিছু নিয়েছে। কি না, সে একটা হিন্দি ছবি প্রযোজনা করতে চায়, বম্বেতেই শুটিং হবে, তার চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে আমাকে। তার কেবল একটাই আবদার। ছবিটা যেন কোনও ইন্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যেতে পারে। সে বলে, আপনাদের মুলুকের স্যাটাজিৎ রে' কালচে ফিলিমে বাঁশবনের ছবি দেখিয়ে যদি অ্যাওয়ার্ড পেতে পারেন তো আমি কেন পাব না মোশায়? ক'কোটি টাকা ঢালতে হবে বলুন। বলে, শুনেছি, স্যাটাজিৎ নাকি তাঁর ছবিতে কীসব সিম্বোলিজম আমদানি করেছিলেন। আপনি আপনার স্ক্রিপ্টে সিম্বোলিজমের বন্যা বইয়ে দিন মোশায়। রুপেয়ার জন্য ভাববেন না। চপলকুমার স্কুপ নিউজ ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলে, তোদের উপর রাগ করে নয়, আসলে আমি ওই চিত্রনাট্যটাই বানাচ্ছিলাম এই ক'দিন।

গোপেশ বলল, কাজটা শেষ হয়েছে?

—চোদ্দোআনা কমপ্লিট। ফাট্টাফাট্টি দাঁড়িয়েছে। ফার্স্ট সিনটাতেই জুরিরা কাত হয়ে যাবে।

আমরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি, শুনি, শুনি।

চপলকুমার শুরু করে।

একটা এয়ারপোর্টে ফার্স্ট সীন শুরু। আকাশে একটা প্লেন ল্যান্ড করতে চলেছে। হিরো পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরছে। কাট টু লাউঞ্জ। লাউঞ্জে হিরোর মা ও অন্য রিলেটিভরা ফুলের ঢাউস মালা হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কাট টু রানওয়ে। প্লেনটা থেমে গেল। ককপিট খুলে গেল। দরজায় মুখ দেখাল হিরো। শাম্মি কাপুরের কায়দায় এক্কা-দোক্কা খেলার ভঙ্গিতে হেঁটে এল হাতে সুদৃশ্য অ্যাটাচি দোলাতে দোলাতে। লাউঞ্জে পৌঁছেই মাকে 'হ্যাল্লো মাম্মি—' বলে জড়িয়ে ধরে তিনপাক ঘুরে গেল। একে একে সবাই মালা পরিয়ে দিল ওর গলায়। দু' একটা ডায়ালগ বলল।

একসময় চারপাশে চোখ বুলিয়ে হিরো বলল, মাম্মি, ড্যাডি কিঁউ নেহিঁ আয়া?

প্রশ্ন শুনে হিরোর মাম্মির সারা মুখে ঘনিয়ে এল বিষাদ।

নাছোড়বান্দা হিরো তার মাম্মিকে কেবলই শুধোতে থাকে, বোলো না মাম্মি, ড্যাডি কিঁউ নেহি আয়া? কিঁউ নেহি আয়া, কিঁউ নেহি আয়া, কিঁউ নেই আয়া?

হিরোর উপর্যুপরি প্রশ্নে তার মাম্মি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হিরোর পানে। আচমকা গোটা স্ক্রিন সাদা হয়ে গেল। এবং পরমুহূর্তে গোটা পর্দা জুড়ে ভেসে উঠল একটা ঢাউস সাইজের পটল। হিরোর ড্যাডি এসে পটলটা দু'তিন বারের চেষ্টায় কাঁধে তুলে কুঁজোপানা হাঁটতে হাঁটতে পর্দার বাইরে চলে গেল। কাট টু এয়ারপোর্ট-লাউঞ্জ। হিরো তার

মাম্মিকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে চলেছে।

চপলকুমার চোখ নাচায়, কেমন?

আমাদের কান তখন ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে সরষে ফুল দেখছি সবাই। তারই মধ্যে গোপেশ কোনও গতিকে শুধোয়, হিরোর বাবা অত কষ্ট করে পটলটা তুলল কেন?

—এটা আর বুঝলে না? মরার সময় একমাত্র ছেলেকে দেখতে পেল না বলে হিরোর ড্যাডি খুব কষ্ট পেয়ে পটল তুলেছে।

বলতে বলতে আবার চোখ নাচায় চপলকুমার, শুধু ফার্স্ট সিনটাই তো শুনলে, পুরো ছবিটার দৃশ্যে দৃশ্যে এমনতর রাশি রাশি সিম্বোলিজম। ছবিটা রিলিজ করলে কী ফাট্‌টাফাট্‌টি ব্যাপারখানা হবে, বল দেখি। জুরিদের মাথা একেবারে ঘুরে যাবে। বল?

আমরা কথা খুঁজে পাইনে।

আমাদের বোবা মেরে যেতে দেখে চপলকুমার বুঝি উৎসাহিত হয়। বলে, যাই বল, সাহিত্য, সিনেমা আর চিত্রকলার মধ্যে সাহিত্যটাই সবচেয়ে ওঁচা। সিম্বোলিজমকে একেবারেই খেলানো যায় না ওখানে। সিম্বোলিজমটা সবচেয়ে ভালো খেলে সিনেমায়। তারপর ছবিতে। এই ক'দিনে কত্তো ছবি যে আঁকলাম। রেখায় রেখায় একেবারে মুড়ি-মুড়কির মতো সিম্বোলিজম ঢুকিয়েছি। দেখতে চাও তেমন ছবি? দু' একটা বোধ করি রয়েছে ব্যাগে। দাঁড়াও।

বলতে বলতে সাইড-ব্যাগ থেকে একগোছা কাগজ বের করে চপলকুমার। তার থেকে একখানা ছবি বেছে নিয়ে মেলে ধরে আমাদের সামনে।

একটা ভাঙাচোরা পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে লেপটে রয়েছে একটা লোমওয়ালা বাঁকানো লেজ, তার পিছনে আরও একটা ততোধিক বড় সাইজের লেজ। আর, একটা লাঠির আধখানা। পিছনে আরও একখানা লম্বাটে লাঠি। ব্যস, ছবি বলতে এইটুকুই।

চপলকুমার চোখ নাচিয়ে শুধোয়, বুঝলে কিছু?

আমরা সবাই অবোধ চোখে মাথা নাড়ি।

—বুঝলে না তো? বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা বুড়ো লাঠি হাতে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। সঙ্গে চেনে বাঁধা একটা বিশাল অ্যালসেশিয়ান। বুড়োটা পাঁচিলের আড়ালে চলে গিয়েছে, কুকুরটাও। কেবল কুকুরের লেজটা এবং লাঠির আধখানা তখনও অবধি দেখা যাচ্ছে।

বলি, কুকুর তো একটা নয়, দুটো।

চপলকুমার মুচকি হেসে বলে, কুকুর একটাই। বড় সাইজের লেজটা লেজের ছায়া। লাঠিও একখানা। অন্যটা ওর ছায়া।

বলি, ছায়াসহ ওই আধখানা লেজ আর আধখানা লাঠি দেখে এতটা বুঝে ফেলা যাবে?

চপলকুমারের ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্য। বলে, শুধু এই নাকি? সমঝদাররা এর থেকেও আরও কতকিছু বুঝে ফেলবে। যেমন ধর, বুড়োটা বড়লোক, শৌখিন, নইলে অ্যালসেশিয়ান নিয়ে হাঁটতে বেরোয়? কুকুরের শখ সবার থাকে না। অ্যালসেশিয়ান পোষার ক্ষমতাও থাকে না সবাইয়ের। তারপর, ধর গিয়ে, বুড়োটা বুড়ো হলেও এখনও অবধি বেশ টান টান শরীর। নইলে একটা অ্যালসেশিয়ানকে সামলাতে পারে? তার পর ধর, সময়টা সকাল।

সূয্যি উঠেছে, রোদ্দুর ছড়িয়েছে। নইলে ছায়া দেখতে পেতে না। ছায়াটা লম্বা, তার মানেই সকাল। সকালের ছায়া সবচেয়ে লম্বা হয়। তারপর ধর, লোকটা পুবমুখো হাঁটছে। লেজ আর লাঠির ছায়া দুটো তাই আসলের পিছনে আঁকা হয়েছে। হুঁ-হু, বাবা, ছবি বোঝা অত সহজ নয়। মডার্ন আর্টের জন্ম বিলেতে।

কাব্য ও মোবাইল

চপলকুমারের স্বরচিত আধুনিক কবিতা আর আধুনিক চিত্রকলা ইদানীং বাস্তবিক আমাদের ঘোরতর আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। ও অবশ্য বলে, মডার্ন আর্ট, মডার্ন পোইট্রি। কিন্তু ওর ওই 'মডার্ন আর্ট' 'মডার্ন পোইট্রি'র ভয়ে আমরা ইদানীং সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকি।

বলতে পারেন কেন, ছবি কিংবা কবিতাকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে? তবে শুনুন। সেদিন আড্ডায় পৌঁছেই চপলকুমার বলে, শুনবে নাকি, এদেশি মডার্ন পোইট্রি? শোন তবে, 'তোমার হৃদয়ের সসপ্যানে হাজারটা ডিম ভেজে খেয়েছি...।'

পুরো কবিতাটা শেষ করে আমাদের দিকে তাকায় চপলকুমার। চোখ মটকে শুধোয়, কেমন লাগল?

বলি, 'খারাপ কী? তবে এমন কবিতা শীতকালে পড়লেই ভাল।'

চপলকুমার বলে, 'কবিতার আবার শীত-গ্রীষ্ম কী? একি ক্ল্যাসিক্যাল গান নাকি, যে দিনের ওই সময়ে গাইতে হবে, ওই ঋতুতে গাওয়া চলবে না—।'

বলি, 'কবিতাতেও তেমনটা রয়েছে বৈকি। সব কবিতা কি সব ঋতুতে শুনতে ভাল লাগে? আকাট গ্রীষ্মে কি বর্ষার কবিতা শুনতে ভাল লাগে? কিংবা ঘোর বর্ষায়, 'হে রুদ্র বৈশাখ...?'



চপলকুমার কটমটে চোখে তাকায়, 'তো, এই কবিতাটা শীতে পড়লে ভালো হত কেন?'

বলি, 'না, মানে, গ্রীষ্মকালে এক লপতে এক হাজারটা ডিমভাজা খেলে—। এই গরমের দেশে...।

রাগে থমথম করছিল চপলকুমারের মুখ। তাই দেখে প্রমাদ গুনি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চাই। বলি, 'আমার মনের মধ্যে একটা, গুরুতর প্রশ্ন গুরগুরিয়ে উঠছে, কিনা, হাজারটা ডিম ভাজা চলে, এমন বিশাল হৃদয়-নামক সসপ্যানের মালিকটি কে? বাস্তবিক, এখানে 'তোমার' বলতে কার কথা বলতে চেয়েছ?'

—হ্যাঁ, সে কোথায় থাকে? কী করে?

চপলকুমারের ভ্রূসঙ্গমে গভীর ভাঁজ পড়ে। বলে, 'খুবই কঠিন প্রশ্ন। ভেরি ডিফিকাল্ট। বাংলা কবিতা আর গানে এই যে দ্বিতীয় পুরুষের ব্যবহার, অর্থাৎ 'তুমি, তোমরা, তোমার', এর রহস্য ভেদ করা সোজা ব্যাপার নয়, ব্রাদার। ধরো, ওই যে মান্না দে'র ওই বিখ্যাত গানটা। 'দীপ ছিল, শিখা ছিল, শুধু তুমি ছিলে না বলে আলো জ্বলল না।' বলতো, ওই গানে 'তুমি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? কে ছিল না বলে আলো জ্বলল না?

আমরা সবাই মাথা চুলকোতে থাকি। বাস্তবিক, এই 'তুমি'টা কে হতে পারে? প্রেমিকা?

—আরে, না না। অত সোজা হলে তো মামলা চুকেই যেত। চপলকুমারের ঠোঁটের ডগায় মুচকি হাসি,—ভাব। আরও ভাব। সবই যখন ছিল, তখন কীসের অভাবেই বা আলো জ্বলল না?

আমরা ভেবে ভেবে সারা হই। একসময় সারেন্ডার করি, পারছি নে। বলে দাও।

—পারলে না তো? চপলকুমারের সারা মুখে দেমাকি হাসি, আরে বাবা, তে-ল। তেল ছাড়া প্রদীপ জ্বলে?

—অ্যাঁ! তে-ল! আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

—কিংবা ধর রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা, 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে/কেউ তা জানে না।' এখানে 'তুমি'টা কে? কে সাত সকালে ডাক দিয়েছে? পারলে না তো? আরে বাবা, যে ছোকরা রোজ খবরের কাগজ দেয়। ওই ভোরবেলায়, যখন এসে পেপার দিয়ে যায়, আমরা জানতে পারি কি? আমরা তো তখন ঘুমে অচেতন। কিংবা ধর, রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা। '(তুমি) একটু কেবল বসতে দিও কাছে/আমায় শুধু ক্ষণেক তরে...।' এখানে 'তুমি' হল, লোকাল ট্রেনের ভিড় কামরায় একটা পুরো সিট দখল করে বসা প্যাসেঞ্জারটি। তাকেই বলছে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারটি। কিনা, আমাকে একটুখানি পাশে বসতে দাও। আমি অল্পক্ষণ বাদেই সামনের স্টেশনে নেমে যাব।

আমরা অবাক নয়নে দেখছিলুম চপলকুমারকে। কী যে জবাব দেব বুঝে উঠতে পারছিলুম না।

আচমকা গোপেশ দু'চোখ আকাশে তুলে বলে, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না/বেলা হলো মরি লাজে...।' রবীন্দ্রনাথের এই গানটায়ও তো প্রচ্ছন্নভাবে 'তুমি' রয়েছে।

চপলকুমার বলে, রয়েছেই তো। জাগালে না মানে, তুমি জাগালে না।

—এই 'তুমি'টি তবে কে?

চোখ নাচিয়ে চপলকুমার বলে, ভাব। ভেবে-টেবে ঠিক জবাবটি দাও দেখি।

গোপেশ বলে, আমার তো মনে হয়, এই গানে 'তুমি' মানে, অ্যালার্ম ঘড়ি। সময়মতো বাজেনি বলে ওকে খোঁটা দিচ্ছেন কবি, কি না, রাত পোহাবার আগে জাগাওনি কেন?

আমরা সবাই একযোগে হা-হা করে হেসে উঠি। পাশ থেকে বিপদ বলে ওঠে, সংস্কৃত ভাষায় যাও না। মূকং করোতি বাচালং, অর্থাৎ মূককেও তুমি বাচাল করে তোল। এখানে 'তুমি'টি কে?

—হাচ্। পাশ থেকে ফস্ করে বলে বসে গোপেশ, টক, টক অ্যান্ড টক। কথা কও, নইলে মাথা খাও।

—ধুস, হাচ কেন? বিপদের ঠোঁট তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায়,—এয়ারটেল। কথা বলানোর মাস্টার। ওদের স্লোগান হল, সব সময় কথা বল। অবিরাম, অনর্গল। দিনে-রাতে, চব্বিশ ঘণ্টা। থেমো না।

—মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা? ফুঃ! হাচ বলছে, বারো মাস, তিরিশ দিন। সব জায়গায়, সব ঋতুতে।

—মাত্র বারো মাস! দুয়ো! এয়ারটেল বলছে, একবার টাকা দাও, আজীবন কথা বল।

—মাত্র আজীবন? লজ্জা! হাচের হল, সারাজীব...ন।

—আজীবনে আর সারাজীবনে তফাতটা কী?

—তফাত আছে বইকি। কোথায় আজীবন আর কোথায় সা...রা জীব...ন, মানে টিল ডেথ।

—তোমাদের টিল ডেথ! আমাদের হল আনটিল ডেথ। আনটিল ডেথের কাছে তোমার টিল ডেথ গোহারান হেরে যাবে।

—হেরে যাবে? তবে শোন, লেটেস্ট স্কিমে হাচ বলছে, আগে কথা বল, পরে টাকা দাও। পুরোটাই পোস্ট পেইড।

—পোস্ট-পেইড মানে? বলছ, সারাজীবন কথা বলা যাবে। আবার বলছ, পোস্ট-পেইড। টাকাটা তবে কি মরার পরে দিলেও চলবে?

—এটা কী হচ্ছে শুনি? পাশ থেকে আচমকা গর্জে ওঠে চপলকুমার,—এটা কি কাব্য আলোচনার আসর, নাকি মোবাইল ফোন কোম্পানির সেলসম্যানশিপ! কাব্য-সাহিত্য নিয়ে এমন মশকরা করতে লজ্জা করে না তোমাদের? নাহ্, তোমাদের সঙ্গে কবিতা, গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াটাই ঝকমারি। স্রেফ বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো। সিয়ার ওয়েস্টেজ অফ টাইম।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে চপলকুমার।

দিশি কুকুরের পেটে ঘি

সেদিন আমাদের আড্ডার সামনের রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল চপলকুমার। আমাদের দেখেও না দেখার ভান করে কেটে পড়তে চাইছিল। তখনই বুঝেছিলাম, রাগটা তখনও অবধি পড়েনি।

বাস্তবিক, সেদিন কাব্য আলোচনার আসরে গোপেশ আর বিপদ যেভাবে হাচ আর এয়ারটেল নিয়ে কবির লড়াইয়ে মেতে উঠল, যে-কোনও সাচ্চা কবির রাগ হতেই পারে।

আমরা দৌড়ে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াই। বলি, হনহনিয়ে যাচ্ছ কোথায়? তোমার



সংস্কৃতি চর্চা কেমন চলছে? কবিতা লেখালিখির খবর কী? ছবি-টবি আঁকছো?

'সমস্‌কৃতি' চর্চা নিয়ে পরপর এতগুলি প্রশ্নে এবার থমকে দাঁড়াতে হয় চপলকুমারকে। বলে, চলো, বসি।

আড্ডায় বসে চপলকুমার চোখ মটকে বলে, আমি এখন চুটিয়ে 'হাইকু' লিখছি। আর, পপ-ডিস্কো-ব্যান্ডের গান।

—হাইকু? কেন, কবিতা কী দোষ করল? বেশ তো—।

চপলকুমার কিঞ্চিৎ বিরক্তবদনে বলে, আহ্‌, কবিতাই তো লিখছি। হাইকু কবিতা।

—হাইকু কবিতা! সেটা আবার কী বস্তু? কোনও 'হাইটেক' কবিতা নাকি?

চপলকুমার আকাশ থেকে পড়ে, সে কী, হাইকু জান না? শোন, হাইকু হল এক ধরনের ছোট্ট কবিতা। জাপানিরা লেখে। জাপান দেশটা ছোট, জাপানিরা নিজেরাও ছোট, তাদের সবকিছুই ছোট। তারা মহীরুহ জাতের গাছের চাষ করে, লম্বায় কিন্তু ছ'ইঞ্চি-এক ফুট, নাম দিয়েছে বনসাই। তারা কবিতা লেখে, মাত্র তিন লাইনেই কবিতা শেষ, নাম দিয়েছে, হাইকু। একেবারে যাকে বলে, বিন্দুতে সিন্ধু। ইদানীং এদেশেও হাইকু লেখার চল হয়েছে। দাঁড়াও, একটু হাইকু শোনাই তোমাদের।

বলেই চপলকুমার একটা খাতা বের করল ব্যাগ থেকে।

বলল, শোন। 'স্বাদে গন্ধে ভরপুর
বোতল আর বাকি মা?
ইতি তোমার কাকিমা'।

মাত্র তিন পংক্তির কবিতা, এত জলদি ফুরিয়ে গেল, আমরা 'সাধু সাধু' বলবার কথাটা ভুলেই গেলুম। মানে, সুযোগই পেলুম না। বরং কবিতাটা শুনেই আমাদের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

আমাদের দরদরিয়ে ঘামতে দেখে মুচকি হাসে চপলকুমার, শুনেই ঘামতে লেগেছ, লিখতে গিয়ে তবে কতখানি ঘাম ঝরেছে, বোঝ? হাইকু লেখা এত সোজা নয় ব্রাদার। গতকাল সারা বিকেল বাড়ির রোয়াকের সামনে বসে থেকে এই তিনটি পংক্তির হাইকুটি লিখতে পেরেছিলুম। খাতা-কলম নিয়ে বসে রয়েছি, কবিতা আর আসে না। আসে না... আসে না...। এমনি সময় নজর গেল সামনে মুদি-দোকানের মাথার হোর্ডিংয়ের উপর। চায়ের বিজ্ঞাপন। সাদা কাপে গাঢ় আনন্দমার্গী রঙের চা, পাশে লেখা 'স্বাদে গন্ধে ভরপুর'। বেশ পছন্দ হল কথাটা। লিখে ফেললুম। দ্বিতীয় পংক্তিটি আর আসে না। আসে না... আসে না...। আচমকা, ঘরে ঘরে বোতলভর্তি দুধ সাপ্লাই করে যে ছোকরা, সে খালি বোতল কালেক্ট করবার জন্য হাঁক দিয়ে যেতে লাগল, 'বোতল আর বাকি মা...?' লিখে ফেললুম কথাটা।

তৃতীয় পংক্তিটা নিজের কাব্যপ্রতিভা দিয়েই লিখেছে চপলকুমার, 'ইতি তোমার কাকিমা'।

শুনে তো আমাদের আক্কেল গুড়ুম।

আমাদের পিলে চমকানো বিস্ময়টাকে উপভোগ করতে করতে চপলকুমার বলে, এখন আমি চুটিয়ে হাইকু কবিতা লিখছি। আর, পপ, ডিস্কো এবং ব্যান্ডের গান।

—হাইকুর পাশাপাশি আবার পপ, ডিস্কো, ব্যান্ড! তার মানে, পূর্ব-পশ্চিম একসঙ্গে চলছে?

—মানে? চপলকুমারের ভ্রূসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে।

—মানে, হাইকু হল জাপানের অর্থাৎ পুবের। আর, বাকিগুলো হল আমেরিকার অর্থাৎ পশ্চিমের।

—ঠিক। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,/সেথা হতে সবে আনে উপহার,/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—। চপলকুমার উদাত্ত গলায় রবীন্দ্রনাথ আওড়াতে থাকে।

বলি, হাইকুতে আমাদের বড় একটা আপত্তি নেই। হাজার হোক, প্রাচ্যেরই একটা দেশ—। কিন্তু পপ, ডিস্কো, ব্যান্ড, এসব তো পুরোপুরি ইয়াংকি কলচর।

—ঠিক। পাশ থেকে বলে ওঠে গোপেশ,—আমাদের দেশজ সংস্কৃতিকে ভুলে এভাবে ইয়াংকি কলচরের তাঁবেদারি করাটা কি ভালো?

—সত্যি। পাদপূরণ করে বিপদ,—কোথায় তোমাদের মতো কবি-শিল্পীরা কবিতায়, গানে, নৃত্যে ছবিতে সনাতন আর্যসংস্কৃতিকে জগৎসভায় তুলে ধরবে, তা নয়, যতসব ইয়াংকি অপসংস্কৃতি, ছাইভস্ম, পপ, ডিস্কো, উলঙ্গ উদোম নাচা-গানা—।

—থাম, থাম। অপসংস্কৃতি কাকে বলছ তোমরা? চপলকুমারের দু' চোখে চাপা রোষ, ততোধিক বিস্ময়,—ইয়াংকি কলচার তো আসলে সনাতন আর্য সংস্কৃতিই। জান না?

—ইয়াংকি কলচরকে বলছো সনাতন আর্য সংস্কৃতি! কেমন করে বলছো এটা?

—বা-রে! ইংরেজরা তো আর্যই। ইতিহাস প্রমাণ দেবে। হিটলারও জানতেন। আমরা তো নিজেদের সংস্কৃতিকেই আমদানি করছি, ব্রাদার। কলচর রি-ডিসকভার্ড।

—ইংরেজদের সংস্কৃতিকে বলছ আমাদেরই সংস্কৃতি?

—কেন নয়? ইংরেজরাও আর্য, আমরাও আর্য। কাজেই, ইংরেজদের সংস্কৃতি তো আসলে আমাদের নিজেদেরই সংস্কৃতি, ব্রাদার।

—বারবার ইংরেজদের কথা তুলছ কেন? পাশ থেকে প্যাঁচ মারে বিপদ,—আমরা তো বলছি ইয়াংকিদের কথা।

—রাইট। পাশ থেকে বলে ওঠে গোপেশ, ইংরেজ-সংস্কৃতিকে না হয় খাঁটি আর্য-সংস্কৃতি বলে মেনে নেওয়া গেল। আর, নিজেদের আর্য কুলোদ্ভব ভেবে নিয়ে ওদের সংস্কৃতিকে না হয় আমাদের নিজেদেরই সংস্কৃতি বলেও মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তুমি যেসব পপ, ডিস্কো, ব্যান্ডের কথা বলছ, ওগুলো তো খাঁটি ইয়াংকি কলচর।

—হ্যাঁ, ওগুলো আবার আর্য কলচর হল কীভাবে?

—আরে বাবা, যারে কয় চালভাজা, তারেই কয় মুড়ি। দুটো জাত তো আসলে একই। আমেরিকানরাও তো আসলে আর্যই। ইতিহাস পড়নি? ওই যে, ইংল্যান্ড হইতে একদল ইংরেজ মে-ফ্লাওয়ার নামক জাহাজে চড়িয়া আমেরিকায় অবতরণ করিলেন...। মনে নেই? ওরা তো ইনিসিয়ালি আর্য কুলমণি ইংরেজদেরই বংশধর, এবং পরবর্তীকালে আমেরিকান নামে খ্যাত। কাজেই বুঝতে পারছো, ইংরেজ কলচর, ইয়াংকি কলচর আর ইন্ডিয়ান কলচর হরেদরে একই কলচরের রকমফের। একই কয়েনের এপিঠ-ওপিঠ। তবুও তোমাদের মতো

কিছু মানুষ যে পপ, ডিস্কো, ব্যান্ডের মতো দুরন্ত আর্য-সংস্কৃতিকে সুযোগ পেলেই খিস্তি মারে, এর কারণ কী জান? এর একমাত্র কারণ হল, তোমাদের শরীরে অনার্য রক্তের পরিমাণ বেশি। সেই কারণেই খাঁটি আর্য সংস্কৃতিকে হজম করতে পারছো না, ইয়াংকি কলচর বলে গালমন্দ করছ। আরে ব্রাদার, দেশি কুকুরের পেটে কি খাঁটি ঘি সয়?

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল করবার উপায়

ইদানীং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাগুলোতে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

রবীন্দ্র, নজরুল, শাস্ত্রীয় সংগীত, কত্থক-ভরতনাট্যম-মণিপুরী নাচ, আবৃত্তি, নাটক চলছে, কিন্তু হলের বারোআনা আসনই ফাঁকা। অথচ পাড়ায় যখন 'বিনিদ্র বিচিত্রা' চলে, ভিড় সামলানো দায় হয়।

আসলে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে এখন টিভি-ভিডিওর রমরমা। কেব্‌ল-টিভি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে প্রতিটি ঘরে। তাতে চব্বিশ ঘণ্টা নাচাগানার অনুষ্ঠান। চ্যানেলে চ্যানেলে একদল অর্ধউলঙ্গ মেয়ে কোমর দুলিয়ে উদ্ভট নাচ নেচে চলেছে। পাশাপাশি, কিছু চ্যানেলে জ্যোতিষচর্চা আর ফেঙসুই, কিছু চ্যানেলে রূপচর্চা, আর কিছু চ্যানেলে সারাক্ষণ শুধু খবর, রান্নাবান্না আর উদ্ভট সব সিরিয়াল। 'সম্‌স্‌কৃতিবান' বাঙালি দিনরাত সপরিবারে বসে বসে গিলছে সেসব। গিলতে গিলতে মানুষের মৌলিক রুচিবিচারও যাচ্ছে বদলে। সেই কারণেই আজকাল পাড়ায় পাড়ায় যেসব 'সম্‌স্‌কৃতিক অনুষ্ঠান' হয়-টয়, তার চোদ্দোআনাই 'বিনিদ্র বিচিত্রা'। তাতে কেবলই ওইসব উৎকট নাচাগানার অন্ধ অনুকরণ। উদ্ভট নাচের সঙ্গে তরল, চটুল গান। কর্ডলেস বাগিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়ার লতাকণ্ঠী,



আশাকণ্ঠীদের তাণ্ডব। রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যনাট্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, কত্থক-মণিপুরীর আসরগুলো স্রেফ মাছি তাড়ায়। এমন কি রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলোও মিজারেবলি ফ্লপ করছে। রবীন্দ্রভক্ত বাঙালির বর্তমান প্রজন্মটির নাকি একলপতে দুটির বেশি রবীন্দ্রসংগীত শুনলে মাথা ধরে যায়। কাজেই, ওই ধরনের অনুষ্ঠানে এখন শ্রোতা জোটানোই মুশকিল। পাঁচশোটা কার্ড ছাড়লে পঞ্চাশ জনও আসে কি না সন্দেহ। এলেও অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি পৌঁছে অর্ধেক আসন ফাঁকা হয়ে যায়।

শুদ্ধ সংস্কৃতির এমন ঘোর দুর্দিনেও সম্প্রতি এক সত্যিকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়ে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ।

অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল আমাদেরই এলাকার একটি অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংস্থা।

একদিন বাড়ি বয়ে এলেন ওঁরা। বললেন, আপনাকে প্রধান অতিথি হতে হবে।

বলি, প্রধান অতিথি মানে তো বক্তৃতা দিতে হবে। আজকাল আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে করে না। ইদানীং বক্তৃতা কেউ শোনে না। বক্তার নামটি ঘোষিত হলেই সারা হল জুড়ে চাপা বিরক্তি। যতক্ষণ বক্তৃতা চলে, কেবলই উশখুশ করতে থাকে। পাশের লোকটির সঙ্গে ফিসফিসিয়ে গল্প করে, নয়তো বাইরে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট খেয়ে আসে।

কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন জিভ কেটে বললেন, আরে না, না, বক্তৃতা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি কেবল রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর সুকান্তের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন, তারপরই শুরু হয়ে যাবে অনুষ্ঠান।

যথাসময়ে অনুষ্ঠানের হলে ঢুকে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। সারা হল জুড়ে থইথই করছে মানুষ। সারা হলই বলতে গেলে ভর্তি।

দু'চোখ আকাশে তুলে কর্মকর্তাদের বললাম, করেছেন কী? রবীন্দ্র-নজরুলের গান আর আবৃত্তি শুনতে এত মানুষ!

কর্মকর্তাটি কান এঁটো করে হাসেন। সেই হাসিতে যারপরনাই আত্মপ্রসাদ।

বলি, কীভাবে এত মানুষকে হাজির করলেন?

কর্মকর্তাটি এক গাল হেসে বললেন, আমাদের এই এলাকায় এখনও অবধি একটা সাম্‌স্‌কৃতিক পরিমণ্ডল রয়েছে, স্যার। এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে তা বাঁচিয়ে রেখেছি।

মনীষীদের গলায় মালা-টালা পরানোর পর আমাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে এনে একেবারে সামনের সারিতে বসানো হল। আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য পাশটিতে বসলেন একজন কর্মকর্তা। একসময় অনুষ্ঠান শুরু হল, এবং একটু একটু করে আমার সামনে পরতে পরতে খুলতে লাগল এই জনসমাগমের রহস্য।

উদ্বোধনী সঙ্গীতটি পরিবেশন হল কোরাসে। জনা-দশেক ছেলেমেয়ে মঞ্চে এসে একসঙ্গে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাইল 'কী গাব আমি কী শোনাব...' গানটি। এরপর একটা সমবেত নৃত্য। এবারেও জনাদশেক কিশোরী খুব সাজুগুজু করে রবীন্দ্রনাথের 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে...' গানটার সঙ্গে নাচল। এরপর গাইতে এল একপাল শিশুশিল্পী। সংখ্যায় জনাপনেরোর কম হবে না ওরা। খুব আধো আধো গলায় গাইল, 'ফুলে ফুলে ঢলে

ঢলে...' গানটা।

একনাগাড়ে এত এত ছেলেমেয়ের চ্যাঁচানি গান শুনতে শুনতে মাথাটা একটু একটু করে ধরে যাচ্ছিল। একসময় কর্মকর্তাটিকে ফিসফিসিয়ে শুধোই, একক গানের ব্যবস্থা নেই?

কর্মকর্তাটি দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, নেই। সবই কোরাস।

আমি অবাক হয়ে শুধোই, কেন?

কর্মকর্তাটি সারা মুখে চালাক-চালাক হাসি ফুটিয়ে বলেন, একক সংগীত গাওয়ালে আমাদের ক্ষতি।

এরপর কর্মকর্তাটি ধীরে ধীরে প্রাঞ্জল করে বোঝালেন পুরো ব্যাপারটা। শুনে তো আমার চোখ ছানাবড়া।

কর্মকর্তাটি বললেন, আপনি হলে ঢুকেই জিজ্ঞেস করছিলেন না, নাচগানের জলসা নয়, তবুও কেমন করে এত এত শ্রোতা জোটালুম? শুনুন তবে। আমরা প্রথমেই অনুষ্ঠান থেকে বক্তৃতাকে ছেঁটে দিয়েছি। বক্তৃতা মানেই শ্রোতাদের কাছে সে এক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। সে রিস্ক নিইনি আমরা। তার ওপর, পুরো অনুষ্ঠানটাকেই কোরাসে সাজিয়েছি।

বলি, তাতে লাভ?

কর্মকর্তাটি চোখ টিপে বলেন, তাতেই তো লাভ। এক একটা আইটেমে অংশ নিচ্ছে দশ থেকে পনেরোজন শিল্পী। ওদের বাবা-মা তো হাজির থাকছেই, যত হোক, তাদের পুত্রকন্যারা মঞ্চ আলো করে নাচছে-গাইছে, তারা তো আসবেই। চাই কী, তাদের সঙ্গে দু'চারজন আত্মীয়স্বজন, পড়শিকেও ধরেবেঁধে নিয়ে এসেছে আত্মজদের প্রতিভা দেখানোর জন্য। তাহলে আইটেম পিছু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কমপক্ষে জনা তিরিশেক শ্রোতা। আমরা আজকের অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি নিয়ে তেমন কুড়িটা আইটেম রেখেছি। তাহলে শিল্পী ও তাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন মিলে দর্শক সংখ্যা কত দাঁড়াল? ছ'শো। এছাড়াও আমরা সম্প্রতি একটা 'বসে আঁকো'র ব্যবস্থা করেছিলাম। তার পুরস্কার বিতরণটাও আজকেই রেখেছি। মোট জনাপঞ্চাশেক পার্টিসিপেন্ট ছিল। আমরা প্রথম তিনজনকে প্রাইজ দিচ্ছি, কিন্তু বাকিদেরও সান্ত্বনা পুরস্কার দেব। কাজেই, ওই পঞ্চাশ জনের বাবা-মা আর পাড়াতুতোরাও এসেছে। এদের মধ্যে কিছু শিল্পী কমন হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু তাও যতজন এসেছে, তা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন।

শুনতে শুনতে আমার দু'চোখ কপালে উঠে যাওয়ার জোগাড়। বলি, কিন্তু এক-একটি টিমের অনুষ্ঠান শেষ হলেই তো সেই টিমের শিল্পী ও তাদের বাবা-মা'রা চলে যাবেন। তাই তো করতে দেখি সর্বত্র। কাজেই, একটু একটু করে তো ফাঁকা হয়ে যাবে হল।

কর্মকর্তাটি খুব বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করে বললেন, এই সমস্যাটা গেল-বছর অবধি ছিল। নিজেদের ছেলেমেয়ের নাচ-গান শেষ হলেই আর একমুহূর্ত বসতেন না ওঁদের বাবা-মা'রা। অন্যের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান দেখতে মোটেই রাজি নন ওঁরা। এবারে সেই অসুবিধেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আজকের অনুষ্ঠানের সেরা তিনটি টিমকে পুরস্কার দেওয়া বাদেও প্রত্যেক শিল্পীকেও সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। একদল বিচারক সেসব বিচার করে চলেছেন নিঃশব্দে। অনুষ্ঠানের শেষে পুরস্কার প্রদান। এ ছাড়া 'বসে আঁকো'র পুরস্কারগুলোও তো দেওয়া হবে ওই সময়েই। কাজেই, এই অবধি সবাইকে বসে থাকতেই

হবে।

মনের মধ্যে একটুখানি সংশয় নিয়ে বলি, নামমাত্র পুরস্কারের জন্য সবাই শেষ অবধি বসে থাকবে বলছেন?

এক চোখ টিপে কর্মকর্তাটি বললেন, বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু তাও বসে থাকবে। কারণ, পুরস্কার বিতরণের জন্য মিস দীপমালা আসছেন যে। যথাসময়ে শুটিং শেষ করে এসে পড়বেন তিনি।

বলি, দীপমালা কে?

কর্মকর্তাটি বলেন, আপনি স্যার চিনবেন না। বাংলা সিরিয়ালের এক ওঁচা হিরোইন। সর্বদা শরীর দেখাতে ভালোবাসেন। তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য সবাই দরকার হলে রাতভর বসে থাকবে। কর্মকর্তাটি চোখ মটকে হাসেন।

শুনতে শুনতে কেবলই ভাবছিলাম, এই মানুষ জাতটা শেষ অবধি টিকে থাকবেই। কোনওকিছুই তাদের নির্মূল করতে পারবে না। কেন কি, যত জটিল রোগই হোক না কেন, মানুষ তার প্রতিষেধক ঠিকই বের করে ফেলবে।

দু'হাত কচলাতে কচলাতে কর্মকর্তাটি বললেন, পুরস্কার বিতরণের পর আপনাকে একটুখানি সংবর্ধনা দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে। কাজেই, আপনাকেও শেষ অবধি একটুখানি থেকে যেতে হচ্ছে, স্যার।

মুদ্রাগুণ

আমরা মাঝে মাঝেই চপলকুমারের পিছনে লাগি। তার হরেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে খোঁটা দিই।

চপলকুমার আহত হয়। বলে, শুধু আমার মধ্যেই তোমরা যত দোষ দেখতে পাও? তোমাদের কোনও দোষ নেই?

বলি, আমাদের কোনও দোষ দেখলে ধরিয়ে দাও। শুধরে নেব।

চপলকুমার গোমড়া মুখে বলে, আমি কেন শোধরাতে যাবো? আমি কি চরিত্র সংশোধনের ইস্কুল খুলেছি? নিজেদের দোষ নিজেদেরই শোধরাতে হবে।

বলি, দোষ খুঁজে না পেলে কী করে শোধরাবো?

চপলকুমার কটমটে চোখে তাকায়। বলে, তাহলে কি তোমরা বলতে চাও, তোমাদের কোনও দোষ নেই?

বলি, নিশ্চয়ই নেই। থাকলে ধরা পড়তো নির্ঘাৎ।

চপলকুমার আর কথা বাড়ায় না। গুম মেরে বসে থাকে।

একদিন দেখি, চপলকুমার আমাদের দিকে তর্জনীটা তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আমাদের দিকে নজর নেই তার। নজর রয়েছে নিজের আধা-মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতের দিকে।

বলি, নতুন কোনও প্রাণায়াম নাকি?

—না, না। এ হলো এক কিসিমের মুদ্রা।



—মুদ্রা? মুঠোর মধ্যে মুদ্রা লুকিয়ে রেখেছো? ম্যাজিক করছো?

—না, না, মুঠোর মধ্যে কিছুই নেই। মুঠোটাই মুদ্রা।

—যাহ্, মুঠো কখনও মুদ্রা হয়? গোপেশ বলে,—মুঠোর মধ্যেই মুদ্রা থাকে।

—আহা, এ মুদ্রা সে মুদ্রা নয়। এ হল অন্য মুদ্রা। সেই বলে না, লোকটার এই এক মুদ্রাদোষ...। শোননি?

—শুনেছি। কিন্তু আমি ব্রাদার মুদ্রা বলতে কয়েনই বুঝি। কিন্তু সেটা, আমার মতে, কখনওই দোষের হয় না। বরং মুদ্রা হলো অশেষ গুণের অধিকারী। তার তো বলতে গেলে গুণের অন্ত নেই। শাস্ত্র-পুরাণে বলেছে, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যে নঃ চরাচরম। অর্থাৎ কি না, অখণ্ড গোলাকার চাকতিই সারা বিশ্ব-চরাচর শাসন করছে। এখানে মুদ্রার কথাই বলা হয়েছে ব্রাদার। তাই আমার মতে, মুদ্রাদোষ বলে কিছু হয় না। সবই মুদ্রাগুণ।

—আরে বাবা, হাতের তেলো ও আঙুলের হরেক কারসাজিকেও মুদ্রা বলে। লক্ষ করে থাকবে, পুজোআচ্চার সময় পুরুতরা দুটি হাতের তেলো ও আঙুলগুলোকে হরেক প্রকারে বাঁকিয়ে চুরিয়ে, মুঠো করে, ঠাকুরের সামনে বন্দনা-প্রার্থনা করে।

—দেখেছি।

—ওগুলোই হল মুদ্রা। ঠিকঠাক মুদ্রা বানাতে পারলে তার উপকারিতা ঢের। কিন্তু ভুল হলেই ক্ষতি হয়ে যাবে। দু'হাতে ভুল মুদ্রা বানিয়ে ঠাকুরকে কিছু সম্প্রদান করলে ঠাকুর নেবেই না।

—ভুল মুদ্রাকেই কি তবে মুদ্রাদোষ বলে? বিপদ শুধোয়।

বিপদের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে আমি পাশ থেকে বলে উঠি, তা, তুমি হাত মুঠো করে আমাদের দিকে তর্জনী তাক করে রয়েছো কেন?

—এটা একটা দারুণ মুদ্রা। বলতে বলতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে চপলকুমার। বলে, ভারী অবাক কাণ্ড, বুঝলে! আমার মুঠোটার দিকে নজর করে দেখ, তর্জনীটা তোমাদের দিকে তাক করা রয়েছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি তিনটে আঙুল আমার নিজের দিকেই তাক করা।

আমরা খুঁটিয়ে নজর করে দেখলাম, ব্যাপারটা সত্যি। চপলকুমারের তর্জনী আমাদের দিকে তাক করা, আর মুঠো বানাতে গিয়ে তিনটি আঙুল ওর নিজের দিকে।

—এর দ্বারা কী বোঝা গেল?

—এর দ্বারা একটা বিরাট ব্যাপার বোঝা গেল। বোঝা গেল, আমরা, মানে আমরা সবাই, মানে আপামর জনগণ, যখন অন্যের দিকে অভিযোগের একটা আঙুল তুলি, তখন আমাদের নিজেদের দিকে তিনটে আঙুল তাক করা থাকে। অর্থাৎ, আমি যখন অন্যের প্রতি একটা অভিযোগ তুলছি, তখন আমার দিকে অভিযোগের তীর তিনগুণ। অর্থাৎ তোমরা যখন আমার প্রতি হরেক অভিযোগ তোল, তখন আমার যদি একটা দোষ থাকে তো তোমাদের দোষ তিনটে।

—ইনটারেস্টিং! কোথায় শিখলে এটা?

—আমাকে একজন সাধু শিখিয়ে দিয়েছেন। হিমালয়ে বারো বছর ছিলেন। তাঁর মতে, যাদের কেবল অন্যের প্রতি অভিযোগ করা অভ্যেস, নিজেদের দোষগুলো দেখতে পায়

না, তারা এই মুদ্রাটি দিনে দু'বার প্র্যাকটিস করলে তাদের ফল্টফাইন্ডিং বদভ্যাসটা চলে যাবে, আত্মসমালোচনার প্রবণতা বাড়বে। 'ডবল স্ট্যান্ডার্ড' ভাবটাও কমে আসবে।

—ডবল স্ট্যান্ডার্ডটা কী বস্তু ব্রাদার? বিপদ আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে শুধোয়।

বলি, একই বিষয় যখন নিজের বেলায় একরকম ভাবি, আর অন্যের বেলায় অন্যরকম, তাকেই ডবল স্ট্যান্ডার্ড বলে। বাংলায় বলা চলে, দ্বিচারিতা।

চপলকুমার পাশ থেকে ছোঁ মেরে নেয় আমার কথাগুলো। বলে, ধরো, নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় শ্যামলা মেয়েটিও ফর্সা হয়ে যায়, কিন্তু ছেলেকে বিয়ে দেবার বেলায় ফর্সা মেয়েও 'যথেষ্ট ফর্সা নয়'। কিংবা ধর, নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় দাবিহীন উদার পাত্র চাই, কিন্তু ছেলের বিয়ের বেলায় গুনে গুনে পণ নিই। অন্যের ছেলে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেলে সেটাকে ভাবি দুর্নীতি, আর নিজের ছেলেকে ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢোকানোর বেলায় ভাবি, 'গো অফ দ্য ডে'। নিজে অফিস থেকে বেলা তিনটেয় কেটে যাই, কিন্তু অন্য অফিসে কর্মচারীটিকে তিনটের পর সিটে না পেলে তার মুণ্ডুপাত করি। যখন বাসে চড়ে কোথাও যাচ্ছি, সারাক্ষণ দাবি করি, ড্রাইভার যেন ঝড়ের গতিতে বাস চালিয়ে আমাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আবার যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি, তখন কোনও বাস পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলে ড্রাইভারের মুণ্ডুপাত করি। স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হলে, মনে মনে কামনা করি, আজ যেন ট্রেনটা ছাড়তে একটু দেরি করে। আবার যথাসময়ে ট্রেনে উঠে পড়ার পর ট্রেন ছাড়তে দেরি করলে রেল কোম্পানিকে খিস্তি দিই।

বাধা দিয়ে বলি, বুঝেছি, বুঝেছি। সামান্য ব্যাপারকে অত বিতাং করতে হবে না।

চপলকুমার বিরক্ত হয়, বুঝেছই যদি, তবে মুদ্রাটা এইবেলা আমার থেকে শিখে নিচ্ছ না কেন? নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে।

বলি, মুদ্রাটা শিখে নিলে আমার ভালো হবে বলছো?

—আলবৎ। সারাক্ষণ নিজের দোষত্রুটিগুলো নিজেই বুঝতে পারা, এ যে একটা কত বড় সুবিধে—।

—এটাকে 'সুবিধে' বলছ তুমি? আমার তো মনে হয়, মানুষের জীবনে এর চেয়ে ক্ষতিকর ব্যাপার বুঝি আর কিছুই হয় না। দেখ, মানুষ প্রতিনিয়ত হাজার-গণ্ডা দোষত্রুটি করবেই। এক জাতের ইমপ্রোভাইজড পশু হিসাবে অপরাধ করাটা মানুষের মজ্জাগত। কিন্তু তাও মানুষ পদে পদে দোষ-অপরাধ করে কেন? মানে, করতে পারে কেন?

—কেন?

—কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বিশ্বাসই করে না যে, দোষটা করলো। এটাই তার দোষ করবার লাইসেন্স। যদি সে পদে পদে বুঝেই ফেলে যে, সে এই দোষটা করলো, ওই অপরাধটা করলো, তবে তো অপরাধবোধে ভুগে ভুগে তার পাগল হবার উপক্রম হবে। মানুষ জাতটা তখন পুরোপুরি এক পাগলের প্রজাতি হয়ে উঠবে। এই ধর না, তেমনটা ঘটলে, এই শতাব্দীতে পাগলের তালিকায় প্রথমেই আসবেন আমাদের মহামান্য বুশ সাহেব।

কলিগ-পেইন

আমি যখন জীবনে প্রথম সরকারি চাকরিতে জয়েন করে ক'দিন বাদে বাড়ি ফিরলুম, বাবা প্রথমেই শুধিয়েছিলেন, হ্যাঁ রে, ভালো পড়শি পেয়েছিস তো?

হেসে বলেছিলুম, আমি কি ওখানে থাকবো নাকি? ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করবো। পড়শির প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে?

বাবা বললেন, আমি অফিসের পড়শির কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি। অর্থাৎ তোর সহকর্মীরা।



কর্মক্ষেত্রে তারাই তো তোর পড়শি। তারা সব ভালো তো?

আজীবনকাল ওই এক দুর্ভাবনার জায়গা ছিল বাবার। পড়শিদের নিয়ে দুর্ভাবনা। পরিচিত, বন্ধু-বান্ধবকে প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্ন করতেন, যেখানে বাড়ি করেছো, কিংবা ফ্ল্যাট কিনেছো, পড়শিরা কেমন?

আমার মুখে ঘটনাটা শুনেই চপলকুমার বলে ওঠে, আমি যে স্কুলে পড়েছিলুম, সেই স্কুলের পণ্ডিতমশায়েরও একই বাতিক ছিল। পড়শিতে অ্যালার্জি। সম্ভবত পড়শিদের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে নিপীড়িত ছিলেন তিনি। একদিন পণ্ডিমশাইকে পাকেচক্রে নিচু ক্লাসে ইংরেজি পড়াতে যেতে হয়েছিল হেড-স্যারের নির্দেশে। পণ্ডিতমশাই বাচ্চাদের ইংরেজির মানে বোঝাচ্ছিলেন এইভাবে : ওয়ান্স আপন আ টাইম দেয়ার ওয়াজ আ কিং, মানে, পড়শিরা বড্ড পাজি হয়। দ্য কিং ইজ ডেড, মানে, পড়শি মরেছে। লং লিভ দ্য কিং, মানে, আমি অনেকদিন বাঁচতে পারবো।

বুঝতে পারি, একটা পুরনো চুটকিকে নিজের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দিল চপলকুমার। তা দিক, কিন্তু প্রতিবেশীকে নিয়ে চপলকুমারের বক্তব্যটা অতি পরিষ্কার।

আমার বাবা কিংবা চপলকুমার-বর্ণিত পণ্ডিতমশাইয়েরও বহু আগে আর একজনও প্রতিবেশীকে নিয়ে তাঁর অ্যালার্জিপনা প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। পড়শি সম্পর্কে তিনি একদা যা বলেছিলেন, তা আমার ভাষ্যে এইরকম : প্রতিবেশী অপেক্ষা মানুষের বড় শত্রু আর কেহই নাই। প্রতিবেশীর ছাগল আসিয়া তোমার সাধের নন্দনকাননটি মুড়াইয়া খাইবে। প্রতিবেশীর গৃহিণী তাঁহার শরীরস্থ অলঙ্কারাদিতে স্বর্ণবাদ্য তুলিয়া তোমার গৃহিণীর হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি...।

বাসস্থানে কিংবা কর্মক্ষেত্রে পড়শিকে নিয়ে বাবার, চপলকুমারের পণ্ডিতমশাইয়ের কিংবা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভাবনা যে অমূলক ছিল না, পরবর্তীকালে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। পড়শি হল বাস্তবিক এক স্থায়ী যন্ত্রণার জায়গা।

চপলকুমারের কাছে প্রসঙ্গটা তুলতেই সে মুচকি হাসে। বলে, যন্ত্রণা তো থাকবেই ব্রাদার। মানুষের জীবনটাই তো বেড অফ থর্ন্স। কণ্টকশয্যা। তা, কাঁটার বিছানায় শুলে যন্ত্রণা তো হবেই। আজীবনকাল সেই যন্ত্রণা সইতেই হবে মানুষকে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রনিক পেইন। ধর, তুমি যখন জন্মালে, তখন তোমার মা অর্থাৎ আমাদের মাসিমা যে যন্ত্রণাটি সয়েছিলেন, তার নাম লেবার-পেইন। পরবর্তীকালে তুমিও সেই যন্ত্রণা সইলে বাড়ি বানানোর সময়। মাসিমা সয়েছিলেন এক কিসিমের লেবার-পেইন। আর তুমি? রাজমিস্ত্রি, জলের মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, কত কিসিমের মিস্ত্রি-লেবার নিয়ে তোমাকে সইতে হল হরেক কিসিমের লেবার-পেইন। এত করে যখন বাড়িতে ঢুকলে, তখন শুরু হল লেবার-পেইনের জায়গায় নেবার-পেইন। অর্থাৎ পড়শিকে নিয়ে যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা তোমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল।

—কিন্তু আমি বলছিলুম কর্মক্ষেত্রের পড়শিদের নিয়ে যন্ত্রণার কথা।

জমাট কষ্টকে তরলভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা সবার থাকে না। আমাদের চপলকুমারের তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের যন্ত্রণার প্রসঙ্গটা তুলতেই নড়েচড়ে বসে। বলে, কলিগ হয় বহুরকমের। তাদের দেওয়া যন্ত্রণাও তাই হরেক কিসিমের। যেমন ধর, মেঘনাদ-কলিগ।

তারা মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়বে। তুমি তাকে দেখতেই পাবে না। কেবল বুঝতে পারবে, তোমাকে দেখামাত্তর তোমার বসের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। আর এক জাতের কলিগ রয়েছে, তাদের বলা যায়, সৎমা-কলিগ। তার চোখে সর্বদাই তুমি সৎছেলে। কাজেই, নিজের সুযোগ-সুবিধের দিকে তার যত না নজর, তার চেয়ে বেশি নজর তোমার সুযোগ সুবিধের দিকে। তোমার একটুখানি সুবিধে হয়ে গেল কি গেল না, অমনি তোমার সৎমা-কলিগটির মুখে মেঘ জমতে শুরু করল।

সৎমা-কলিগকে তবু চেনা যায়, কিন্তু মাসি-কলিগ আরও মারাত্মক। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি তো, তাই দেখা হলেই তোমার মাসি-কলিগটি তোমায় শুধোবেই, শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে তোমার। ইস, কী রোগা হয়ে গিয়েছ। কিংবা, আর কত মুটোবে হে? এইবেলা ডাক্তার দেখাও। নইলে—। শুনেই তোমার হার্ট-বিট, ব্লাড প্রেসার তরতরিয়ে বাড়তে লাগলো। একজন উর্দু কবির শায়েরি পড়েছিলাম। তাতে বলেছে, ভুলেও তোমার জখমের জায়গাটা তোমার তথাকথিত বন্ধুদের দেখাবে না, কেন কি, তোমার ক্ষতস্থানে ঘসে দেওয়ার জন্য তারা সবাই মুঠোর মধ্যে নুন নিয়ে তৈরি রয়েছে।

মশা-কলিগরাও কম মারাত্মক নয়। তারা নিরন্তর তোমার রক্তে প্রাণ ধারণ করবে, আবার তোমাকেই হুলের জ্বালায় অস্থির করে তুলবে। তোমার কাছ থেকে সারাক্ষণ উপকার নেবে, তোমার প্যাকেট থেকে সিগারেট ধ্বংস করবে, তোমার পয়সায় চা সাঁটাবে, তোমার থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে লোন নেবে, আবার তোমার পিছনে সবার আগে কাঠি করবে। তোমার থেকে নেওয়া লোনের টাকাটি পকেটে পুরতে পুরতেই সে তোমার হিসাব-বহির্ভূত আয়ের উৎস নিয়ে গবেষণা জুড়ে দেবে।

আর এক ধরনের কলিগ হল, মাছি-কলিগ। তারা সারাক্ষণ অকারণে তোমার চারপাশে ভনভন করবে। তুমি জ্ঞানে-অজ্ঞানে যেই না কারও সম্পর্কে একটা মন্তব্য করলে, অমনি কথাটি মুখে করে বয়ে নিয়ে মাছি-কলিগটি উড়ে চলল। এবং একটু বাদেই তোমার বলা নিরীহ উক্তিটিকে নিজের মুখের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে উজাড় করে দিল তোমার বিরোধীপক্ষকে।

মাছি-কলিগের পরপরই তুলতে হয় কাঁচি-কলিগের প্রসঙ্গ। নাপিতের কাঁচি চালানো দেখেছো তো? একবার দু'এক গাছি চুল কাটছে তো দশবার ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ আওয়াজ করে নিজের কর্মতৎপরতা জানান দিচ্ছে সবাইকে। কাঁচির আওয়াজ শুনলে মনে হবে, বুঝি মাথার সব চুলই লোপাট হয়ে গেল। কিন্তু এ হল নাপিতের কাঁচি। কাটে যত, ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ আওয়াজ তোলে তার দশগুণ। কাঁচি-কলিগেরাও তেমনই। কাজ করবে যত, ফাইল হাতে ছুটে বেড়াবে তার দশগুণ। দেখতে দেখতে তোমার মুগ্ধ সাহেব দশ মুখে সুখ্যাতি করবে ওর। অর্থাৎ কাঁচি-কলিগের দাপটে বসের চোখে তুমি একটি অকর্মার ধাড়ি।

কাঁচি-কলিগের পর আসে হাঁচি-কলিগের কথা। সে সারাক্ষণ তোমার পেছনে হাঁচবে। তোমার শুভ কাজে কন্‌স্ট্যান্ট বাগড়া দিয়ে যাবে। "কোথাও বেরোচ্ছ নাকি? সাহেব কিন্তু ডাকতে পারে।" "কোথায় চললে? সাড়ে-চারটেতেই অফিস কাটছো নাকি?" "প্রোডাকশন ইউনিটে বদলি নিতে চাইছো শুনলাম। ইউনিয়নকে নাকি ধরেছো। সাহেব জানে? ইয়ার-এন্ডিংয়ের রিপোর্ট কমপ্লিট না করিয়ে সাহেব তোমায় ছাড়বে বলে মনে হয় না।" তার

জবাবে তুমি যদি বল, ছাড়বেই না যদি, তবে অ্যাপ্লিকেশন ফরোয়ার্ড করল কেন? তার জবাবে হাঁচি-কলিগ বলে উঠবে, "সাহেবের হয়তো বা মনে নেই। মনে পড়লেই আটকে দেবে।" এবং ঠিক তাই হল। পরের দিন সাহেব তোমাকে ডেকে সাফ জানিয়ে দিল, ইয়ার-এন্ডিংয়ের রিপোর্ট না পাঠিয়ে তোমার প্রোডাকশন ইউনিটে যাওয়া হবে না। রাতারাতি সাহেব মত বদলাল কেন? কারণ, ইতিমধ্যে তোমার হাঁচি-কলিগটি তোমার সাহেবের-কাছে গিয়ে হেঁচে দিয়ে এসেছে।

বলতে বলতে এক চোখ ছোট করে হাসে চপলকুমার। বলে, পেটে ব্যথা হলে তাকে ইংরেজিতে বলে, কলিক পেইন। কর্মক্ষেত্রে যে যন্ত্রণা মানুষকে অহরহ ভোগ করতে হয়, তাকে বলে কলিগ-পেইন। কলিগ অর্থাৎ সহকর্মীদের নিয়েই সে পেইন। যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই বোঝেন, কী দুঃসহ তা। সে পেইনের কষ্ট লিখে বোঝাই এমন পাওয়ারফুল পেনই নেই আমার।

বস

চাকরিতে জয়েন করবার সময় আমার এক তিন পুরুষের চাকুরিজীবী মেসোমশাই আমাকে একটি লাখ টাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বসকে একটু রসে-বশে ম্যানেজ করে রাখিস, আর কিছু দেখতে হবে না। মনে রাখিস, বস হল গ্রহের মতো। ক্ষতি না করলেই বুঝতে হবে অনুকূলে রয়েছেন। আর একটা কথা, কর্মক্ষেত্রে অনুগ্রহভিক্ষার জন্য একে-ওকে তেল মারতেই হয়। এব্যাপারে সেলাই মেসিনের থিয়োরিটা মাথায় রাখিস। সেলাই মেসিনে একেবারে ওপরের দিকের একটা ফুটোতে তেল ঢাললেই যেমন করে তা পুরো মেসিনের সর্ব অংশে চারিয়ে যায়, কর্মক্ষেত্রেও, তেল দিতে হলে একেবারে টপ বসটির পায়ে তেলটি ঢেলো, এন্‌টায়ার মেসিনারিতে তা ছড়িয়ে যাবে।

মেসোর কথাগুলো শুনতে শুনতে বসকে নিয়ে সেই তখন থেকেই আমার নিঃশব্দ গবেষণার শুরু। তারপর দেখতে দেখতে প্রায় তিন দশক কেটে গেল। আমার জীবনে কত বস এলেন, গেলেন।

আগের দিনের বসদের গল্প এখনো শোনা যায় প্রবীণ কেরানি-পিয়নদের মুখে। বলতে



গিয়ে তারা গদগদ। হ্যাঁ, সাহেব ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মেজাজ-মর্জির কথা একমুখে বলে শেষ করা যাবে না। ব্রিটিশ আমলের সাহেবদের কথা বলতে গেলে শ্রদ্ধায়, ভয়ে, ভক্তিতে এখনো অবধি সেকালের কেরানি-পিয়নদের গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। চব্বিশ ঘণ্টা মদে চুর হয়ে থাকতেন, কথায় কথায় ব্লেডি-বাস্টার্ড বলতেন, আর, কুড়ি টাকার টি-এ বিল জমা দিলে ডানদিকে একটা শূন্য বসিয়ে পাশ করে দিতেন।

গেল শতকের পঞ্চাশের দশকের একজন জেলাশাসকের কথা শুনেছিলুম তাঁরই অধস্তন এক কেরানির মুখে। অফিসে বেল দেওয়ায় আর্দালি-পিয়নটি হাজির হতে মিনিটটাক দেরি করেছিল। সেই অপরাধে, দিনসাতেক বাদে ট্যুরে গিয়ে ফেরার পথে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাতে বস তাঁর পিয়নটিকে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন। তখন তো প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ এযুগের মতো পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়নি। তখন জেলাশাসকরাও দস্তুরমতো এজলাসে বসে বিচার করতেন। একদিন এক জেলাশাসক এজলাসে বসে থাকাকালীন পাশেই তাঁর কোয়ার্টার থেকে সাহেবের শিশুপুত্রটি কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে নালিশ জানাল যে, মা তাকে মেরেছে। ব্যস, যেহেতু তিনি এজলাসে আসীন অবস্থায় অভিযোগ করা হয়েছে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর নামে ওয়ারেন্ট জারি করলেন।

সেদিনের সেইসব সর্বশক্তিমান বসদের আমি বড় একটা দেখিনি। কিন্তু আমার দেখা এযুগের বসদের দেখতে দেখতে তাঁদের নিয়ে যেসব ছবি জমেছে বুকে, তাতে করে সচ্ছন্দেই একটা এগ্‌জিবিশন হয়ে যেতে পারে।

বস নামক আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সবজান্তা হবেন। দুনিয়ার সব বিষয়েই তিনি অনন্ত, অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি বিশ্বাসই করবেন না যে, কারোর থেকে তাঁর কিছু শেখার বাকি রয়েছে। অন্তত অধস্তনদের থেকে তো নয়ই। বস্তুতপক্ষে, তিনি অধস্তনদের মহামূর্খ ভাববেন। তিনি ভাবতেই পারেন না যে, তাঁর থেকে বেশি কোনও অধস্তন জানতে পারে।

বসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মনেই রাখেন না যে, তিনি যেমন চারপাশের অধস্তনদের সারাক্ষণ মাপছেন, অধস্তনরাও তাঁকে নিরন্তর মেপে চলেছে। ফলে, নিজেকে বদলানো বা শোধরানোর কথা তার কখনই মনে হয় না।

বসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, অফিসের শৃঙ্খলারক্ষার স্বার্থে যেসব নিয়ম-কানুনাদি রয়েছে, তা কেবল অধস্তনদের জন্য। সেইসব নিয়মাদি মানবার কোনও দায়ই নেই তাঁর। মিটিং ডেকে তিনি প্রতিবারই সেই মিটিংয়ে দেরিতে আসবেন, কিন্তু অধস্তনদের কেউ এক-আধদিন সামান্য দেরিতে এলে পাংচুয়্যালিটি নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেবেন। নিদেন কটমট করে তাকিয়ে (যাকে ইংরেজিতে স্টেয়ার করা বলে) বিরক্তিটা বুঝিয়ে দেবেন। তিনি সারাক্ষণ অধস্তনদের অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনের পরামর্শ দেবেন, কিন্তু নিজের ব্যবহৃত গাড়িটিকে কিংবা কামরাটিকে টিপটপ রাখবার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ওড়াবেন। অধস্তনর পুরোনো টেবিলটি মেরামত করবার নোটে তিনি হাজার গণ্ডা কোয়্যারি করবেন, কিন্তু নিজের কামরার তোয়ালে, পর্দা, কার্পেট, এমন কি কম্প্যুটর অবধি তিনমাস অন্তর বদ্‌লে নেবেন।



বসের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বাপের বয়েসি উচ্চপদস্থ অধস্তনদেরও নাম ধরে ডাকবেন এবং 'তুমি' সম্বোধন করবেন। মনীশ, য়্যু ডু ওয়ান থিং...একটা গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি স্পটে চলে যাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বসের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, রামগরুড়ের ছানাটি হয়েও তিনি বিশ্বাস করবেন যে, তাঁর মধ্যে রসবোধ প্রবল। ফলে, কদাচিৎ তিনি একটা মোটা দাগের মস্করা করলে অধস্তনদের হেসে কুটিপাটি হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একজন বসের কাহিনি মনে পড়ছে। একটি মালটিন্যাশন্যাল কোম্পানির টপ বস একদিন তাঁর অফিসের সমস্ত মহিলা কর্মচারীকে নিজের কোয়ার্টারে লাঞ্চে ডাকলেন। নিমন্ত্রিত মহিলারা তো সব্বাই পোশাকে, প্রসাধনে, অলঙ্কারে যারপরনাই মাঞ্জা দিয়ে হাজির হয়েছেন লাঞ্চের পার্টিতে। ডাইনিং-হল জুড়ে লম্বা খাবার টেবিল। টেবিল ঘিরে বসেছেন সবাই। খাবার পরিবেশনের আয়োজন চলছে। এমনি সময়ে সদাগম্ভীর বসের মনে হল, পরিবেশটাকে একটুখানি রসসিক্ত করা উচিৎ, যাতে করে অধস্তন মহিলা কর্মচারিরা বুঝতে পারেন, আপাতকঠিন বসের মধ্যে কী পরিমাণ রসের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারাটি বইছে। যেই না ভাবা, অমনি তিনি বলে উঠলেন, ওয়েল চার্মিং লেডিজ, ক্যান য়্যু টেল মি, হোয়াট ইজ ইন বিটুইন মাই টু লেগস্? অর্থাৎ, সুন্দরীরা, বলতে পারো, আমার দু'পায়ের মধ্যিখানে কোন বস্তুটি রয়েছে? শুনে তো সুন্দরীদের মুখ নিমেষের মধ্যে নিদারুণ লজ্জায় গোলাপি। মুহূর্তে হেঁট হয়ে আসে সবগুলি মাথা। তাও অত্যধিক স্মার্ট হিসেবে খ্যাত কেউ কেউ ব্রীড়াবনত মুখে তোতলাতে থাকে, এক্সট্রিম্‌লি সরি স্যার, কান্ট গেস স্যার।

মুচকি হেসে প্রায় ঐশ্বরিক ওদার্যে বস বলে উঠলেন, ভেরি সিম্প্‌ল, দ্য লেগ অফ দিস টেব্‌ল। ততক্ষণে সুন্দরীর দল আবিষ্কার করেছেন, বস তাঁর দুটো পা টেবিলের পায়ার দু'দিকে রেখেছেন। ফলে, পায়াটি বসের দুটো পায়ের মধ্যিখানে ঠাঁই পেয়েছে। এতক্ষণ ওই নিয়ে যা-তা ভাবছিলেন বলে মনে মনে নিজেদের যৎপরোনাস্তি বকেঝকে সুন্দরীর দল কলকল করে ওঠেন, ইয়েস স্যর, ইট ইজ লেগ অব দ্য টেব্‌ল স্যর। সরি স্যর, উই ডিড নট নোটিস স্যর। আবার ঐশ্বরিক ঔদার্যে বলে উঠলেন বস, নেভার মাইন্ড, ইট্‌স ওল রাইট। পরমুহূর্তে মনে করিয়ে দিলেন, 'আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং।'

—এ ভেরি গুড জোক স্যর। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। সুন্দরীর দল কলকলিয়ে ওঠে।

এরপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। সুস্বাদু খাবার-দাবারে যখন সবাই প্রায় মজে গিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বস পা'দুটোকে টেবিলের পায়ার একদিকে নিয়ে এলেন। তারপর আচমকা বলে উঠলেন, ওয়েল চার্মিং লেডিজ, ক্যান য়্যু টেল মি, হোয়াট ইজ ইন বিটুইন মাই টু লেগস?

মহিলারা এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, ইয়েস স্যর, দ্য লেগ অফ দ্য টেব্‌ল।

—নো, নো, ডার্লিং। নট অ্যাট ওল। দিস টাইম, ইট ইজ হোয়াট য়্যু থট আর্লিয়ার। (তোমরা আগের বারে যা ভেবেছিলে, এবারে সেটাই রয়েছে)। বলেই বস নিজের প্রবল রসজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন। এবং অধস্তনতার শর্ত অনুসারে সেই হাসির প্রতিধ্বনি সমবেতভাবে শোনা গেল সবগুলি মহিলার কণ্ঠে।

বসের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি পুরোপুরি রেডিও টাইপ হবেন। অর্থাৎ অধস্তনকে একটি বাক্যও বলতে না দিয়ে তিনিই সারাক্ষণ বলবেন। অধস্তনদের একেবারে টেপ-রেকর্ডারের মতো নিঃশব্দে সেই অমৃতবাণী পান করতে হবে। অন্যদিকে, অধস্তনদের কথা শুনবার বেলায় তিনি হবেন, রেডিও'র মতোই, একেবারেই বধির।

বস নামক এই অদ্ভুত প্রজাতিটিকে, মেসোমশায়ের পরামর্শমতো, 'রসেবশে' রাখা চাই। নইলে কর্মক্ষেত্রে তোমার লাইফ হেল হয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই ওঠে ওই লাখ টাকা মূল্যের প্রশ্নটি, কিনা, এমন অদ্ভুত প্রাণীটিকে রসেবশে রাখবার মোক্ষম দাওয়াইগুলি কি কি? পরে কখনো তাই নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

বসের বস

বসকে বশ করবার মহৌষধি বাতলাতে গিয়ে মনে হলো, বসের অতুল মহিমার অনেককিছুই অব্যক্ত থেকে গিয়েছে। অবশ্য যাঁদের গুণকীর্তন শতমুখে করলেও ফুরোয় না, আমার কীই বা সাধ্যি যে মাত্র একটি-দুটি কিস্তিতে তা শেষ করি। তবুও বসদের অন্তত আরও কিছু গুণের কথা না বললে তাঁদের প্রতি মহা অবিচার করা হবে।

বসদের একটা মহাগুণ হল, অধস্তনদের সঙ্গে আচরণের বেলায় তিনি সৌজন্যের ধার



ধারবেন না। অধস্তনর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার সময়, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখবেন। অফিসের বাইরেও কোনও সার্বজনীন অনুষ্ঠানে দেখা হলে তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তে অধস্তনদের থেকে ষোলআনার জায়গায় আঠারো আনা সৌজন্য দাবি করবেন। সে ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলেই তিনি 'এক্সেপশন' নেবেন। তিনি সর্বদাই চাইবেন, তাঁর অধস্তনরা যেন বিনয় ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা হয়, কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে বিনয়ের লেশমাত্র থাকবে না। তাবলে কোনও সময়ই কি থাকবে না? থাকবে বৈকি। ইউনিয়নের নেতারা এসে চেপে ধরলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে ভোল বদলে ফেলে একেবারে বিনয়ের অবতারটি সাজবেন।

বসেরা এমনিতে কিঞ্চিৎ ভিতু প্রজাতির মানুষ। তাবলে সব সময়ই কি তিনি ভিতু? মোটেই নয়। তিনি সর্বদা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। এ বিষয়ে বেড়ালের সঙ্গে তার অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য। নরম জমি পেলে মনের পুলকে আঁচড়াতে থাকবেন, কিন্তু শক্ত জমি বোঝা মাত্তর নখ গুটিয়ে নেবেন। বসের আর একটি বড় গুণ হল, তিনি তস্য বসকে যমের মতো ভয় পাবেন। অধস্তনদের কাছে যতই হম্বিতম্বি করুন না কেন, তস্য বসের কাছে তিনি সারাক্ষণ কেঁচো হয়ে থাকবেন। এমন কি, অধস্তনদের ওপর প্রবল চোটপাট করাকালীন তস্য বসের থেকে ফোন পাওয়া মাত্রই তাঁর সারা মুখমণ্ডলে একেবারে ভোজবাজির মতো তাৎক্ষণিকভাবে নব-সূর্যোদয় ঘটে যাবে। প্রবল রোষে গনগনে হয়ে থাকা মুখমণ্ডল নামক আগুনের গোলাটি দেখতে দেখতে মাখনের তাল হয়ে উঠবে, এবং ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তস্য বসের কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর উত্তাপে সেই মাখন দ্রুতগতিতে গলতে থাকবে। অবশেষে, কথোপকথন শেষে, যখন রিসিভারটি নামিয়ে রাখবেন, ততক্ষণে তাঁর সারা মুখমণ্ডল ভয়ে-ভক্তিতে-রোমাঞ্চে-আহ্লাদে অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে।

বসমাত্রেই ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা ক্যারিয়ারিস্ট হবেন। নিজের ক্যারিয়ারের ওপরে দুনিয়ার কোনও কিছুকেই স্থান দিতে পারবেন না তিনি। এ ব্যাপারে কাকেদের সঙ্গে তাঁর অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য। কাকেদের যেমন দুনিয়ার সবকিছু দেখবার কালেও সর্বদা একটি চোখ পার্শ্ববর্তী উঠোনে গেরস্থের শুকোতে দেওয়া বড়ি-আচারের বয়ামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, ঠিক তেমনি, বসরাও সমস্ত রকম সরকারি কাজকর্মের ফাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা একটা চোখ নিবদ্ধ রাখবেন নিজের ক্যারিয়ারের দিকে। নেক্সট ইনক্রিমেন্টটা কবে হচ্ছে, নিজের পে-ফিক্সেশনটা ঠিকঠাক হল কিনা, প্রমোশন-তালিকাটিতে তাঁর নাম কত নম্বরে, এবং যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে করে তাঁর ভাগ্যে শিকেটি ছিঁড়তে আর কত দেরি, কাউকে ধরে-করে কোনও অন-সার্ভিস ট্রেনিং কোর্সে নামটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা, এইসব ভাবনা তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে সর্বদাই। কাজের চেয়েও নিজের সুখ্যাতি ও পদোন্নতির জন্য তিনি যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে তিলমাত্র পিছপা হবেন না। এবং সেজন্য প্রয়োজনে কোনও অধস্তনকে যূপকাষ্ঠে চড়াতেও দ্বিধা বোধ করবেন না। বস্তুতপক্ষে, যে বস সর্বদা অধস্তনদের কাঁধে বন্দুকটি রাখতে ওস্তাদ নন, তিনি বস পদবাচ্যই নন। সর্বদা সরকারি ব্যবস্থার ক্ষীর-মালাইটি খাবেন, কিন্তু দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেবার বেলায় তিনি অতি কৌশলে অধস্তনকে এগিয়ে দেবেন। সরকারি কাজের যাবতীয় ঝক্কি অধস্তনর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি কেবল ফলটি পাকবার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকবেন।

কারণ, ফলটি পাকবা মাত্তর তিনি ওই ফলটি ফলানোর যাবতীয় কৃতিত্ব নিজেই নিজেকে অর্পণ করবেন। আর, ফলটি যদি শেষ অবধি টক হয়, তবে অপরিসীম দক্ষতায় অধস্তনদের একজনকে 'স্কেপ-গোট' বানিয়ে ফেলবেন।

বস মাত্রেই সময় বিশেষে ভুলো মনের হবেন। সত্যিকারের বস কোনও কিছুই মনে রাখবার দায় স্বীকার করেন না। দপ্তরের কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত যা বলবেন, করবেন, পরমুহূর্তেই ভুলে যাবেন। কেবল নিজের স্বার্থ রয়েছে এমন ক্ষেত্র ছাড়া তার ব্যত্যয় হবে না কখনোই। কিন্তু সেই তিনি আবার অধস্তনর সামান্য বিস্মরণও সইতে পারবেন না। এবং অধস্তনর বিস্মরণজনিত তিলমাত্র শিথিলতা দেখলেই তিনি সেটাকে 'ইর্‌রেসপনসিবিলিটি' 'ইন্‌সিনসিয়ারিটি' 'নেগ্‌লিজিয়েন্স অফ ডিউটি' ও 'ডেরিলিক্‌শন অফ ডিউটি' জাতীয় অভিধায় ভূষিত করে অধস্তনকে একেবারে তিনকড়ার পাজি বানিয়ে ছাড়বেন।

বস কদাচই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন না। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্নে তিনি সাধারণত দুটি বিখ্যাত পথ ধরে চলবেন। এক, অল্পস্বল্প ঝুঁকির ব্যাপার হলে, তিনি ফাইলের পাতায় এমন সন্ধ্যাভাষায় নির্দেশ দেবেন, যার মানে অ্যাঁ-ও হয়, ওঁ-ও হয়। আর, দুই, নির্দেশ দেবার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকি থাকলে তিনি ফাইলের তলায় 'প্লিজ ডিসকাস' লিখে তা অধস্তনর কাছে ফেরৎ পাঠাবেন। এবং অধস্তন ফাইলটি নিয়ে আলোচনার জন্য হাজির হলে নির্দেশটি মুখে বলে ফাইলে 'অ্যাজ ডিসকাস্‌ড' লিখে সই করে দেবেন, যাতে ভবিষ্যতে ওই নিয়ে কোনও ঝামেলায় পড়লে, সোনামুখ করে বলে দিতে পারেন, 'আমি তো এমন নির্দেশ দিইনি, আপনি আমার কথা বুঝতে ভুল করেছেন।'

এই প্রসঙ্গে একজন বসের কথা মনে পড়ছে। ভদ্রলোক প্রায় আশি শতাংশ ফাইলেই 'প্লিজ ডিসকাস' লিখে ফেরৎ পাঠাতেন। কালক্রমে তিনি অধস্তনমহলে 'ডিসকাস-থ্রো সাহেব' নামে অভিহিত হন। তো, অফিসের অ্যানুয়াল স্পোর্টসের সময় যখন সমস্ত সেকশনে নোটিস দিয়ে প্রতিযোগীদের নাম চাওয়া হলো, 'কে বা কাহারা' ডিসকাস-থ্রো বিভাগে বসের নামটা বেনামে জমা দিল গেম-সেক্রেটারির কাছে। নির্দিষ্ট দিনে ডিসকাস-থ্রো আইটেমটির প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যখন মাইকে অন্যদের সঙ্গে বসের নামও ঘোষিত হল, রঙিন সামিয়ানার তলায় সপরিবারে বসে থাকা বসের চোখমুখের যা অবস্থা দেখেছিলাম, অনেকদিন মনে থাকবে। ঘোষকের আর গেম-সেক্রেটারির তো চাকরি যাবার উপক্রম।

বস অবশ্য সুযোগ পেলেই অধস্তনদের সঙ্গে একটু-আধটু মসকরা করতে ভালোবাসেন। তবে সর্বসাধারণের মসকরার সঙ্গে বসের মসকরার একটুখানি পার্থক্য রয়েছে। যখন ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাঁর মুখমণ্ডলে শ্রাবণের কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আড়াল থেকে হাসি নামক ঈষৎ চিকসানি রোদ্দুর দেখা যায়, তৎসহ তাঁর মুখনিঃসৃত দুই-চারিটি বাণীকে রসিকতা বলে ভ্রম হয়, তখন অধস্তনকে বুঝে নিতেই হবে যে, তিনি মসকরা করছেন। আর, বসের মসকরার জবাবে যে অধস্তন তৎক্ষণাৎ গদগদ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হন, তার কপালে দুঃখু রয়েছে।

বসকে বশ

কর্মক্ষেত্রে বস নামক আজব ভাগ্যনিয়ন্তাটির কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকের রচনায়, বসের নিয়ত রোষদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার এবং সম্ভব হলে, একটুখানি অনুগ্রহ লাভের উপায়গুলি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। দীর্ঘকাল টেঁটিয়া বসদের নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে 'ঘর' করেছেন এমন পোড় খাওয়া শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ এবং স্বয়ং দীর্ঘ তিরিশ বছরের বস-ট্যাক্‌লিংয়ের অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে এই বস-সামলানোর বটিকাটি বানালাম।

সব প্রজাতির বসদের সম্পর্কে যে আপ্তবাক্যগুলি প্রযোজ্য, তার মধ্যে প্রথম সারির কথাটি হল, অনেক বস হরেক সূক্ষ্ম অভিপ্রায় নিয়ে কখনো কখনো আপনার সঙ্গে একটুখানি গা ঘসতে চাইবেন। অধস্তনসুলভ হ্যাংলামোয় সেই ফাঁদে পড়েছেন কি মরেছেন। হাজার লোভনীয় প্ররোচনা সত্ত্বেও বসের সঙ্গে কদাপি মাখামাখি করতে যাবেন না। 'বসের পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ' প্রবচনটি এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয়েছেন কি আপনাকে আর বাঁচানো যাবে না। এছাড়া, 'ঘোড়ার পেছনে আর বসের সামনে পারতপক্ষে যেতে নাই।' পোড়খাওয়া অধস্তনদের এই আপ্তবাক্যটি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাবেন না।

আর, দ্বিতীয় কথাটি হল, কোনও বিষয়ে বসের দেওয়া যুক্তির জবাবে কদাপি পাল্টা যুক্তি দেবার চেষ্টা করবেন না। সেটা হল, বসের মতো সবজান্তা মানুষটিকে 'জ্ঞান' দেবার মতো মারাত্মক অপরাধ। আপনার বক্তব্যটি একেবারে অকাট্য হলেও না। সর্বদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবেন যে, বস ক্যান ডু নো রং। বসের জ্ঞানগম্যি নিয়ে সংশয়প্রকাশ তো দূরের কথা, প্রসঙ্গই তুলবেন না কারোর কাছে। বরং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবেন, বস আপনার থেকে ঢের বেশি জ্ঞানী।

কিন্তু কোনও বিষয়ে নোট দেবার বেলায় আবার ওপরের নীতি মানা চলবে না। কারণ, বসের মতে অফিসার তিন প্রকার। একেবারে নিকৃষ্ট জাতের অফিসার হল তারাই, যারা বসের কাছে কেবল সমস্যাটাই পেশ করে, কোনওরূপ সমাধানের পথ বাতলায় না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সমাধান বাতলানোর ঝক্কিটা বসের ওপরেই বর্তায়। দুনিয়ার কোনও বসই সেটা পছন্দ করেন না। উৎকৃষ্ট অফিসার হল, যারা বসের সামনে একটি সমস্যার সঙ্গে একটি সমাধানও পেশ করে। তারা বসকে মাথা খাটিয়ে সমাধান বের করার কষ্টটা দিতে চায় না।

কিন্তু তারাও বসের নয়নের মণি নয়। বসের চোখে উৎকৃষ্টতম অফিসার হল সে-ই, যে কিনা একটি সমস্যার সঙ্গে অন্তত দুটো সমাধান পেশ করে। কেন কি, অধস্তনদের প্রস্তাব নাকচ করাটা বসদের জন্মগত অধিকার। উৎকৃষ্ট অফিসাররা একটি সমস্যার সঙ্গে মাত্র একটি সমাধান পেশ করে বসকে তাঁর সেই মৌলিক ক্ষমতাটি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু

উৎকৃষ্টতম অফিসারটি একটি সমস্যার সঙ্গে দুটি সমাধান বাতলানোর ফলে বস তার মধ্যে একটি সমাধান-প্রস্তাবকে নাকচ করে নিজের জন্মগত অধিকারটি প্রয়োগ করবার সুযোগ পান।

তৃতীয় কথাটি হল, বসকে নিয়ে কখনোই কলিগদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। ভালো আলোচনাও না। বলা যায় না, কলিগ আপনার কথাকে কিভাবে টুইস্ট করে বাজারে ছাড়েন এবং আপনাকে কোন্ বাঁশটি দেন।

বড় বস মেজো বসের ঠাণ্ডা লড়াই, সে এক আশ্চর্য মোরগ লড়াই। এবং তা আপনার পক্ষে ঘোরতর আশঙ্কার কারণ। কেন কি, ঐ লড়াইতে আপনাকে বারবার একটা পক্ষ



নেবার জন্য প্ররোচনা আসবেই। আপনি সেই প্ররোচনায় পা দিয়েছেন কি ধনেপ্রাণে মরেছেন।

বসের কাছে সারাক্ষণ ইনডিসপেনসিবল হয়ে থাকতে পারাটা এক ধরনের আর্ট। সেই আর্টটি রপ্ত করতে পারলে আপনি আজীবনকাল বসের নয়নের মণি হয়ে থাকতে পারবেন। তেমনই একজন ইনডিসপেনসিবল সাবঅর্ডিনেটকে চিনতাম। আসল নামটা গোপনই রাখছি। ধরে নিন, তাঁর নাম কপোতাক্ষ চন্দ। চন্দ সাহেব লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে চাকরিতে ঢুকে আপার ডিভিশন ও সেকশন অফিসারের সিঁড়িগুলি ভেঙে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়ে রিটেয়ার করেন। চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিজেকে অপরিহার্য করে তোলার সাধনায় মগ্ন থাকতেন তিনি। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। দপ্তরের প্রায় সব সেকশনের যে-কোনও উদ্ভুত সমস্যায় তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ মুশকিল আসান। সেই কারণেই দপ্তরের যে-কোনও সমস্যায় তারই ডাক পড়তো সর্বাগ্রে। সাধনার অঙ্গ হিসেবে তিনি নানান ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আরও একটা জিনিস রপ্ত করেছিলেন। অন্য সেকশনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলোকে হাতের কাছে পেলেই তিনি ওগুলোকে নিজের আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। দিনকয়েকের মধ্যেই ফাইলটির খোঁজ পড়ত। এবং সারা সেকশন যখন ফাইলটি খুঁজে খুঁজে হেদিয়ে পড়েছে, তখনই ডাক পড়ত চন্দসাহেবের। এবং চন্দ সাহেব কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির ভান করে একসময় সবাইয়ের অলক্ষ্যে নিজের আলমারি থেকে ফাইলটি বের করে পেশ করতেন সাহেবের সামনে। বলাই বাহুল্য, একেবারে ধন্য ধন্য রব উঠত চতুর্দিকে। তছাড়া, একটা লম্বা স্টেটমেন্ট দুদিনের কঠোর পরিশ্রমে তৈরি করে একজন সহকর্মী যখন একটুখানি বাইরে গিয়েছেন, চন্দসাহেব একফাঁকে ফাইলটি খুলে স্টেটমেন্টের দু'চারটি সংখ্যায় কিছু হেরফের করে দিতেন। যোগফল কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকত। যথাসময়ে সাহেবের কাছে তা পেশ হওয়া মাত্র সাহেব একটুখানি মিলিয়ে দেখতে গেলেই গলদটা ধরা পড়ত, কিনা, আয়ের দিক আর ব্যয়ের দিকের যোগফলটা এক দেখানো হলেও স্টেটমেন্টের প্রতিটি এন্ট্রির যোগফলের সঙ্গে তা মিলছে না। কাজেই, একসময় চন্দসাহেবের ডাক পড়ল। এবং চন্দসাহেব যেহেতু জানেন, কোন্ কোন্ এন্ট্রিতে তিনি গোলমাল করে রেখেছেন, ওই সংখ্যাগুলি সংশোধন করে নিয়েই তিনি বসকে দেখিয়ে দিলেন যে এবার যোগটা ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। বস তখন শত মুখের জায়গায় হাজার মুখে চন্দসাহেবের প্রশংসা করতেন।

সমগ্র কর্মজীবন ধরে চন্দসাহেব তাঁর ইনডিসপেনসিবিলিটির পুরস্কার তো পেয়েইছেন, অবসর নেবার পরও তিনি রেকর্ড সময় এক্সটেনশন পেয়েছিলেন।

তবে কি বসকে বসেবশে রাখবার তাড়নায় আপনি সারাক্ষণ বসের একেবারে ভেড়ুয়াটি হয়ে থাকবেন? কদাচ নয়। নিজের এলেম জাহির করবার জন্য আড়ালে আবডালে একান্তজনদের কাছে রাজা-বাদশা মারবেন বৈকি। নইলে আপনার 'ব্যক্তিত্বের' বিকাশ ঘটবে কী করে? তবে দেখবেন, কথাগুলো যেন আপনার বসের কানে না যায়। এই প্রসঙ্গে, আড়ালে সারাক্ষণ আই-এ-এসদের পিণ্ডি চটকান এমন একজন স্টেট সার্ভিসের অফিসারের কথা মনে পড়ছে। নিজের কোয়ার্টারে বসে বসে আই-এ-এসদের মুণ্ডুপাত করতেন প্রায়দিনই। তো, একদিন সন্ধেয় জমিয়ে নিজের আই-এ-এস বসের মুণ্ডুপাত করছিলেন

দাদা। আমরা পোলাপানরা বসে বসে শুনছিলাম আর শিউরে শিউরে উঠছিলাম। এমনি সময়ে মিঃ ষড়ঙ্গীর আবির্ভাব ঘটলো। তাঁকে দেখা মাত্রই দাদা সটান উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ ষড়ঙ্গী সদ্যসদ্য আই-এ-এস পাশ করে প্রোবেশনার হিসেবে ওই জেলা সহরে যোগদান করেছেন। পাক্কা আই-এ-এসদের মতো তখনো অবধি অতখানি স্ট্যাটাস-কনসাস হয়ে ওঠেননি। প্রবীণ স্টেস-সার্ভিস অফিসারদের বাড়িতে হরবখত আড্ডা মারতে যান। সেদিন সন্ধেয় মিঃ ষড়ঙ্গীকে নিয়ে আমাদের দাদা যে কী করবেন, কোথায় বসাবেন, তাই নিয়ে তিনি যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

যথাযোগ্য আসনে জুত করে বসে মিঃ ষড়ঙ্গী গল্প জুড়লেন। একসময় কথায় কথায় বললেন, বাই-দ্য-বাই, মিঃ সেন, ডি-এম বলছিলেন, আর য়্যু ইনটেরেস্টেড ইন আড্ডা?

—মানে, স্যর?

—মানে, ডি-এম বলছিলেন, আপনি আড্ডায় যেতে চান?

—ডি-এম বলছিলেন? বলতে বলতে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠে দাদার মুখখানি। বলে ওঠেন, আড্ডায়? হোয়াই নট স্যার, ওলওয়েজ স্যার। ডি-এম চাইছেন, আর আমি যাবো না? তাই আবার হয়? তাছাড়া, আড্ডা মারতে আমি খুবই ভালোবাসি। ডি-এম'কে বলবেন, কবে-কখন-কোথায় আড্ডা বসবে জানালে, আমি যথাসময়ে গিয়ে হাজির হবো স্যর।

মিঃ ষড়ঙ্গী বললেন, আহা, সে আড্ডা নয়। Asansole-Durgapore Development Authority, সংক্ষেপে, ADDA, ওখানে একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি ইন্টেরেস্টেড? কোয়ার্টার আছে, স্পেশাল পে আছে, এক্সটেনসিভ টুর রয়েছে। যদি যেতে চান তো ডি-এম সাহেব চেষ্টা করতে পারেন।

দাদার মুখখানা তখন দেখবার মতো।

ভেতো বাঙালির ইংরেজি প্রেম

ইংরেজ এদেশ থেকে চলে গিয়েছে সেই কত বছর আগে, কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা আমাদের জীবন থেকে যায়ই তো না-ই, বরং আরও মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসেছে।

এদেশীয়দের ইংরেজিয়ানার প্রতি অন্ধ প্রীতি নিয়ে সেই এক শতাব্দী আগে ছড়া বেঁধেছিলেন এক রসিক মানুষ, কিনা, 'আমরা ইংরেজি কায়দায় হাসি,/ফরাসি কায়দায় কাশি/আর, ঠ্যাং ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড়ই ভালোবাসি।' সেই ট্রাডিশন ইংরেজরা চলে যাবার এত বছর বাদেও সমানে চলেছে।

সমাজে যাদের বলা হয় 'হাই-আপ্‌স', তাদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, মধ্যবিত্ত, এমন কি নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যেও যে ভাষাটার প্রতি কী পরিমাণ মোহ!

আমার স্কুল জীবনের একজন হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ছে। তিনি বাংলায় এম-এ, কিন্তু হেড-স্যার হওয়ার সুবাদে উঁচু ক্লাসে ইংরেজি পড়াতেন। বস্তুতপক্ষে, আমাদের স্কুলজীবনে হেড-স্যার যে-বিষয়েরই এম-এ হোন না কেন, উঁচু ক্লাসে ইংরেজি পড়ানোটা তাঁর এক ধরনের জন্মগত অধিকার বলেই ধরে নেওয়া হতো। তো, বাংলায় এম-এ হয়েও আমাদের স্কুলের সেই হেড-স্যারটির ইংরেজি ভাষার প্রতি এক ধরনের দাস্যভাব ছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের শোনাতেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তর গল্প। তিনি নাকি ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে, বলতে, ভাবতে, এমন কি স্বপ্ন দেখতেও পারতেন। কথাগুলো বলতে বলতে হেড-স্যারের সারামুখ গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।



মাইকেলের কথা অবশ্যি স্বতন্ত্র। তিনি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও অগাধ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের আধাশিক্ষিত, সিকিশিক্ষিতরা, যাঁরা কিনা মাতৃভাষাটাও ভালো করে শেখেননি, তাঁরা যখন তাঁদের পুত্রকন্যাদের ইংরেজি ভাষায় গড়গড়িয়ে কথা বলবার স্বপ্ন দেখিয়ে চলেন, তখন কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের উপমাটাই মনে আসে বৈকি। মাধ্যমিক পাশ মা তার আত্মজটিকে, মুখে বুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই, ইংরেজি শেখাবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন, চারপাশে চোখ চারালে নিত্যিদিন এমন দৃশ্য হরবখত দেখতে পাই। মনে পড়ছে, একদিন আমি আমার অফিসের গাড়ির চালকের বাড়িতে গিয়েছি, ভদ্রলোকের এইট-পাশ স্ত্রী আমার সামনে তাঁর বছর আড়াই-তিনের বাচ্চাটিকে এনে বসিয়ে দিলেন পরীক্ষার আসর। তোমার নোজ কোথায়, ইয়ার কোথায়, আই কোথায়? দেখিয়ে দাও আঙ্কেলকে। তোমার হেড কই, লেগ কই, হ্যান্ড কই? আন্টিকে তোমার হ্যান্ডের ফিঙ্গারগুলো দেখাও। এই দ্যাখো, তোমার ড্যাড এলেন। ডাকো, ড্যাড...ড্যাড।

বলবেন, ভালই তো, একটা বাড়তি ভাষা শিখে নিলে খারাপ তো কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুর ছেলেটিকে তার 'মাম্মি'র নির্দেশে এক্সটেম্পোর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে দেখে যদি শুধোই, বাংলাটা কেমন শিখছে? তো, তার জবাবে অনেক বাঙালি বাবা-মাকে খুব দেমাকি গলায় বলতে শুনেছি, বাংলাটা তো একেবারেই পড়তে পারে না, এমন কি, ভালো করে বলতেই পারে না। এই তো সেদিন, আমার এক ডাক্তার বন্ধু সপরিবারে এলেন আমার বাড়িতে। আমি ওঁর ছেলেমেয়েদের আমার লেখা দুটি কিশোর উপন্যাস উপহার দেওয়া মাত্তর ছেলেমেয়েদুটি বাবা-মায়ের দিকে বিপন্ন মুখে তাকায়। বন্ধুটি একগাল হেসে বলেন, ওরা আসলে, ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে তো, বাংলা বই পড়তেই পারে না।

আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ আলোক ঘোষাল ফি-বছর তাঁদের পাড়ার দুর্গোপুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটা পদ অবশ্যই রাখেন। দু'মিনিট নিখাদ বাংলায় বক্তৃতার প্রতিযোগিতা। সফল প্রতিযোগীদের জন্য লোভনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। সেটা সবাইয়ের কাছে একটা মজাদার অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় এই কারণে যে, কবিগুরুর স্বদেশীয়দের মাত্র দু'মিনিট নিখাদ বাংলায় বক্তৃতা করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে শ্রোতারা লজ্জায় মাথা হেঁট করবার বদলে হেসে লুটিয়ে পড়েন।

এই প্রসঙ্গে একজন ডবল এম-এ পাশ বাঙালির কথা মনে পড়ছে। ভদ্রলোক ছিলেন ইংরেজি এবং বাংলায় এম-এ। যখন বাংলায় বক্তৃতা দিতেন, মুড়ি-মুড়কির মতো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন। কৈফিয়ত হিসেবে বলতেন, আমি ইংরেজিতে এম-এ তো, ইংরেজি শব্দগুলো এসেই যায়। আবার যখন ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন, তখনও মাঝে মাঝে কিছু বাংলা শব্দের ফোড়ন দিয়ে বসতেন। কৈফিয়ত হিসেবে বলতেন, একে তো বাংলায় এম-এ, তার ওপর কবিগুরুর দ্যাশের লোক, বাংলাটা তাই রক্তের মধ্যে রয়েছে।

আমাদের এই স্বাধীন দেশে, এখনও অবধি, কেউ গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলছে দেখলে, আমরা কেমন গদগদ হয়ে উঠি! পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটি বাবা-মায়ের সঙ্গে কুটকুট করে ইংরেজি বলে চলেছে, দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈর্ষায় জ্বলতে থাকেন।



এমন কি, শুনেছি, এই রাজ্যের এক ডাকসাইটে মন্ত্রী ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে গদগদ গলায় বলেছিলেন, কী আশ্চর্য দেশ, দুধের বাচ্চা অবধি গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলছে!

বাস্তবিক, ইংরেজিতে গড়গড়িয়ে কথা বলা, কিংবা কাউকে বলতে শোনা, ভেতো বাঙালির কাছে এর আকর্ষণ অপরিসীম। যেকোনও একটা সহজ বিষয়েও বাংলায় পাঁচ মিনিট বলতে গিয়ে পঞ্চাশবার খাবি খেলেও তিলমাত্র লজ্জিত হন না শিক্ষিত বাঙালি, কিন্তু ইংরেজি বলতে না পারার জন্য নিরন্তর হীনমন্যতায় ভোগেন।

তো, হচ্ছিল গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলা নিয়ে কথা। আমার এক সিনিয়র দাদা আমাকে একবার সে প্রসঙ্গে কিছু জ্ঞান দান করতে গিয়ে গুটিকতক 'টিপ্‌স' দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা হল, গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলতে চাইলে সব সময় জুতসই শব্দটি তোমার মগজ জোগান দিয়ে উঠতে পারবে না। তাই, সমস্ত কথার মধ্যে, মাঝে মাঝেই 'আই মিন', 'ইন ফ্যাক্ট', 'য়্যু নো' কিংবা 'অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' গোছের শব্দগুচ্ছের জুতসই ফোড়ন দিতে পারলে, পুনঃপুনঃ হোঁচট খাওয়াটা দক্ষতার সঙ্গে সামলে ওঠা যায়। কোনও একটি বাক্য বলতে গিয়ে আচমকা উপযুক্ত শব্দগুলি জিভের ডগায় না এলে, স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোতলানোর বদলে ওইসব শব্দগুচ্ছ দিয়ে ফাঁকটা দিব্যি ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই ফাঁকে সঠিক শব্দগুলোকে মগজ থেকে টেনে বের করা যায়।

আমার সেই দাদাটির দেওয়া 'টিপ্‌স'টি যে কতখানি মোক্ষম, পরবর্তীকালে একটা ঘটনায় তা হাড়ে হাড়ে মালুম পেয়েছিলাম। ঘটনাটি একেবারে যাকে বলে 'ট্রু ফ্যাক্ট' অর্থাৎ জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের একজন ভেতো-বাঙালি ডেপুটি সেক্রেটারি একটি প্রত্যন্ত জেলায় এসেছেন বিডিওদের গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে। জেলার সব বিডিওদের নিয়ে জেলাশাসকের চেম্বারে বসেছে জমজমাট মিটিং। গ্রামের উন্নয়ন কী কী উপায়ে হতে পারে, ডেপুটি সেক্রেটারি মশাই সারাক্ষণ ইংরেজিতে তা বলে চললেন। এবং আমরা সবাই লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে আটকে গেলেই বেশ দক্ষতার সঙ্গেই 'ওয়েল' শব্দটির ফোড়ন দিচ্ছেন। রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিন্‌স, ওয়েল, অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট, ওয়েল...অফ দ্য রুরাল পিপ্‌ল। এস্পেশিয়্যালি, ওয়েল...ইন আ পুয়োর কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, ওয়েল... রুরাল ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ, ওয়েল... নো অলটারনেটিভ...। এইভাবে ঘণ্টাটাক বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি হাজার খানেক 'ওয়েল' বললেন। খুবই কেতাবী বক্তৃতা, কোনও মৌলিকত্ব ছিল না সেই বক্তব্যে।

জেলাশাসক সারাক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বৈঠক শেষে ডেপুটি সেক্রেটারি ভদ্রলোক চলে যাবার পর তিনি বিডিওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলেন তো, কেমন ভাবে গ্রামের উন্নয়ন করতে হবে?

বিডিওরা সবাই অল্প মাথা নেড়ে স্পষ্ট জবাব দেবার দায় এড়াতে চান। কিন্তু জেলাশাসক নাছোড়বান্দা। বলেন, কী বুঝলেন বলুন দেখি?

জেলার সবচেয়ে ফাজিল বিডিও-সাহেবটি বলে উঠলেন, গ্রামের উন্নয়ন করতে হলে আমাদের প্রচুর সংখ্যায় ওয়েল অর্থাৎ কুয়ো খুঁড়তে হবে স্যার।

শুনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন জেলাশাসক। তাঁর হাসি আর থামতেই চায় না।

আমার মুখে ঘটনাটা শুনে চপলকুমার বলে, বাঙালি সাহেবকে বাংলা বলানোর একটা সোজা উপায় রয়েছে।

বলি, কী রকম?

—আচমকা খিস্তি খেলে বাঙালির মুখ থেকে মাতৃভাষাটা অজান্তে বেরিয়ে আসে।

—সত্যি?

চপলকুমার বলে, তাহলে আমার নিজেরই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। একদিন শেয়ালদা স্টেশনে টিকিট কাটতে লাইনে দাঁড়িয়েছি। বেশ লম্বা লাইন। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে চার নম্বর প্লাটফর্মে। সবাই চাইছে, ওই ট্রেনটা ধরতে। কিন্তু লাইন এগাচ্ছে অতি ধীরে। আচমকা কোট-প্যান্ট-টাই পরা এক দেশি সাহেব সটান জানালার কাছে গিয়ে কাউন্টারের মধ্যে টাকাশুদ্ধু হাতটা ঢুকিয়ে দিল। দেখেই তো লাইনে দাঁড়ানো সবাইয়ের মেজাজ গেল খিঁচড়ে। একজন ভদ্রলোক লাইন থেকে দৌড়ে গিয়ে সাহেবকে বললেন, এটা কী করছেন, স্যার? লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান। তার জবাবে সাহেব বলল, আই অ্যাম ইন হারি, ম্যান। আই অ্যাম অলরেডি লেট।

—তো কী হয়েছে? আমাদের ব্যস্ততা নেই?

লাইন থেকে আরও জনাদুয়েক বেরিয়ে গিয়ে চার্জ করলেন সাহেবকে।

সাহেবের মুখে তখন সমানে ইংরেজির খই ফুটছে। গড়গড় করে ইংরেজিতে বলতে লাগল, তিনি কত বড় সাহেব, কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে করতে হয়, এই ট্রেনটা ধরতে না পারলে রাষ্ট্রের কত ক্ষতি হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। চারপাশ থেকে সবাই পাতি বাংলায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, একজন শৃঙ্খলা ভাঙলে দেখাদেখি অন্যেরাও ভাঙবে। আমাদের মতো দায়িত্বশীল মানুষেরাই যদি শৃঙ্খলা ভাঙি, তবে লে' ম্যানরা কী করবে? তার জবাবে সাহেবও সমানে ছোলাকাঁকর চিবোতে চিবোতে ব্যাখা করতে থাকে, সে এই ট্রেনটা না ধরতে পারলে দেশের-দশের কত ক্ষতি হয়ে যাবে।

ইংরেজি-বাংলার যুগলবন্দী চলতেই থাকে, টিকিটের লাইন থমকে থেমে থাকে।

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানিনে, আচমকা পাশ থেকে বুড়োমতো একজন লোক গর্জন করে উঠলেন, চোপ শালা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল। সাহেব বুড়োটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কী বললেন আপনি? শালা বললেন আমাকে?

বুড়ো মুচকি হেসে বললেন, সত্যি সত্যি কই নাই। আপনারে বাংলা বলানোর জন্যই বলেছি।

—কে বললে আমি বাংলা বলতে পারি না?

—তাহলে এতক্ষণ বলছিলেন না কেন?

—আসলে, ইংরেজিতে ইজি ফিল করি। তবে বাংলাটাও খারাপ বলিনে। আফটার অল বাঙালির ছেলে—।

—ঠিক আছে, তাহলে বলুন দেখি, যদ্যপি আপনার দৃষ্টির সম্মুখে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বাষ্পীয় শকটে ভ্রমণের নিমিত্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহের আশায় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, মহাশয় কোন বিবেচনার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া উক্ত সারিতে দণ্ডায়মান না হইয়া সর্বাগ্রে প্রবেশপত্র সংগ্রহের নিমিত্ত লালায়িত হইলেন?

—এটা আবার কী ভাষা? মাথামুণ্ডু বোঝা দায়।

—মহাশয়ের এবং বিধ আচরণে কেবল যে নিদারুণ শৃঙ্খলাভঙ্গই ঘটিয়াছে তাহাই নহে, এতদ্দ্বারা আপনি অপর ব্যক্তিবর্গকেও শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্ররোচিত করিতেছেন। আপনাকে স্মরণ করিয়া দিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি যে, যে জাতির হনুকরণে আপনি এই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন এবং যাহাদের ভাষা বলিবার গলদঘর্ম প্রয়াস চালাইতে গিয়া আপনি ইত্যাবধি প্রভূত পরিমাণে চনক ও কংকর চর্বন করিলেন, তাহারা খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি। এহ বাহ্য, আপনাকে—।

—পণ্ডিত স্যা—র! আপনি?

—হ্যাঁ রে গর্ভস্রাব, আমি তোদের স্কুলের সেই হতভাগ্য পণ্ডিতমশাই, যে কিনা তোর মতো একটি গাধাকে পিটিয়ে পিটিয়ে একটা পরীক্ষাতেও সংস্কৃত ও বাংলায় পাশ করাতে পারেনি। স্কুলে থাকতে ইংরেজিটাতেও তো কখনও পাশ করেছিস বলে মনে পড়ে না। ব্যাটা, নিজের মাতৃভাষাটা বুঝতেও পারিস নে, তখন থেকে ইংরিজি মারাচ্ছিস?

ইংরেজি প্রেমের মাশুল

ভেতো বাঙালির ইংরেজি-প্রেম নিয়ে আমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি বিপদভঞ্জনের একেবারেই না-পসন্দ্।

বলে, কেউ যদি ইংরেজি ভাষাটার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা পোষণ করে, তাতে তোমার-আমার কী এল-গেল? তাদের উদ্দেশ্যে এত টিপ্পনিই বা কেন?

ঠিকই তো। নিজের ছাগলটিকে মানুষ যেদিক থেকেই কাটুক, আমার-আপনার বলবার কিছুই থাকতে পারে না, কিন্তু উঁচু ও মাঝের তলার বাঙালির এই ইংরেজি প্রেমের মাশুল যখন পুরোপুরি দিতে হয় এই পোড়া দেশের আধাশিক্ষিত/অশিক্ষিত গরিব মানুষদের, তখন যে ভারি দুঃখ হয় মনে। কেন কি, এঁদেরই 'কল্যাণে' অফিস-কাচারিতে এখনও অবধি সবকিছুই যে ইংরেজিতেই হয়, এবং ঐ ভাষাটি যে ওইসব অভাগারা বিন্দু-বিসর্গও বোঝে না বলে পদেপদে নাকানি-চোবানি খায়।

বেশ কিছুদিন ধরে সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের জন্য সরকার অফিসে অফিসে ফরমান পাঠাচ্ছে (যদিও তার অধিকাংশই ইংরেজিতে লেখা।), কিন্তু তাতে কাজের কাজ



হচ্ছে সামান্যই। কারণ, সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের মধ্যেই অনীহাটা সবচেয়ে বেশি। কথা বলে দেখেছি, এর মূলত দুটো কারণ। এক, ইংরেজির বদলে বাংলায় নোট দিতে বললে তাঁরা একটুখানি অপমানিত বোধ করেন, কিনা, এতদ্দারা তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি খাটো ধারণা করা হচ্ছে। দুই, দীর্ঘকাল ইংরেজিতে কাজকর্ম করতে করতে ভুল-ঠিক মিলে ব্যাপারটা একটুখানি সড়গড় হয়ে গিয়েছে। একটা বাঁধা গৎ এসে গিয়েছে কলমের ডগায়। কিন্তু মনের সেই ভাবটিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হলে, বাক্যগঠনে ও শুদ্ধ বানান লিখতে গিয়ে যে পরিমাণ গলদঘর্ম হতে হয়, তার চেয়ে ইংরেজিতেই লেখা-টেখাই শ্রেয় বলে মনে হয় ওদের।

যাঁরা অফিসে-অফিসে আজও ইংরেজিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য মরিয়া, তাঁরা ইংরেজি ভাষাটা জানেন কতটা? সেও বড়ই করুণ ছবি। বিশেষ করে, যাঁরা খুব নিচু পদ থেকে প্রমোশন পেতে পেতে শেষ জীবনে অফিসার হয়েছেন, তাঁদের সত্যিই স-সে-মি-রা অবস্থা। কেন কি, নিচু পদ থেকে প্রমোশন পাওয়ায় অল্পশিক্ষিত মানুষটি ইংরেজিটা বাস্তবিকই জানেন না, আবার, কেরানি হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু অফিসার হয়ে যাবার পর তিনি যদি উঠতে বসতে ইংরেজির সঙ্গে ঘর না করেন তো চারপাশের সবাইয়ের কাছে বেচারার নাক কাটা যাবে। বাস্তবিক সে এক উভয়সঙ্কট।

এই প্রসঙ্গে আমার এক সহকর্মীর কথা মনে পড়ছে। ভদ্রলোক ক্লাস সিক্স অবধি পড়ে ইউনিয়ন অ্যাসিস্টেন্টের পদে ঢুকেছিলেন। ধীরে ধীরে কর্মজীবনের শেষ পর্বে এসে প্রমোশন পান অ্যাসিস্টেন্ট এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসারের পদে। সংক্ষেপে পদটির নাম এ-এ-ই-ও। ধরা যাক, মানুষটির নাম মহীতোষবাবু। তাঁকে নিয়ে একেবারে করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, যখন রেগুলার এ-ই-ও লম্বা ছুটিতে গেলেন, এবং মহীতোষবাবু এ ই-ও'র চার্জে রইলেন। প্রতিদিন জেলা ও মহকুমা কৃষি অফিস থেকে গাদাগাদা চিঠি আসছে। সেইসব চিঠির মর্ম উদ্ধার করে প্রত্যাশিত রিপোর্ট পাঠানো। ভদ্রলোকের একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা।

একদিন একটা রিপোর্ট তৈরি করে আমাকে সই করাতে এলেন।

বললাম, জেলা-অফিস কী জানতে চেয়েছে?

মহীতোষবাবু খুব হালকা গলায় বললেন, ওই—, মে মাসে ক্রপ করতে হলে কী কী ডিফিকাল্‌টি হয়, জানতে চেয়েছে।

জেলা অফিসের চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়েই আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। লম্বা চিঠি। চাষীদের নিয়ে একটা সার্ভে চলছে, সেই ব্যাপারে কিছু জ্ঞানদান ও তৎসহ কিছু প্রশ্ন। কিন্তু মহীতোষবাবু ওই চিঠির একটিমাত্র বাক্যাংশের অর্থ তাঁর নিজের মতো করে নিয়েই তার ভিত্তিতে রিপোর্টটি বানিয়েছেন। বাক্যাংশটি হলো, ডিফিকালটি মে ক্রপ-ইন...। মহীতোষবাবু বাক্যাংশটির অর্থ করেছেন, মে মাসে ক্রপ করতে গেলে কী কী ডিফিকাল্‌টি হতে পারে...। এই যদি মূল চিঠির অর্থ বোঝার নমুনা হয়, তবে ইংরেজি ভাষায় সেই চিঠির জবাবটি কেমন দাঁড়িয়েছিল, তা বলা তো দূরের কথা, ভাবতে গেলেই অ্যাদ্দিন বাদেও আমার কান্না পায়।

আর একজন ওই গোত্রের সহকর্মীকে পেয়েছিলাম, তিনিও নিচু পদ থেকে প্রমোশন



পেয়ে অফিসার হয়েছিলেন। একদিন তাঁর একটি ছুটির দরখাস্তে চোখ বোলাতে গিয়ে আঁতকে উঠি। ছোট ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে ছুটি চেয়েছেন ভদ্রলোক। গোটাকতক বানান ভুল ছাড়া ছুটির দরখাস্তটি চিরাচরিত গৎ মেনেই লেখা হয়েছে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের বেলায় একেবারে আটকে গিয়েছেন ভদ্রলোক। লিখেছেন, অন অ্যাকাউন্ট অফ মাই লিট্‌ল ব্রাদার্‌'স ম্যারেজ সেরেমনি...।

ভদ্রলোককে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালাম। জিজ্ঞেস করলাম, ছোটভাইয়ের বিয়ে? ছুটি চাই?

একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস স্যার।

মুচকি হেসে বলি, ছোট ভাইয়ের ইংরেজিটা কী লিখেছেন?

শুনেই ভদ্রলোক খুবই উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন ওঁর দরখাস্তটার ওপর। প্রমুহূর্তে জিভ কেটে বললেন, ইস, তাড়াতাড়িতে মারাত্মক ভুল গিয়েছে স্যার। বলেই দরখাস্তটা আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে 'লিট্‌ল' শব্দটা কেটে 'স্মল' লিখে দিলেন।

ভদ্রলোকের দ্বিতীয়বারের ভুলটা শুধরে দিতে আর সাহস হয়নি আমার।

এ'তো গেল নিচু পদ থেকে উঠে আসা স্বল্পশিক্ষিত অফিসারদের ইংরেজির গোঁত্তা। কিন্তু সরাসরি নিযুক্ত মাঝারি পদের অফিসারের হরবখত ইংরেজির কশাঘাতও কি কম

সইতে হয়েছে আমাকে? অফিসের একটা অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বেশ কয়েকজন ভি-আই-পি ব্যক্তির কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন। চিঠিগুলো যাতে অবশ্যই প্রাপকদের হাতে পড়ে, তাই ওগুলো নিয়ে একজন অফিসারকে পাঠিয়েছিলাম বিলি করবার জন্য। দিনের শেষে ওই অফিসারটি কাকে কাকে চিঠি বিলি করেছেন, কাকে কাকে কীজন্যে দিতে পারেননি, একটি কাগজে তা লিখে সই করে আমার কাছে পেশ করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিপরীতে তাঁর মন্তব্যটি লেখা ছিল এইরকম : কুড নট গিভ দ্য লেটার ডিউ টু ইনভিজিব্‌ল চেয়ারম্যান। অফিসারটিকে ডেকে সামান্য জেরা করতেই জানা গেল, তিনি পৌরসভার অফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানকে দেখতে পাননি বলেই ওটা তাঁর করকমলে অর্পণ করতে পারেননি। ঐ ভদ্রলোককেই দেখেছি, নিজের নির্লোভ স্বভাবটা বোঝাবার জন্য মাঝেমাঝেই বলতেন, আমার কোনও 'অ্যাসপারশন' (অ্যাসপিরেশন?) নেই।

কেনাকাটা করাকে শপিং না বলে মার্কেটিং বলেন তো চোদ্দআনা শিক্ষিত বাঙালি। 'আজ সন্ধেয় আমরা একটুখানি মার্কেটিংয়ে বেরোবো।' আর, একটি রাজনৈতিক দলের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া নেত্রী তো প্রায় সব শব্দের আগে 'দি' বলেন বলে, বিরোধীরা সারাক্ষণ টিটকিরি করে। আই ওয়েন্ট ফ্রম দি ক্যালকাটা টু দি পণ্ডিচেরি অ্যান্ড ভিজিটেড দি আশ্রম অফ দি অরবিন্দ। তাঁর শত্রুপক্ষ ঐ নিয়ে টিপ্পনি কাটেন, কিনা, কথায় কথায় দি-দি করেন বলেই তিনি সবাইয়ের দিদি।

আঁতেলনামা

আঁতেল। প্রথম শ্রবণে শব্দটাকে ফরাসি বলে মনে হয়। আসলে, শব্দটা 'ইনটেলেকচুয়্যালে'রই অপভ্রংশ।

ইনটেলেকচুয়্যালের বাংলা নাকি বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধি দিয়েই যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন। অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখ্খক, উকিল, আমলা, শিল্পী, অভিনেতা—সবাই তাহলে বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিকে ইনটেলেক্ট ভাবা হয়েছে। কাজেই ইনটেলেকচুয়্যালকে পাণ্ডিত্যজীবী বা মেধাজীবীও বলা যায়। পাণ্ডিত্যের বা মেধার প্রয়োগই যাদের জীবিকা। আর, আঁতেল যদি ইনটেলেকচুয়্যালের অপভ্রংশ হয়, তাহলে আঁতেল মানেও পাণ্ডিত্যজীবী বা মেধাজীবী। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আঁতেল আর ইনটেলেকচুয়্যাল কিন্তু মোটেই এক নয়। ইনটেলেকচুয়্যালের সঙ্গে আঁতেলের বহুৎ ফারাক। ঝিঙে আর ধুঁধুলে যে ফারাক। কিংবা আপেল আর মাকালে। এই নিবন্ধে আমার নিবেদন ইনটেলেকটুয়্যালদের নিয়ে নয়, আঁতেলদের নিয়ে।

সাদা চোখে ঝিঙে আর ধুধুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা শক্ত কাজ। কিন্তু ইনটেলেকচুয়্যালদের ভেতর থেকে আঁতেল চিনে নেওয়া ঢের সহজ।

কী কী বৈশিষ্ট্য দেখে আঁতেল চেনা যায়?



প্রথমত, তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে। আঁতেল হবে সাধারণত শীর্ণকায়। তার চুল হবে লম্বা, এলোমেলো, তৈলহীন ও উস্কোখুস্কো। একমুখ অনাদরের দাড়িই হবে তার শোভা। তার হাতে-পায়ের নখ সর্বদাই ছোট-বড় থাকবে, কেন কি, নিয়মিত পরিপাটি করে নখ কাটাটা তার ধাতে নেই। গভীর ভাবনা ভাববার কালে হাতের নখ যা-যতটুকু দাঁত দিয়ে কাটা পড়ে, আর হোঁচট খেতে খেতে পায়ের নখ যা-যতটুকু ভেঙে-টেঙে যায়, ওইটুকুই, ব্যস। তার পোশাক হবে এলোমেলো এবং নোংরা। সে সাধারণত উৎকট রঙের নিম্নবাসের সঙ্গে বিকট রঙের ঊর্ধ্ববাস পরবে। তার ঠোঁটের ডগায় থাকবে চারমিনার কিংবা বিড়ি। পকেটে ব্যয় করবার মতো রেস্ত থাকলেও সে দেশি ছাড়া কিছুই খাবে না, এবং মফঃস্বলে গেলে বিলিতি প্রত্যাখ্যান করে সে মহুয়াতে মগ্ন হবে। তার চোখের ওপর থাকবে একটি সরু লম্বাটে রিডিং গ্লাস, এবং তাতে দড়ি বাঁধা থাকবে। তার কাঁধে ঝুলবে একটি কাপড়ের সাইডব্যাগ এবং তা বহুকাল কাচা হবে না।

এবার আচরণ দেখে আঁতেল চেনার উপায় সম্পর্কে দু-চার কথা নিবেদন করি। সত্যিকারের আঁতেল দৃশ্যত একটুখানি ন্যালাখ্যাপা হবে। তার গলাটি হবে সাধারণভাবে, মেয়েলি। তার মধ্যে সারাক্ষণ এক ধরনের অন্যমনস্ক, কেয়ারলেস ভাব দেখা যাবে। যেন সে এই দুনিয়ায় থেকেও নেই। তার পা কখনোই মাটিতে পড়বে না। সে সারাক্ষণ হাওয়ায় ভাসতে থাকবে। কিন্তু 'জাতে মাতাল তালে ঠিক'দের মতো টেলিফোনে চেলাকে কোনও গভীর তত্ত্ব বোঝাতে বোঝাতে আচমকা 'ফোনটা কি তুমি করলে, নাকি আমি করেছি' গোছের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে সে বুঝে নিতে চাইবে, বাস্তবিক ফোনের বিলটা কার ঘাড়ে চাপছে। যদি দেখে যে, চেলাটিই ফোনটা করেছিল, তবে, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম—' বলে পুনরায় গভীর আলোচনায় ডুবে যাবে। আর, যদি ব্যাপারটা উলটো হয়, তবে, 'আমাকে একটা জরুরি ফোন করতে হবে, এখন রাখছি ভাই। পরে কখনো—'বলে ফোনের লাইন ঝটিতি কেটে দেবে।

তার পকেটে কোনও সময়েই তেমন রেস্ত থাকবে না। সঙ্গে কয়েকটি খুচরো পয়সা নিয়েই সে আজীবনকাল ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তাও, নিজ প্রতিভাবলে দিনভর অজস্র কাপ চা তৎসহ এটা-ওটা তার কপালে জুটে যাবেই। বাস্তবিক, পকেটে রেস্ত না থাকলেও এবং দেখতে সিড়িঙ্গে হলেও জাত আঁতেলের পেটে অগাধ জায়গা থাকে। সে সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে, কেন কি, কফিহাউস জাতীয় আঁতেলদের স্বর্গে প্রায়ই তাঁদের এ-টেবিলে ও-টেবিলে বিচরণ করতে করতে এবং দুনিয়ার জটিল তত্ত্বগুলো বোঝাতে বোঝাতে চা-টা, পকোড়াটা, টোস্টটা, কাটলেটটা এর-ওর প্লেট থেকে অতি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তুলে নিতে দেখা যায়। তাতে করে ফি-সন্ধেয় সাকুল্যে যতটা খাবার তার পেটে ঢোকে, সাধারণ মানুষ হলে পেট ফেটে যেতো।

চারপাশের সব্বাইকে নিজের চেয়ে রাম-খাটো ভাবাটা আঁতেলদের জন্মগত অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। নিজের পঠিত বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব বিষয়েই সে প্রভূত ব্যুৎপত্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। জীবনে বারেকের তরেও গ্রামকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ না করেও সে ইন্ডিয়ার রুরাল লাইফ নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতার ক্ষমতা রাখে। সে দুনিয়ার সব তত্ত্বের মধ্যেই কোনও না কোনও গলদ খুঁজে পায়। এবং চারপাশের অধিকাংশ ওয়াকিবহাল মানুষ যা বিশ্বাস করেন, সত্যিকারের আঁতেল তা থেকে সদা-সর্বদা 'ডিফার' করবেই।

বাস্তবিক, যে সবাইয়ের সব কথায় সারাক্ষণ 'ডিফার' করে না, সে আঁতেল পদবাচ্যই নয়।

জাত আঁতেলের কোনও-না-কোনও একটা নেশা থাকবেই। সে একটু শারীরিকভাবে দুর্বল ও ভিতু প্রজাতির হবে। যে কোনও রকমের ঝুটঝামেলাকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলবে। অথচ সমাজের বুকে ঘটতে থাকা যাবতীয় ভ্রষ্টাচার এবং সাধারণ মানুষের মেষসুলভ পলায়নী প্রবৃত্তির প্রতি এবং সর্বোপরি সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও অপদার্থতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং পলাতক মানুষগুলির প্রতি মুহুর্মুহু ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

সত্যিকারের আঁতেল সব বিষয়ে তার প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রমাণ দিতে গিয়ে মুহুর্মুহু দুর্বোধ্য টার্মিনোলজি ও তৎসহ দাঁতভাঙা নামের বিদেশি পণ্ডিতদের মুখনিঃসৃত বাণী মুড়ি-মুড়কির মতো বিতরণ করবে। সে সাহিত্যের আলোচনায় মুহুর্মুহু কাফকা, কাম্যু, বোদলেয়র, লোরকা, জাতীয় বিদেশী মনীষীদের নামাবলী এক নিঃশ্বাসে বলে যাবে, কিন্তু পেটে একটুখানি খোঁচা মারলেই বোঝা যাবে যে ওঁদের লেখা তো বড় একটা পড়েইনি, এমন কি, পরশুরাম, ত্রৈলোক্যনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিকও পড়েনি। সে শরৎচন্দ্রকে 'নাকে কাঁদা মেয়ের' গল্প লিখিয়ে, তারাশঙ্করের গদ্যকে অমার্জিত এবং বিভূতিভূষণের লেখাকে 'কাশফুল ফলোড বাই ঘেঁটুফুল ফলোড বাই কাশফুল' বলে টিটকিরি করবে। সে 'পথের পাঁচালি'র প্রসঙ্গে নাক কোঁচকাবে, কিন্তু 'গড অফ্ স্মল থিংস' সম্পর্কে তেমন কিছু না জেনেও গদগদ হবে।

জাত আঁতেল কখনোই কোনও বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দেয় না। সে যা ভাবে, তা বলে না, যা বলে, তা করে না, যা করে, তা বিশ্বাস করে না। আলোচনার আসরে সে কখনোই ছোটখাটো স্টেশনে থামে না। একেবারে মোঘলসরাই, এলাহাবাদ, কানপুর এবং তারপরই দিল্লি। জাত আঁতেলকে কদাচিৎ হাসতে দেখা যায়। সে সারাক্ষণ মুখমণ্ডলকে এমন প্যাঁচার মতো বানিয়ে রাখে, দেখলে মনে হবে, বুঝি জন্মের বহু আগে থেকেই ক্রনিক কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। চোখেমুখে এমন দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়ে রাখবে, দেখলে মনে হবে, সারা পৃথিবীর দায়দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বুশ সাহেব বুঝি বানপ্রস্থে গিয়েছেন। কিংবা ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা প্রবল সুনামি শুরু হবে।

বাইরে যতই আলাভোলা দেখাক না কেন, জাত আঁতেল মাত্রেই সুযোগসন্ধানী হয়। সর্বদা একটু স্বার্থপরও বটে। এবং সেই সুবাদে সে খিড়কির পথে সল্টলেকে জমি পায়, যদিও তার দেশব্যাপী দুর্নীতি দেখে সারাক্ষণ বমি পায়।

কবি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আঁতেলদের 'পাঁচটি মাথা, বাইশটি হাত, এবং চুয়াত্তর জোড়া চোখ-কান/সতেরোটি খিদে এবং আধখানা পেট/যদিও, দুঃখের বিষয়, পালাবার জন্য সেই মাত্র একজোড়া পৈতৃক পা।'

ম-কারযুক্ত আঁতেলকে মাঁতেল বলা যায়। ম-কারযুক্ত আঁতলামোকে মাঁতলামোও বলা চলে। চপলকুমারের মতে, সত্যিকারের আঁতেল একটুখানি যৌন-উপোসী হয়ে থাকে, ফলত, একটুখানি সেক্স-পারভার্টও। সে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে মদের ঝোঁকে স্টেজেই পেচ্ছাব করে দেবে। জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারবে দর্শকদের দিকে। এ বিষয়ে কেউ উষ্মা প্রকাশ করলে তার তাৎক্ষণিক জবাব : এ পাবলিক স্টেজ ইজ আ ইউরিন্যাল, হোয়ার আই স্টে'/ওয়ার্ল্ড ইজ, অ্যাজ আই থিংক, আ বিগ অ্যাশট্রে।

নাম-রহস্য

সেদিন বাংলা অকাদেমীতে আড্ডা চলছিল।

ডঃ পবিত্র সরকার, আমাদের সবাইয়ের প্রিয় পবিত্রদা, বললেন, গণ্শাটা খুব দুষ্টু হয়েছে।

বলি, গণ্শা কে?

পবিত্রদা বললেন, আমার নাতি, ভালো নাম গণেশ। খুবই দুষ্টু হয়েছে।

শুনেই বলি, একবিংশ শতাব্দীতে একটি ছেলের পোশাকি নাম গণেশ! ডাকনাম গণ্শা! শিশুদের নামকরণের ব্যাপারে বড়দের এই স্বেচ্ছাচারিতা আর কদ্দিন চলবে দাদা?

—স্বেচ্ছাচারিতা? স্বেচ্ছাচারিতা আবার কোথায় দেখলে?

বলি, স্বেচ্ছাচারিতা নয়? ছেলেটির ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কেবল নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য যা-খুশি একটা নাম রেখে দিলেন? পবিত্রদা, আপনি কি জানেন, আপনাদের এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আপনার নাতিটি ভবিষ্যতে কত রকমের অসুবিধেয় পড়তে পারে?

—অসুবিধে? কি রকম?

—প্রথম কথা, এই নামটুকুর জন্য কোনও মেয়েই তার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে না। এই আমার কথাই ধরুন না। ভগীরথ নামটার জন্য আমাদের এম-এ ক্লাসের ৬০-৬১টি



মেয়ের মধ্যে কেউই আমার সঙ্গে প্রেম করতে এগিয়ে আসেনি।

সুমিতাদি (চক্রবর্তী) বললেন, ভগীরথ কি এমন খারাপ নাম? আমারই তো ভগীরথ নামে এক সহপাঠী ছিল।

—তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কখনো প্রেম করবার ইচ্ছে জাগেনি। তাহলে একটা সত্যি ঘটনা বলি। আমার এক সহপাঠী, ভালো নাম ত্রিদিব, মস্ত বড়লোক। সবে আমাদেরই এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়েছে। বেশ জমে উঠেছে প্রেম। এমনি সময়ে একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে জানতে পেলুম, ওর ডাকনাম ভজহরি, সংক্ষেপে ভজা। আমাকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিতে এসেই ত্রিদিবের প্রথম অনুনয়, ডাকনামটা যেন ক্লাসের অন্যদের কাছে প্রকাশ না পায়। অন্যদের কাছে মানে যে বিশেষ একজনের কথা বোঝাতে চাইছে ত্রিদিব, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। তারপর থেকে পাক্কা দুবছর ওকে ব্ল্যাকমেল করে অনেক খেয়েছি।

পল্লবদা (সেনগুপ্ত) বললেন, তোমার ওই বন্ধুটির ডাকনাম ছিল ভজা? তাহলে আর এক ভজার কথা বলি তোমাদের। বাড়ির গৃহিণীর কাছ থেকে রোজ বাজারের হিসেব চাইতেন স্বামী। আনাজ-সবজি, ধোপা-গোয়ালা, চাল-ডালের পর একেবারে শেষে লেখা থাকতো, ভজা—এতো টাকা।

তাই দেখে স্বামীর মনে কৌতূহল, এই ভজাটি কে? বউ প্রতিবারই জবাবটা এড়িয়ে যায়। এতে করে স্বামীর কৌতূহল থেকে সন্দেহ তৈরি হয়। দিন দিন সন্দেহটা বাড়ে। একদিন স্ত্রীকে চেপে ধরে, বল, তোমাকে বলতেই হবে। কে এই ভজা, যাকে তুমি রোজরোজ এককাঁড়ি করে টাকা দাও।

বউটি অবশেষে বলতে বাধ্য হয়। হিসেব মেলাতে না পেরে রোজই ওই ভজার নামে হিসেব না মেলা টাকাটি লিখে রাখে। ভজা মানে, ভঃ জাঃ। অর্থাৎ ভগবান জানেন।

ঘটনাটা শুনে আমাদের আড্ডার বন্ধু চপলকুমার বলে, তাতে কী হয়েছে? হোয়াট ইন আ নেম? গোলাপকে যে নামেই ডাকো...। এই তো আমাদের বিপদ, ওই নামে ওর কিছু গিয়েছে-এসেছে?

বিপদ আমাদের আড্ডার একজন সক্রিয় সদস্য। পুরো নাম বিপদভঞ্জন হলেও আমরা সবাই ওকে বিপদ বলেই ডাকি। ওই নিয়ে অবশ্য তার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। বিপদ যেহেতু এক ধরনের অশুভ ব্যাপার। তাই, যখন ওকে দেখে আমরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি, এই যে, বিপদ এসে গেছে, আর চিন্তা নেই। কিংবা, বিপদকে একটিবার আসতে দাও, সব মুশকিলের আসান হয়ে যাবে। শুনতে শুনতে বিপদের সদাহাস্যময় মুখখানি প্রতিবারই গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে আমাদের বহুবার পুরো নামে ডাকবার জন্য ইনসিস্ট করেছে। কিন্তু কাঁহাতক সারাক্ষণ ঐ ছ'অক্ষুরে নামটিকে আওড়ানো যায়। কাজেই আমরা বিপদ দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই।

চপলকুমারের কথায় সবার আগে প্রতিবাদ করে বিপদই। বলে, আসে-যায় বৈকি। মানুষের নাম অনেকটাই ম্যাটার করে। নামের অনেক ক্ষমতা। নাম মানুষের ব্যক্তিত্ব বাড়ায়-কমায়। অমিতাভ, অরিজিৎ, অনির্বাণদের সঙ্গে পাঁচু রায়, ভগীরথ মিশ্র, বিপদভঞ্জনরা পারবে কেন? এইসব নামধারীদের সঙ্গে মেয়েরা প্রেম করবে না, চাকরিদাতারা প্যানেলভুক্ত করতে চাইবে না, বস একটুখানি খাটো নজরে দেখবে। অধস্তনরাও যথাযথ



সম্মান দিতে চাইবে না। জীবনে পদে পদে তাবৎ আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ওই পণ্ডিতমশাই গল্পটা পড়নি? যেখানে নামকে বিকৃত করে ডাকার কারণে কী দুর্যোগ নেমে এসেছিল একটি ছেলের জীবনে।

আমারও বিশ্বাস, নামে বাস্তবিক অনেককিছুই আসে-যায়। অর্থাৎ অনেকেই আসে এবং নামটি শোনামাত্রই কেটে যায়।

আমার এক বন্ধুর বোন একটি সুপাত্রকে পত্রপাঠ নাকচ করে দিল কেবল একটি কারণে যে, তার নাম রমণী। পুরো নাম অবশ্য রমণীকান্ত, কিন্তু পুরো নাম ধরে আর কে ডাকে!

রাধিকা (রঞ্জন) ব্যানার্জি ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যমন্ত্রী। শুনেছি, বিধানসভায় তাঁকে হরহামেশাই মহিলা বিধায়ক বলে ঠাট্টা-টিপ্পনি কাটতেন তৎকালীন বিরোধী দলের নেতারা।

আমার এক কলেজের বন্ধুর নাম ছিল বামাচরণ। কলেজে ঢোকামাত্তর বন্ধুরা টিটকিরি শুরু করে দিল, কিনা, বাবা-চরণ ও মা-চরণের পাঞ্চ। কলেজেই আর একজনের নাম পেয়েছিলাম, সমুদ্রঝিনুক। নির্ঘাৎ খুব আধুনিক হবে বিবেচনায় বাবা-মা ছেলের এহেন নাম রেখেছিলেন। যেদিন প্রথম ক্লাসে এলো, শুরু হয়ে গেল নাম নিয়ে গবেষণা। কেন এমন অদ্ভুত নামকরণ? কেউ বলে, সম্ভবত বাবার নাম সমুদ্র, মায়ের নাম ঝিনুক। ছেলের মধ্যে দুজনেই নিজ-নিজ নাম অক্ষয় করে রাখতে চেয়েছেন। অত বড় নামে তো কেউ ডাকবে না, বন্ধুরা কেউ ডাকে সমুদ্র বলে, কেউ ডাকে ঝিনুক। ফাজিল বন্ধুরা ঝিনুকদি বলে ঠাট্টা করতে থাকে সহপাঠিনীদের সামনে। শিশুকালে হয়তো-বা খুব একটা সমস্যা হয়নি, কিন্তু যৌবনে সহপাঠিনীদের সামনে তা হৃদয়বিদারক হত।

বাংলার অধ্যাপক, ছেলের নাম রাখল, কুবলয়। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার কুবলয় শব্দের মানে বোঝাতে হয় ছেলেকে। কিনা, পদ্মফুল। বন্ধুরা ডাকে, কুবলাই খাঁ। কেউ বলে, কু-বলয় মানে, ভিসিয়াস সার্কেল। দুষ্টচক্র।

আসলে, উদ্ভট নাম রাখবার পেছনে বাবা-মায়ের গুটিকয় মনস্তত্ত্ব কাজ করে। অনেক বাবা-মাই চান, ছেলেমেয়ের আন্‌কমন নাম হোক। কেউ কেউ নিজের চিন্তাভাবনার 'ইউনিকনেসে'র প্রমাণ রাখতে গিয়ে অবোধ শিশুটির 'ফুটুর ডুম' করে বসেন।

উদ্ভট নামের অধিকারীদের অনেকেই যে সারা জীবন এক ধরনের কমপ্লেক্সে ভোগেন, নানাভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ দেখেছি প্রায় সব সময়ই নামের ইংরেজি আদ্যক্ষরগুলো দিয়েই চালিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। বামাচরণ ব্যানার্জি হন বি-সি ব্যানার্জি। রমণীকান্ত মিত্র হন আর-কে মিত্র। গদাধর চন্দ্র বোস হন জি-সি বোস। নিজের পরিচয়ও সর্বদা আদ্যক্ষর দিয়েই প্রকাশ করতে চান। হ্যালো, আমি জি-সি বলছি।

লেখকদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি আসল নামটি জুতসই নয় বলে একটি সুন্দর ছদ্মনামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন আজীবনকাল।

এর উলটোটাও ঘটে। আর, তাই নিয়ে আমার হয়েছে বিপত্তি। এখনও অবধি অনেক বন্ধু-বান্ধব আমার থেকে জানতে চান, তোমার আসল নামটা কী হে? তাঁরা আমার নামটিকে ছদ্মনাম বলে খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। অনেক চেষ্টা করেও অনেকের মন থেকে আমি সেই বিশ্বাস হটাতে পারিনি।

নামের বোঝা

ছেলেমেয়েদের নামকরণের পেছনে বাবা-মাদের আরও অনেক ধরনের মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে।

খুব ধর্মপরায়ণ বাবা-মাদের অনেকেই ছেলেদের নাম রাখেন ঠাকুর-দ্যাবতার নামে, যাতে করে দিনরাত ঐ নামে ডাকলে পরে তাঁদের অজান্তেই কিছু পাপ ক্ষয় ও পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্য অর্জনের সেই লালসা মাঝেমাঝে এতটাই উৎকট হয়ে ওঠে যে, ছেলেদের বিকট নামেও ভূষিত করে ফেলেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিকট নামের উদাহরণ হিসেবে একটাই নাম জানা ছিল। গোপীজনবল্লভপদরেণু সেন। পরবর্তীকালে একজন অ্যাসিস্টেন্ট ইনঞ্জিনিয়ারকে চিনতাম, তাঁর পুরো নাম, দীনদয়ালগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়। ভোটার তালিকাগুলি তো এক-একটি বিকট নামের বিশালকায় নামাবলী। ঐ তালিকাগুলি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পেয়েছি গোচারণ, বগলাচরণ, ক্যাবলকান্তর মতো নামগুলি। একটি দম্পতির নাম পেয়েছিলাম,



ল্যাংটেশ্বর দাস ও উলঙ্গিনী দাসী।

আমার এক পুলিশ অফিসার বন্ধু রয়েছেন, নাম ও পদবি নিয়ে তাঁকে বহুবার বিব্রত হতে দেখেছি। বন্ধুটির নাম তপন চ্যাটার্জি পূর্ণপাত্র। অনেকেই এটাকে দুজন মানুষের নাম ভাবতেন। প্রধানমন্ত্রী কোনও জেলা-সফরে আসবেন। আশেপাশের জেলাগুলোর থেকে কিছু বাড়তি পুলিশ অফিসার আনা হল। তপনও তলব পেলেন। নির্দিষ্ট দিনে ঐ জেলার কন্ট্রোলরুমে গিয়ে রিপোর্ট করে আসার পরও অনেকক্ষণ ধরে মাইকে ঘোষণা চলত, বাঁকুড়া থেকে মিঃ তপন চ্যাটার্জি রিপোর্ট করেছেন, কিন্তু এখনও অবধি মিঃ পূর্ণচন্দ্র পাত্র (উচ্চপদস্থ অফিসারজ্ঞানে 'চন্দ্র'যোগে কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদান) রিপোর্ট করেননি। মিঃ পূর্ণচন্দ্র পাত্র, আপনি যদি এসে থাকেন, তবে অতি সত্বর রিপোর্ট করুন।

তিরিশ-চল্লিশের দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে মনীষীদের নামে আত্মজদের নাম রাখবার ব্যাপক চল্ হয়। সে সময়ে বাংলার বহু বাড়ি রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জনে ভরে গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে বহু সদ্যোজাতর নাম রাখা হয়েছিল স্বপন। সম্ভবত স্বাধীনতার পরবর্তী নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষগুলিই আত্মজদের ওই নামকরণ করেছিলেন। ষাটের দশকে উত্তমকুমারকে স্মরণ করে বহু বাবা-মা তাঁদের ছেলের নাম রেখেছিলেন উত্তম। সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলনের দিনগুলিতে বহু বামপন্থী পরিবারেই ছেলেদের নাম রাখা হয়, বিপ্লব। বাংলাদেশ যুদ্ধের পরপরই সারা দেশ জুড়ে সদ্যোজাত মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরা নামের জয়জয়কার। আশির দশকে অমিতাভ বচ্চন এবং মিঠুন চক্রবর্তী জনপ্রিয় হওয়ার পর অনেক বাবা-মাই তাদের ছেলেদের নাম রেখেছিলেন অমিতাভ এবং মিঠুন। মিঠুন অবশ্য ডাকনামেই আটকে রইল। পরবর্তীকালে, মোটামুটি নব্বই দশক নাগাদ, ইন্দিরা-তনয়ার নামে প্রিয়াঙ্কা, ক্রিকেট-নায়কদ্বয়ের নামে সৌরভ, সচীন নামগুলোও খুবই চালু হয়েছিল।

নামকরণের ক্ষেত্রে আরও নানা রকমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় কারণ যুক্ত হয়ে থাকে। ছেলের নাম খুশি চক্রবর্তী। পর পর চারটি মেয়ের পর ছেলে হয়েছে। বাবা মনের খুশি চাপতে না পেরে ছেলের নামই রেখে দিয়েছেন, খুশি। ভূমিকম্পের রাতে জন্মেছে বলে, ছেলের নাম রাখা হয়েছে কম্পন। বৃষ্টি-বাদলের রাতে জন্মেছে বলে ছেলের নাম হল, বাদল। ঠাকুরের কাছে 'মানসিক' করে ছেলে হয়েছে বলে তার নাম হল, মানস। যুদ্ধের সময় সবকিছুই কন্ট্রোলে পাওয়া যেত। সেই সময়ে আমার পরিচিত এক পরিবারে যে ছেলেটি জন্মাল, তার নাম রাখা হল, কন্ট্রোল। আমরাও ছেলেবেলায় তাঁকে কন্ট্রোল-কাকু বলে ডাকতাম। বারবার ছেলে মরে যাচ্ছে, পচা, হাজা, গোবর গোছের খুব খারাপ নাম রেখে দেবার চল ছিল। মেদিনীপুর জেলায় এত কৃষ্ণভক্ত মানুষের বসবাস যে, ঐ জেলার প্রত্যেকটি গ্রামে কম করে পাঁচজন 'হরেকৃষ্ণ'র বাস।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি তখন রাজ্য সরকারে একজন পদস্থ কর্মচারি হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নিযুক্ত। একদিন তামিলনাড়ু থেকে চিঠি এল মহাকরণে। তামিলনাড়ু সরকারের পাঠানো একটি পাঁচজনের টিম এই রাজ্যে আসছে কয়েকটি প্রকল্প সরজমিনে দেখবার জন্য। তাঁদের জন্য থাকা-খাওয়া ও প্রকল্প পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

দেখলাম, টিমের সদস্যদের মধ্যে একজনের নাম সুভাষচন্দ্র বোস।

প্রকল্প পরিদর্শনপর্ব চলাকালীন একফাঁকে সুভাষবাবুকে শুধোলাম, কদ্দিন বাদে নিজের মুলুকে এলেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পার্ডন? অর্থাৎ কী বলছেন?

আমি আবার প্রশ্নটা উচ্চারণ করলাম।

এবার ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন, দুঃখিত, আমি বেঙ্গলি জানি না।

এবার ইংরেজিতেই বলি, সে কি, কতদিন তামিলনাড়ুতে রয়েছেন যে, মাতৃভাষাটাই ভুলে গিয়েছেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমি জন্মসূত্রে তামিলই। আমার বাবার নাম রামস্বামী শিবশৈলম রেড্ডি। মায়ের নাম জানকীলতা রেড্ডি। আসলে, আমার বাবা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বোসের একজন ফ্যান। আই-এন-এ'র ঘোরতর সমর্থক। সেই কারণেই আমার নাম রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস রেড্ডি।

শুনে তো আমি থ'। মিঃ রেড্ডিই কথায় কথায় জানালেন, চল্লিশের দশকে দক্ষিণ ভারতে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের মতো অনেক স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নামে ছেলেদের নাম রেখেছিলেন অনেক বাবা-মা।

আদিবাসীদের মধ্যে দেখেছি, তাঁরা রাজ-কর্মচারীদের পদগুলোকে নাম হিসেবে ব্যবহার করতে খুবই ভালোবাসেন। সম্ভবত, রাজ-কর্মচারীদের প্রতি ভয়ভক্তিই এই ধরনের নামকরণের কারণ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে সাঁওতাল উপজাতির মানুষের মধ্যে তাই দারোগা (টুডু), সাহেব (মুর্মু), অপিসার (হাঁসদা), এস-ডি-ও (হেমব্রম), ম্যানেজার (সরেন) গোছের নামের খুবই বাহুল্য নজরে পড়ে।

তেমন তেমন নাম হলে সেই নামের বোঝা বইতে যে মানুষের কী গলদঘর্ম অবস্থা হয়, তা বোধ করি এতক্ষণে খানিকটা বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু একজনের নাম যদি হয়, সুজা-উল্-মুলুক হুশেনউদ্দৌলা মীর মুহম্মদ জাফর আলী খাঁ মহাবতজঙ্গ বাহাদুর, কিংবা ইকতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি, কিংবা আবদুল আজিজ ইবন আবদুর রহমান আল ফৈজল আল সৌদ, কিংবা এডসন অ্যারান্টেস দো নাসিমেন্টো, কিংবা পাবলো দিয়েগোয়োমে ফ্রান্‌থিস্‌কো—দ্য পল দুয়ান নেপোমুথেনোত্রি স্ত্যা ক্রিস্‌পিয়ানো দ্য লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ রুইথ ঈ পিকাসো, তবে তাঁরা ঐসব নামের বিশাল বোঝাগুলি বইতেন কেমন করে? আজ্ঞে হ্যাঁ, এগুলো সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের পুরো নাম। প্রথম নামটা ইতিহাসের কলঙ্কিত খলনায়ক মীরজাফরের। দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম নামগুলি যথাক্রমে বক্তিয়ার খিলজি, আধুনিক সৌদি আরবের রূপকার ইবান সোদ, ফুটবলের যাদুকর পেলে এবং পাবলো পিকাসোর।

—